জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস

আব্বাস আলী খান

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস প্রথম খণ্ড

আব্বাস আলী খান

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

www.pathagar.org

জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস প্রথম খণ্ড

আব্বাস আলী খান

প্রকাশক ঃ আবু তাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই - ১৯৮৬ ইং

নবম মুদ্রণ ঃ নভেম্বর - ২০২১
অগ্রহায়ণ - ১৪২৮
রবিউস সানি - ১৪৪৩

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

"Jamaate Islamir Itihas", Written by Abbas Ali Khan, Published by : Abu Taher Mohammad Ma'sum, Chairman, Publication Department, Bangladesh Jamaate Islami, 505 Baro Moghbazar, Dhaka-1217.

Fixed Price : Taka 150.00 (One hundred fifty) only.

www.pathagar.org

তৃতীয় সংস্করণ
গ্রন্থকারের কথা

দশ বছর পূর্বে ১৯৮৬ সালে এ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। যাঁরাই জামায়াতে ইসলামীর সাথে সঠিকভাবে পরিচিত হতে চান এবং যাঁরা এ আন্দোলনের সাথে জড়িত হতে চান, তাঁদের অবশ্য অবশ্যই জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস মন দিয়ে পড়া উচিত। জামায়াতের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ এবং আদর্শিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ লাভের জন্যে এ ইতিহাস পাঠ অপরিহার্য। ইতিহাস ও কাল পরিক্রমায় দেখা যায়, কোন একটি আন্দোলন অথবা জাতি যুগের পর যুগ অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তার মধ্যে কিছু বিকৃতি বা আদর্শচ্যুতি শুরু হয়। এমন সময়ে তার প্রতিরোধ করতে না পারলে অথবা প্রতিরোধের চেষ্টা না করলে অবশেষে তার পতন ঘটে। ঠিক তেমনি জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে একটি দ্বীনি আন্দোলনের সম্ভাব্য বিকৃতি অথবা পতন রোধ করতে হলে জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস দৈনন্দিন পাঠ্য তালিকায় রাখতে হবে।

এ ইতিহাস যদিও তার প্রাথমিক যুগের সাত বছরের ইতিহাস, কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে জামায়াত গঠনের পটভূমি, উপমহাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি যথা একজাতীয়তার ভিত্তিতে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প, সংখ্যালঘু মুসলমানদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে একাকার করে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র প্রভৃতি।

এ ইতিহাসে জামায়াতের আদর্শ, লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি, ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া ও ইহসানের সহজ সরল ব্যাখ্যা, যা নিয়ে ইসলামের প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে, আন্দোলনের নেতাকর্মীদের অপরিহার্য গুণাবলী প্রভৃতি বিষয়গুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

জামায়াত গঠনকালে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন সম্মেলনে জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা যেসব অমূল্য ভাষণ দিয়েছেন, পাঠক অবশ্যই তার থেকে একামতে দ্বীনের প্রেরণা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে জীবন বিলিয়ে দেয়ার মনমানসিকতা ও রূহের খোরাক এবং এ সব হতে তাঁর এ কঠিন পথে চলার মূল্যবান পাথেয় লাভ করতে পারবেন।

www.pathagar.org

আমার ধারণা বরঞ্চ বিশ্বাস এই যে, এ সাত বছরের ইতিহাস মনোযোগসহ পাঠ করে তা হৃদয়ে গেঁথে রাখতে পারলে একামতে দ্বীনের আন্দোলন সঠিকভাবে বুঝতে পারা যাবে, মনমস্তিষ্ক সে আন্দোলনমুখী হবে, মুমিনসুলভ কাঙ্ক্ষিত ইসলামী চরিত্র সৃষ্টি হবে এবং এ পথের বিপদ-মুসিবতের প্রচণ্ড ঝড়-ঝঞ্ঝায় অবিচল থাকার মনোবল সৃষ্টি হবে। এভাবে এ মহান আন্দোলনকে বিকৃতির ব্যাধি থেকে দূরে রাখা যাবে। এ পথের পথিকদের যে সব মূল্যবান পাথেয় প্রয়োজন, তার কোনটিই জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা বাদ দেননি। বিভিন্ন সম্মেলনে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে ও তাঁর সাহিত্যে সবকিছুই সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন।

এ ইতিহাসের প্রথম সংস্করণ কয়েক বছর পূর্বেই নিঃশেষ হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে অনিবার্য কারণে বিলম্ব হলো বলে দুঃখিত।

আমার বিশ্বাস, এ ইতিহাস পাঠকের মধ্যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জযবা সৃষ্টি করবে এবং আন্দোলনের জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জন করতে সহায়ক হবে। আল্লাহ পাকের দরবারে সে দোয়াই করি। সেই সাথে এ যেন আমার যাবতীয় গোনাহ মাফের নিমিত্ত হয়। আমীন।

- গ্রন্থকার

www.pathagar.org

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

জামায়াতে ইসলামী কি? ১১
ইসলামী আন্দোলনের সূচনা ১১
মানব জাতির দুঃখ-দুর্দশা ও ধ্বংসের কারণ ১১
খোলাফায়ে রাশেদীনের ইসলামী আন্দোলন ১২
খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলামী আন্দোলন ১২
ভারতে ইসলামী আন্দোলন ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৫
আল-জিহাদু ফিল ইসলাম গ্রন্থ ১৭

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা ও ইসলামী আন্দোলনের প্রস্তুতি স্তর ১৯
তৎকালীন ভারতে মুসলমানদের অবস্থা ২০
তর্জুমানুল কুরআনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন ২১
দারুল ইসলাম ট্রাস্ট গঠন ও ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যে
দল গঠনের পটভূমিকা রচনা ২৪
দারুল ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ ২৪

চতুর্থ অধ্যায়

দারুল ইসলাম পরিকল্পনা ও মাওলানা মওদূদী ২৬
মাওলানার বক্তব্য ২৬
দারুল ইসলাম সম্পর্কে আরো কিছু কথা ৪৩
দারুল ইসলামের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা ৪৫
দারুল ইসলামের গঠনতন্ত্র ৪৭
কাজের চিত্র ৪৭
ইসলামী সীরাত ৪৮
আর্থিক উপায়-উপকরণ ৪৯
উদ্দেশ্য হাসিলের পথ ৪৯
প্রতিরোধ ৪৯
গঠনমূলক কাজ ৫০
তাত্ত্বিক বিভাগ ৫১
ব্যবহারিক বিভাগ ৫৩
কাজের প্রসার ৫৩

www.pathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

মাওলানা মওদূদীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ৫৪
তর্জুমানুল কুরআনে মাওলানা বলেন ৫৫
মাওলানা জিজ্ঞেস করেন ৫৬
ইসলামী জাতীয়তা ৫৬
মাওলানা বড় সত্য কথা বলেন ৬১
ধর্মহীন সংবিধান সম্পর্কে মাওলানা বলেন ৬১
বৃটিশ পূজারী বলে যারা গালি দেয় তাদের জবাবে মাওলানা বলেন ৬১
ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে মাওলানা বলেন ৬২

মুসলিম জাতীয়তা

মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত (প্রথম খণ্ড) ৬৪
অভাব কিসের? ৬৬
মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত (দ্বিতীয় খণ্ড) ৬৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব ৬৯
একজাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীদের সমালোচনা ৭০
পাশ্চাত্য জাতীয়তা, ইসলামী জাতীয়তা ও একজাতীয়তা ৭১
প্রথম প্রস্তাব ৭২
দ্বিতীয় প্রস্তাব ৭৩
তৃতীয় প্রস্তাব ৭৪
জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা ৭৭
জামায়াতে ইসলামীর কাজ ৮৩
জামায়াতের গঠনতন্ত্র অনুমোদন ৮৪
জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত ৮৮
আমীরে জামায়াতের সাংগঠনিক ও দাওয়াতী সফর ৮৯
জামায়াত দফতর স্থানান্তর ৯০
মাওলানার বিশেষ হেদায়েত ৯০
মাওলানার অসাধারণ কর্মব্যস্ত জীবন (১৯৩৯-৪২) ৯১

সপ্তম অধ্যায়

জামায়াত সংকটের সম্মুখীন ৯২
আন্দোলনের বিরোধিতা ৯২
মজলিসে শূরার জরুরী বৈঠক ৯৩
অস্থায়ীভাবে দারুল ইসলামে কেন্দ্র স্থানান্তরিত ৯৪
নতুন কেন্দ্রে নতুন পরিকল্পনা ৯৫

www.pathagar.org

মতপার্থক্য ও তার সমাধান ৯৫
সাংগঠনিক কাজের পর্যালোচনা ৯৬
মহাযুদ্ধ আন্দোলনের বিরাট প্রতিবন্ধক ৯৭

সংগঠন ও প্রশিক্ষণের স্তর
তিনটি আঞ্চলিক সম্মেলন ৯৮
মধ্যভারতের সম্মেলন ৯৮
ইসলামী দাওয়াতের রিপোর্ট ও তার পর্যালোচনা ১০০
একটি অর্থনৈতিক স্কীম ১০১
সংগঠন, তরবিয়ত ও তাযকিয়া ১০২
সমাজ স্বয়ং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১০৩
তরবিয়তী ব্যবস্থা খানকাহী নয়- আন্দোলনমূলক ১০৪
যাহের ও বাতেনের সংশোধনের কাজ ১০৪
উত্তর ভারতীয় সম্মেলন ১০৫
সম্মেলনের উদ্দেশ্য ১০৬
রুকনিয়াতের শপথ ও স্থবিরতা ১০৬
কর্মীদের গুণাবলী ১০৭
মুবাল্লিগের সর্বোৎকৃষ্ট কাজ ১০৭
কাইয়েমে জামায়াত নিয়োগ ১০৮
দিল্লী সম্মেলন ১০৯
হায়দরাবাদ সম্মেলন ১০৯
মাওলানার উদ্বোধনী ভাষণ ১১০

অষ্টম অধ্যায়
প্রথম নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামী সম্মেলন ১১২
আমীরে জামায়াতের উদ্বোধনী ভাষণ ১১২
জামায়াতে ইসলামী ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ১১৪
নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্য ঃ নবী মুস্তাফার (সঃ) সে উদ্দেশ্য পূরণের পদ্ধতি ১৩১

নবম অধ্যায়
সম্প্রসারণ ও উন্নতির যুগ ১৩৩
দ্বিতীয় নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামী রুকন সম্মেলন ১৩৪

জামায়াতে ইসলামীর
শূরায়ী নিযামের (পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থার) ক্রমোন্নতি ১৩৯
জামায়াতে সমালোচনার নিয়মিত ব্যবস্থা ১৪১
সমাজের মধ্যে জামায়াতের প্রভাব বিস্তার ১৪২
উলামায়ে কেরামের মধ্যে দাওয়াতের প্রভাব ১৪৪

www.pathagar.org

আধুনিক শিক্ষিত লোকের মধ্যে জামায়াতের প্রভাব ১৪৮
জামায়াতে ইসলামী ও তাগুতী শাসন ১৫০
অন্যান্য মহলে জামায়াতের প্রভাব ১৫২
বিভিন্ন মহলে প্রভাব বিস্তারের পরিকল্পনা ১৫৪
মহিলাদের মধ্যে কাজ ১৫৫
বহির্বিশ্বে জামায়াতের প্রভাব ১৫৮
দাওয়াতী সাহিত্য প্রণয়ন ১৫৮
তরজমার ব্যবস্থাপনা ১৫৯

দশম অধ্যায়
চারটি ঐতিহাসিক সম্মেলন ১৬০
মাদ্রাজ সম্মেলন (২৫শে ও ২৬শে এপ্রিল) ১৬২
ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যত কর্মসূচি ১৬৪
পাটনা সম্মেলন (২৫শে ও ২৬শে এপ্রিল-১৯৪৭) ১৬৭
পাঠানকোট সম্মেলন (৯ই ও ১০ই মে-১৯৪৭) ১৭১
জনসভায় ভাষণ দেয়ার জন্যে বক্তার মান নির্ণয় ১৭৫
প্রশ্নমালা ১৭৬

একাদশ অধ্যায়
পাকিস্তান আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী ১৭৭
শাহ ওলী উল্লাহ দেহলবী (রঃ) ১৭৯
সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রঃ) ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রঃ) ১৮০

দ্বাদশ অধ্যায়
জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ১৮৪
ইসলামী আন্দোলনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ১৮৪
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ১৮৫
মুসলিম জাতীয়তার আন্দোলন ১৮৬
ইসলাম আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৮৬
মাওলানা একজন নওমুসলিম ১৮৭
আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ ১৮৯
আন্দোলনের পতনযুগ ১৮৯
ইসলামের বর্তমান অবস্থা ১৮৯
ইসলাম ও তার দাবী ১৯০
একটি ইসলামী জামায়াতের দাবীসমূহ ১৯২
যারা কাজ করতে চায় তাদের জন্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতা ১৯৩
পাকিস্তান প্রকৃতপক্ষে কিরূপ হওয়া উচিত ১৯৪
অখণ্ড ভারতের পজিশন ১৯৫

www.pathagar.org

কুরআন কি বলে ১৯৫
আমাদের সম্পর্ক ১৯৬
আমাদের পদমর্যাদা ১৯৬
প্রকৃত ইসলামী লক্ষ্য ১৯৭
এ লক্ষ্যে পৌঁছুবার সোজাপথ ১৯৭
পাকিস্তান আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত ২০০
মুসলিম ও অমুসলিমদের সামনে ইসলামের দাওয়াত ২০০
মানুষের ধ্বংসের প্রকৃত কারণ ২০১
মানুষের কল্যাণ কিভাবে হতে পারে? ২০১
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মপন্থা ২০২
রাষ্ট্রের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ২০২
ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ২০২
ইসলামী বিপ্লবের পথ ২০৩
নবী পাকের (সঃ) সে আহ্বানের প্রতিক্রিয়া ২০৪
হিজরতের পর আন্দোলন ২০৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও জনসেবা ২০৯
জামায়াতে ইসলামী ও জনসেবা ২১০
দারুল ইসলাম, পাঠানকোট ২১৩
দারুল ইসলাম বস্তির অতি বেদনাদায়ক দৃশ্য ২১৪
কেন্দ্রীয় জামায়াত লাহোরে স্থানান্তরিত ২১৬
জামায়াতে ইসলামী দু'ভাগে বিভক্ত ২১৮

চতুর্দশ অধ্যায়

জামায়াতের সাহিত্য সৃষ্টি ২১৯
জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য ২২০

পঞ্চদশ অধ্যায়

কাজের মূল্যায়ন ২২৩
বারো দফা আলোচ্য বিষয় ২২৫
সার্বভৌমত্বের ধারণা ও খেলাফতের মতবাদ ২২৫
স্বাধীনতার ধারণা ২২৬
নেতৃত্বের ধারণা ২২৭
গুণগত সদস্যপদ ২২৭
গণতন্ত্রের ধারণা ২২৮
সংগঠনের ধারণা ২২৮
জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও গণতান্ত্রিক দলগুলোর সভাপতির মধ্যে পার্থক্য ২২৯

www.pathagar.org

ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্যের ধারণা ২২৯
জাতীয়তার ধারণা ২৩০
ইসলামের ধারণা ২৩০
মৌলিক অধিকারের ধারণা ২৩১
শাসনব্যবস্থা ও সরকার পরিবর্তনের ব্যাপারে পার্থক্য ২৩২
জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ ২৩২
জামায়াত এক নতুন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ২৩৩
সত্য কি শুধু জামায়াতে ইসলামীর মধ্যেই সীমিত? ২৩৩
দ্বীন ইসলামকে আন্দোলন হিসেবে পেশ করা ২৩৪
একামতে দ্বীনের ধারণা একটা পাগলামি ২৩৫
জামায়াতের বাইরে কি ইসলাম নেই? ২৩৫
রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লালসা ২৩৬
ব্যক্তি সংস্কারের পরিবর্তে সমষ্টির সংস্কারের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে ২৩৬
জামায়াতে ইসলামীর থিওক্র্যাসির (Theocracy) পতাকাবাহী ২৩৭
জামায়াতে ইসলামী একটি নতুন ফের্কা ২৩৭
উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কারণ ২৩৮

পরিশিষ্ট-১
একখানা পত্র ২৩৯
পরিশিষ্ট-২
জামায়াতে ইসলামীর প্রথম সার্কুলার ২৪০
পরিশিষ্ট-৩
এক নজরে জামায়াতের গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনসমূহ ২৪০
পরিশিষ্ট-৪
তর্জুমানুল কুরআনের কিছু মূল্যবান কথা ২৪১
পরিশিষ্ট-৫
জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার কিছু মূল্যবান কথা ঃ
দল গঠনের আবশ্যকতা ২৪৪
তবলীগ ও বিপ্লব ২৪৪
ইকামতে দ্বীন একটি অটল ও অপরিহার্য কর্তব্য ২৪৫
হুকুমতে ইলাহিয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টি ২৪৫
সত্য পথের দাবী ২৪৬
পরিশিষ্ট-৬
সন্দেহ-সংশয় নিরসন ২৪৬
মাওলানার জবাব ২৪৭

www.pathagar.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

জামায়াতে ইসলামী কি?

আল্লাহ তায়ালার যমীনে আল্লাহ তায়ালার পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ রূপে কায়েম করার লক্ষ্যে আন্দোলন, চেষ্টাচরিত্র, সাধনা ও সংগ্রাম করার যে জামায়াত বা দল তাই জামায়াতে ইসলামী।

অতএব জামায়াতে ইসলামী একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আন্দোলন। বাতিল মতবাদ, চিন্তাধারা ও জীবনবিধান খতম করে এবং তার অন্তঃসারশূন্যতা ও অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করে তার পরিবর্তে মানব জাতির জন্যে আল্লাহর দেয়া একমাত্র জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই ইসলামী আন্দোলন এবং এ আন্দোলনের পতাকাবাহী জামায়াতে ইসলামী। অন্যকথায় বাতিল মতবাদ, চিন্তাধারা ও জীবনবিধান মানব জাতির উপর বলপূর্বক চাপিয়ে দিয়ে দুনিয়ায় ফেৎনা-ফ্যাসাদ, অবিচার, জুলুম, নিষ্পেষণ, নরহত্যা, সন্ত্রাস প্রভৃতির দ্বারা মানব জীবনকে যে দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছে, এসবের মূলোৎপাটন করে এক নতুন সুন্দর ও সুখী মানবসমাজ গঠনের সংগ্রাম জামায়াতে ইসলামী করছে। যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে একটি মানুষ তার জীবনকে অর্থবহ, সুখী ও সুন্দর দেখতে পাবে।

ইসলামী আন্দোলনের সূচনা

মানব জাতির জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের সূচনা। তাই মানব জাতির ইতিহাস যত প্রাচীন ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসও ততটা প্রাচীন। ইসলামী আন্দোলন কোন কালের কোন এক সময়ে হঠাৎ করে গজে ওঠা কোন অভিনব বস্তু নয়। বরঞ্চ আবহমান কাল থেকে চলে আসা এক নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার সুদৃঢ় সূত্রে এ বাঁধা। অতীতের ধারাবাহিকতা থেকে একে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। মূলত এ আন্দোলনের ধারক ও বাহক ছিলেন আল্লাহ তায়ালার প্রিয় নবীগণ। আদি মানব হযরত আদম (আঃ) থেকে আরম্ভ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ নবী এ আন্দোলন করেছেন এবং এ উদ্দেশ্যেই তাঁরা দুনিয়ার বুকে প্রেরিত হয়েছিলেন।

মানব জাতির দুঃখ-দুর্দশা ও ধ্বংসের কারণ

মানব জাতির অতীত ও বর্তমান ইতিহাস আলোচনা করলে এ সত্যই উদঘাটিত হয় যে, বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার বিধান অমান্য করে মানুষ যখন খোদাদ্রোহিতা

www.pathagar.org

ও পাপাচার-অনাচারে লিপ্ত হয়েছে, তখনই তাদের জীবনে নেমে এসেছে দুঃখ-দুর্দশা, বিশৃংখলা, অরাজকতা এবং শেষ পর্যন্ত তারা ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। অতীতের ফেরাউন, নমরূদ, আদ, সামুদ প্রভৃতি জাতিসমূহ এবং গ্রীক, রোমান ও পারস্য সভ্যতা এই একই কারণে ধ্বংসের অতল তলে নিমজ্জিত হয়েছে। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে লক্ষ লক্ষ নবীর আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁরা সকলেই বিশ্বস্রষ্টার বাণী ও বিধানের ভিত্তিতে যেসব জাতিকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) একটি অসভ্য, বর্বর, রক্তপিপাসু জাতিকে শুধু ধ্বংস থেকেই রক্ষা করেননি, তাদের জীবনকে খোদার বাণীর আলোকে পরিশুদ্ধ করেছেন, তাদের জীবনে খোদার বিধান প্রতিষ্ঠিত করে তাদেরকে একটা উন্নতমানের জাতিতে পরিণত করেছেন। তিনি এমন এক আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যার নজীর অতীত ও বর্তমানের কোন কালেই পাওয়া যায় না। তিনি এমন এক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করে গেছেন যেখানে মানুষের জীবনের প্রতিটি বিভাগে শুধু কল্যাণেরই পথ উন্মুক্ত হয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনের নিরাপত্তা ভোগ করতে পেরেছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই ছিল মানুষের একমাত্র সত্যিকার কল্যাণ রাষ্ট্র। অন্য কথায় আল্লাহর শেষ নবী তাঁর সমগ্র নবী-জীবনে যা কিছু করেছিলেন তা ছিল আল্লাহ তায়ালার 'দ্বীন' প্রতিষ্ঠারই আন্দোলন এবং এ আন্দোলন তিনি সাফল্যমণ্ডিত করেছিলেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনের ইসলামী আন্দোলন

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যেমন ইসলামী আন্দোলন, তেমনি দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাতিল শক্তি ও চিন্তাধারার আকীদাহ-বিশ্বাস ও আমল-আখলাকের প্রভাব থেকে তাকে অক্ষুণ্ন, অমলিন ও অবিকৃত রাখার চেষ্টা-সাধনাও ইসলামী আন্দোলন। নবী মুস্তাফা (সঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত দ্বীন তথা ইসলামী ব্যবস্থাকে অমলিন ও অবিকৃত রাখার সংগ্রাম-সাধনাই করেছেন তাঁর সুযোগ্য ও মহান উত্তরসূরী খোলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ)।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলামী আন্দোলন

আগেই বলেছি আল্লাহর প্রিয় নবীগণই ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের ধারক, বাহক, প্রতিষ্ঠাতা ও নেতা। কিন্তু তাই বলে সর্বশেষ নবীর তিরোধানের পর ইসলামী আন্দোলন বন্ধ ও স্তব্ধ হয়ে যায়নি। নবী মুস্তাফার (সঃ) পর এ আন্দোলনের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় উম্মাতে মুসলেমার উপর এবং এ ধারা চলতেই থাকবে যতোদিন দুনিয়ার বুকে মানব জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে। তাই আখেরী নবীর পর খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাঁদের পরে হযরত হুসাইন

www.pathagar.org

শহীদ (রাঃ), হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রঃ), হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম গায্যালী (রঃ), ইমাম আহমদ তাইমিয়া (রঃ) প্রমুখ ইসলামের মহান মনীষীগণ এ আন্দোলন পরিচালনা করেন।

ভারতে ইসলামী আন্দোলন

উল্লেখ্য যে, খেলাফতে রাশেদার পর রাজতন্ত্র কায়েম হলেও মুসলিম শাসিত দেশগুলোতে আইনের উৎস ছিল কুরআন ও সুন্নাহ এবং প্রচলিত ছিল ইসলামী আইন। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রঃ) তাঁর শাসনকালে গোটা শাসন-ব্যবস্থাকে খেলাফতে রাশেদায় রূপদান করেছিলেন। তাঁর পরেও উমাইয়া ও আব্বাসিয়া শাসনামলেও দেশে ইসলামী আইন প্রচলিত ছিল। কারণ তৌহীদে বিশ্বাসী মুসলমান আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানব রচিত আইন কিছুতেই বরদাশত করতে রাজী ছিল না। অবশ্য অনেক শাসক নিজেদের জীবনে পুরোপুরি ইসলামকে মেনে চলেননি।

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন আমলেও দেশে ইসলামী আইন প্রচলিত ছিল। সম্রাট আকবর মুসলিম আইন উচ্ছেদ করে দ্বীনে ইলাহী নামে এক উদ্ভট ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। উদ্দেশ্য ছিল, ইসলাম ও ইসলামী আইন দেশের বুক থেকে নির্মূল করা। কিছু সংখ্যক স্বার্থপূজারী আলেম আকবরের এ উদ্ভট কল্পনা বিলাসকে কার্যকর করার জন্যে প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতা করেন। অপরদিকে অমুসলিম পণ্ডিত ও পারিষদবৃন্দ আকবরকে এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের প্রেরণা দান করেন। ইসলাম ও মুসলমানের এ চরম সংকট সন্ধিক্ষণে ইসলামী আন্দোলনের হাতিয়ার নিয়ে মাঠে নামেন এক মর্দে মুজাহিদ হযরত শায়েখ আহমদ ফারূকী সিরহান্দী মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রঃ)। আকবরের পর দ্বীনে ইলাহীর ভক্ত-অনুরক্ত তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর মুজাদ্দেদে আলফে সানীকে গোয়ালিয়ার দুর্গে বন্দী করে তাঁর সমগ্র রাজশক্তি দিয়েও দ্বীনে ইলাহীকে তার অপমৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারেননি।

মোগল সাম্রাজ্যের পতন যুগে শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলভী (রঃ) লেখনীর মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন শুরু করেন। শাসক, আলেম সমাজ, পীর, বুযুর্গ ও মুসলিম জনসাধারণের চিন্তাধারা ও আমল-আখলাকে যে বিকৃতি এসেছিল তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে সেসবের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে তা খণ্ডন করেন এবং সংস্কার সংশোধনের জন্যে জাতির মধ্যে দুর্বার প্রেরণা সঞ্চার করেন। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে তিনি ইসলামী আন্দোলন না করলেও তিনি ইসলামী চিন্তাধারায় বিপ্লব সাধন করেন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও তার রূপরেখা তুলে ধরেন।

www.pathagar.org

পরবর্তীকালে তাঁর এ চিন্তাধারাকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্যে সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাঈল শহীদের নেতৃত্বে তাহরিকে মুজাহেদীন নামে এক সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয় এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এক পূর্ণাংগ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়। ভারতের সকল অঞ্চল থেকে অসংখ্য মুজাহেদীন এ সশস্ত্র আন্দোলনে শরীক হন। তাঁদের দিন কাটতো অশ্বপৃষ্ঠে রণসাজে সজ্জিত অবস্থায়। রাত কাটতো জায়নামাযে ঠিক সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণে। কিন্তু কতিপয় মুনাফিক ও বিশ্বাসঘাতক মুসলমানের সহায়তায় ১৮৩১ সালে বালাকোট প্রান্তরে হক ও বাতিলের যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয়, তাতে সাইয়েদ আহমদ বেরলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদসহ বহু মুজাহেদীন শাহাদত বরণ করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও আন্দোলনের সাময়িক পতন ঘটে। কিন্তু তার পরেও ইসলামী আন্দোলনের দুর্বার প্রেরণা ভস্মাচ্ছাদিত আগুনের মতো মুসলমানদের বুকে বিদ্যমান থাকে যা মাঝে মাঝে বিস্ফোরিত হতে দেখা যায়।

বালাকোট ট্রাজেডীর একশ' বছর পর ১৯৩১ সালে বৃটিশ ভারতে নতুন করে আবার ইসলামী আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনের সূচনা করেন আটাশ বছর বয়স্ক এক যুবক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

www.pathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কোন আন্দোলন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালককে পৃথক পৃথকভাবে চিন্তা করা যায় না। কোন কালে কোন যুগে কোথাও কোন ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলনের তথা ইসলামী বিপ্লবের দাওয়াত পেশ করলে স্বভাবতই লোক জানতে চায় লোকটি কে ও কেমন। কি তাঁর বংশ পরিচয়, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, স্বভাব-চরিত্র। তাঁর বুদ্ধিমত্তাই বা কেমন? তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য আছে কি-না এবং তাঁর কথাগুলো যুক্তিসঙ্গত ও গঠনমূলক কি-না? সেজন্যে মনে করি আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনার আগে তাঁর প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাই সংক্ষেপে তাঁর পরিচয় পেশ করছি।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আহলে বায়ত অর্থাৎ নবী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ঊর্ধমুখী বংশ পরম্পরা হযরত নকীর (রঃ) মাধ্যমে নবী মুস্তাফার (সঃ) কলিজার টুকরো, হযরত ইমাম হুসাইন শহীদ (রাঃ) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। তাঁর পিতা-পিতামহ ও পূর্ব-পুরুষগণের সকলেই ইসলামী দাওয়াত ও তাবলীগ এবং দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি কাজেই জীবন অতিবাহিত করেন। হযরত খাযা কুতবুদ্দীন মওদূদ চিশ্‌তী (রঃ) ভারতীয় চিশ্‌তিয়া তরিকার পীরগণের আদি পীর ছিলেন। তাঁর নামেই মওদূদী খান্দানের উদ্ভব হয়েছে। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর ঊর্ধতন বাইশ পুরুষ সকলেই কুতবুদ্দীন মওদূদ চিশ্‌তীর নামানুসারে নিজেদেরকে মওদূদী নামে অভিহিত করেন।

ইংরেজী ১৯০৩ সালে হায়দরাবাদের আওরংগাবাদ শহরে সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জন্মগ্রহণ করেন। বাড়িতে গৃহ শিক্ষকের কাছে তাঁর শিশু শিক্ষা শুরু হয়। তাঁর পিতা সাইয়েদ আহমদ হাসান মওদূদী ছিলেন একজন আবেদ ও পরহেযগার বুযুর্গ। তিনি আদর্শ পিতা হিসেবে পুত্র মওদূদীকে ইসলামের ছাঁচে গড়ে তুলেন। চার বছর বয়সেই শিশু আবুল আ'লা পিতার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে গিয়ে জামায়াতসহ নামাযে অভ্যস্ত হন। পাঁচ বছর বয়সে কুরআন পাকের তিরিশটি আয়াত অর্থসহ মুখস্থ করেন। এত অল্প বয়সেই কুরআন, হাদীস, ফেকাহর বিভিন্ন কেতাব, আরবী সাহিত্য প্রভৃতি পাঠ করেন। এগারো বছর বয়সে আওরংগাবাদের একটি স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে তাঁকে ভর্তি করে দেয়া হয়।

www.pathagar.org

সে সময় আল্লামা শিবলী নোমানীর পরিকল্পনা অনুযায়ী হায়দরাবাদ ও আওরংগাবাদে এক নতুন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম হয়। শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু। ইতিহাস, ভূগোল, অংক ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে আরবী সাহিত্য, ব্যাকরণ, কুরআন, হাদীস, ফেকাহ, মানতেক প্রভৃতি পড়ানো হতো। এ মানের ম্যাট্রিকুলেশনকে মৌলভী, ইন্টারমিডিয়েটকে মৌলভী আলেম এবং ডিগ্রী কলেজকে দারুল উলুম বলা হত।

চৌদ্দ বছর বয়সে মৌলভী বা ম্যাট্রিক পাস করার পর পিতা তাঁকে হায়দরাবাদ দারুল উলুমে ভর্তি করেন। ছ'মাস পর পিতা অসুস্থ হয়ে ভূপাল যান। তাঁর চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রুষার জন্যে আবুল আ'লা মওদূদীকে পড়শুনা ছেড়ে ভূপাল যেতে হয়। ১৯২০ সালে পিতার ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁকে পিতারই খেদমত করতে হয়। ফলে তাঁর উচ্চ শিক্ষা অসমাপ্ত রয়ে যায়। পিতার মৃত্যুর পর সতেরো বছর বয়স্ক বালক মওদূদীকে জীবিকার জন্যে সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করতে হয়। আল্লাহ তায়ালা দিয়েছিলেন তাঁকে অসাধারণ প্রতিভা। যার ফলে তিনি জব্বলপুরে 'তাজ' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তিনি দিল্লী যান এবং জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মুখপত্র 'মুসলিম' এবং পরবর্তীকালে 'আল-জমিয়'ত-এর' সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেন।

এ সময় তিনি ইংরেজী ভাষা মাত্র ছ'মাসের মধ্যে এতোটা আয়ত্ত করেন যে, যে কোন ইংরেজী বই পড়ে বুঝতে পারতেন। তিনি তিনখানি ইংরেজী বইয়েরও উর্দূ তরজমা করেন। অবসর সময়ে তিনি তিনজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীনের কাছে আরবী সাহিত্য, হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ প্রভৃতিতে গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

মাওলানা আবদুস সাত্তার নিয়াযী ছিলেন তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন, কুরআন, হাদীস ও আরবী ভাষায় যাঁর গভীর জ্ঞান-গরিমা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যিনি আমল-আখলাকে ছিলেন একেবারে দরবেশ। সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর কাছে প্রতিদিন ফজর নামাযের পূর্বে ঘন্টা খানেক আরবী ব্যাকরণ- সরফ, নাহু, মাকুলাত, মায়ানী ও বালাগাত শিক্ষা লাভ করেন। মাওলানা আশফাকুর রহমান সাহেবের নিকটে হাদীসের দাওরা শেষ করেন। উপরন্তু মাওলানা শরীফুল্লাহ সাহেবের নিকট তাফসীরে বায়যাবী, হেদায়া, মুতাওয়াল অর্থাৎ এলমে মায়ানী ও বালাগাত শিক্ষা লাভ করেন। তিরমিযী ও মুয়াত্তা হাদীস গ্রন্থগুলোরও পুরোপুরি সবক তাঁর কাছে গ্রহণ করেন। এভাবে সাত-আট বছর দিল্লী অবস্থানকালে সাইয়েদ মওদূদী তাঁর অসমাপ্ত শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং আরবী ভাষা ও হাদীস, তাফসীর, ফেকাহ প্রভৃতিতে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

www.pathagar.org

আল-জিহাদু ফিল ইসলাম গ্রন্থ

ইংরেজী উনিশ শ' ছাব্বিশ সনে ভারতবর্ষে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতে অজ্ঞ, দরিদ্র ও অশিক্ষিত মুসলমানদেরকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করার এক অভিযান শুরু করেন। যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জনৈক মুসলমান যুবক শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করেন। ফলে সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক হাংগামার দাবানল প্রজ্বলিত হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা যেখানে-সেখানে মুসলিম বস্তিসমূহ আক্রান্ত হতে থাকে। মুসলমানদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু লুণ্ঠিত হতে থাকে। হিন্দু নেতৃবৃন্দও বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে সকল দোষ মুসলমানদের ঘাড়ে চাপাতে থাকেন। শুধু তাই নয়, ইসলাম ও ইসলামী জিহাদের অপব্যাখ্যা ও অপ-প্রচার দ্বারা ভারতের সর্বত্র চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করতে থাকেন। স্বয়ং মিঃ গান্ধীও এ অপ-প্রচারে অংশগ্রহণ করেন। এসব অপ-প্রচারের জবাব দেয়ার দায়িত্ব ছিল আলেম সমাজের। কিন্তু তৎকালে ভারতীয় আলেমগণের একমাত্র সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে। মুসলিম মিল্লাতের ইসলাম দরদী সিংহ-পুরুষ, মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর প্রায় প্রতিদিন দিল্লী জামে মসজিদে জিহাদের উপর বক্তৃতা করতে গিয়ে কেঁদে বুক ভাসাতেন এবং শ্রোতাদেরকেও কাঁদাতেন। এক দিনের বক্তৃতায় তিনি অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলেন, "হায় আজ যদি ভারতের বুকে এমন কোন আলেমে দ্বীন থাকতেন, যিনি হিন্দুদের এসব অপ-প্রচারের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন।"

উক্ত সভায় শ্রোতা হিসেবে বসে ছিলেন তেইশ বছরের যুবক ও 'আল-জমিয়ত' পত্রিকার সম্পাদক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। তিনি মনে মনে বলেন, আমি আলেমে দ্বীন না হলেও এ কাজ ইনশাআল্লাহ আমিই করব।

একজন সাংবাদিক ও একটি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অত্যধিক কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি ছ'মাসের মধ্যে বড়ো আকারের ছ'শ' পৃষ্ঠাব্যাপী ইসলামী জিহাদের উপর এক তথ্যবহুল গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর পরিবেশনায় দারুল মুসান্নেফীন আযমগড়-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি মাওলানা মওদূদীর প্রথম প্রচেষ্টা হলেও তা ছিল তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, গভীর ইসলামী জ্ঞান ও শক্তিশালী লেখনী-শক্তির স্বর্ণ ফসল। গ্রন্থখানির নাম রাখা হয় 'আল-জিহাদুল ফিল ইসলাম'।

এ বিরাট গ্রন্থখানি প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে ইসলামী জিহাদের মর্যাদা, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ, সংস্কারমূলক যুদ্ধ, ইসলাম প্রচার ও তরবারি এবং যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে ইসলামী আইন-কানুনের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।

www.pathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মের যুদ্ধনীতি। সপ্তম অধ্যায়ে বর্তমান সভ্যতার অধীনে পরিচালিত যুদ্ধ-সন্ধিকে আলোচনার বিষয়বস্তু করা হয়েছে। এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, বিষয়টির উপরে এমন তথ্যবহুল, যুক্তিপূর্ণ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ দুনিয়ার কোন ভাষায় কোন গ্রন্থকারের দ্বারা লিখিত হয়নি। এ সম্মান ও খ্যাতি আল্লাহ তায়ালা দান করেন একমাত্র মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে।

আল জিহাদু ফিল ইসলাম-রচনার পূর্বে ১৯২৫ সালের জুলাই ও আগস্টে কয়েক কিস্তিতে- 'ইসলাম কা সারচাশমায়ে কুওয়াত' শীর্ষক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ আল-জমিয়াতের সংখ্যায় তিনি প্রকাশ করেন, যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি এ কথার উপর গুরুত্ব দেন যে, প্রত্যেক মুসলমানকে ইসলামী শিক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে আপন আপন প্রচেষ্টায় তাবলীগে দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিতে হবে। তাঁর এ কথাগুলো সকল মহল কর্তৃক সমাদর লাভ করে।

এ যাবৎ জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ কংগ্রেসের একজাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত পোষণ করেনি। এ যাবৎ মাওলানা আবুল কালাম আযাদও একজাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিলেন। তিনি ১৯২৮ সালে তাঁর সম্পাদিত দৈনিক আল-হেলাল পত্রিকায় (তাং স্মরণ রাখা সম্ভব হয়নি) একজাতীয়তাবাদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন- "হিন্দু আওর মুসলমানোঁ কো আপস্ মে মেলাকর এক কওমিয়ত কি চীয কিয়া হায়? কিয়া ইনমে সে এক তেল আওর দুসরা পানি নিহি?

কিন্তু হঠাৎ ১৯২৮ সালে কোন অজ্ঞাত কারণে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন ঘটে এবং কংগ্রেসের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। মাওলানা মওদূদী কোন দিনই কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হতে পারেননি, যার জন্যে তাঁকে আল-জমিয়তের সাথে সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করতে হয়। মাওলানা আবুল কালাম আযাদও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেন।

www.pathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা ও ইসলামী আন্দোলনের প্রস্তুতি স্তর

আল-জমিয়ত ও সাংবাদিকতার ময়দান পরিত্যাগ করে ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে মাওলানা মওদূদী হায়দরাবাদ যান, যেখানে উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দারুত্তরজমা' বিভাগে তাঁর বড় ভাই সাইয়েদ আবুল খায়র মওদূদী এক দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হায়দরাবাদ অবস্থানকালে মাওলানা সালজুক বংশের ও দাক্ষিণাত্যের পূর্ণাংগ ইতিহাস রচনা করেন। তিনি ইবনে খালকানের ঐসব অধ্যায়েরও তরজমা করেন, যা মিসরে ফাতেমীয় খলীফাদের সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়। সম্ভবত তিনি শেষোক্ত কাজটি উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে করেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের তরজমা বিভাগের অনুরোধে তিনি 'আল হিকমাতুল মুতাআলিয়া ফিল আসফারিল আকালিয়া' নামক গ্রন্থের চার খণ্ডের মধ্যে শেষ দু'খণ্ডের তরজমা করেন। এ ছিল আল্লামা সদরুদ্দীন সিরাজীর আরবী ভাষায় লেখা দর্শন শাস্ত্রের একটি অতি জটিল গ্রন্থ। এর সঠিক তরজমার জন্য তরজমা বিভাগ থেকে তাঁকে মোটা অংকের পারিশ্রমিক দেয়া হয়। সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী তরজমার কাজ তিনি মাত্র আট মাসে শেষ করেন। পারিশ্রমিকের অর্থ দিয়ে তিনি হাদীস-তাফসীরের বহু মূল্যবান গ্রন্থ, এনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকার সকল খণ্ড খরিদ করেন এবং পাঁচ হাজার টাকা তাঁর পরিকল্পিত ইসলামী খেদমতের জন্যে জমা রাখেন।

তারপর তিনি ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর গবেষণা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে হায়দরাবাদ, ভূপাল ও দিল্লী যাতায়াত করে তথাকার গ্রন্থাগারগুলো থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করতে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এমন অসাধারণ স্মরণশক্তি দান করেন যে, যা তিনি একবার পড়েন তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য পুরোপুরি উপলব্ধি করেন এবং তা আর কোন দিন ভুলে যান না। মাওলানা একবার বলেন, বিভিন্ন গ্রন্থাগারের বিভিন্ন আলমারীতে যতো মূল্যবান বই-পুস্তক ছিল তার সবকটি তাঁর হৃদয়ে গাঁথা আছে।

www.pathagar.org

তৎকালীন ভারতে মুসলমানদের অবস্থা

বর্তমান শতকের বিশের দশকে খেলাফত আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব দ্বীনি ও জিহাদী প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কিন্তু সমগ্র ভারতব্যাপী পাঁচ ছ'বছর ক্রমাগত খেলাফত আন্দোলন চলার পর যখন তা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন মুসলমানদের সকল আশা-ভরসা নির্মূল হয়ে যায়। তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে, নৈরাশ্যের ক্ষোভে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে, রাজনৈতিক ময়দানে প্রতিপক্ষের মুকাবিলা করার সকল হিম্মত ও তাকত্ তারা হারিয়ে ফেলে। জনসাধারণও তাদের নেতৃবৃন্দের প্রতি আস্থা হারিয়ে পথহারা হয়ে পড়ে। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দও কংগ্রেসের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে এবং খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদও আর কোন উপায় নেই মনে করে কংগ্রেসের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে যান।

এ সুযোগে কংগ্রেস একজাতীয়তার ভিত্তিতে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে এবং মুসলমানদেরকে উপেক্ষা করে চলে। তদুপরি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উপরোক্ত উদ্দেশ্যে গণ-সংযোগ আন্দোলন (Mass Contact Movement) শুরু হয়। পাশাপাশি শুদ্ধি আন্দোলনও প্রকাশ্যে এবং জোরেশোরে চলতে থাকে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারা শিক্ষিত মুসলমানদেরকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। উপরন্তু বহু সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রসমাজ কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আলেমদের মধ্যেও অনেকে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। স্বয়ং জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মুখপত্র সমাজতন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বিষ ছড়াতে থাকে। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি বলতে গেলে সমাজতন্ত্রের শিক্ষা ও দীক্ষা কেন্দ্র হয়ে পড়ে।

এসব কিছু ছিল একটা সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশী প্লাবনের সংকেতধ্বনি। ঠিক এ সময় মাওলানা মওদূদী সাংবাদিকতার পেশা পরিত্যাগ করে বেকার জীবন যাপন করছিলেন। মাওলানা মানাযের আহসান গিলানী মাওলানার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে হায়দরাবাদের নিজামের প্রধানমন্ত্রীর স্যার আকবর হায়দারীর সাথে সাক্ষাৎ করে উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসিক আটশ' টাকা বেতনে এক অধ্যাপকের পদ ঠিক করেন। মাওলানা তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁর বড়ো ভাই তাঁকে বহুক্ষণ ধরে বুঝালেন। কিন্তু মাওলানা বলেন, ভাইজান! অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়েছে। আমি দেখছি, যে প্লাবন আসছে তা ১৮৫৭ সালের ইংরেজদের বিপ্লবের চেয়ে ঢের বেশী মারাত্মক। এ বিপদ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়া আমার কর্তব্য। আমার সাধ্যমত তাদের খেদমত করার চেষ্টা অবশ্যই আমি করব। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা যেতে পারে না। আমার বিশ্বাস, যদি আমার উদাত্ত আহ্বানের মধ্যে আন্তরিকতা ও সততা থাকে, তাহলে আমার মনের আবেগ ব্যর্থ হবে না।

www.pathagar.org

তর্জুমানুল কুরআনের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন

ইংরেজী ১৯৩১ সালের ৩১ জুলাই মাওলানা মওদূদী দিল্লী থেকে হায়দরাবাদে ফিরে আসেন। হায়দরাবাদ শহরের জনৈক নেকদিল মুসলমান আবু মুহাম্মদ মুসলেহ 'মজলিসে তাহরিকে কুরআন' নামে একটি সংস্থা কায়েম করে তার পক্ষ থেকে 'তর্জুমানুল কুরআন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা কিছুকাল যাবৎ বের করছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল কুরআনের পবিত্র বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেয়া। তিনি মাওলানা মওদূদীর প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও অগাধ ইসলামী জ্ঞানের প্রতি মুগ্ধ হয়ে তর্জুমানুল কুরআনের সম্পাদনা-ভার তাঁর উপর ন্যস্ত করেন। ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজে পত্রিকাটিকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারবেন বলে মাওলানা এ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন থেকে তর্জুমানুল কুরআনের পশ্চাৎ পৃষ্ঠায় (Back page) নিম্নের কথাগুলো প্রতি মাসে নিয়মিত ছাপা হতে থাকে ঃ

"সমগ্র ভারতে এ ধরনের পত্রিকা মাত্র এ একটি। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর ডাক দেয়া। দুনিয়ায় যেসব চিন্তাধারা, মতবাদ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলনীতি ছড়ানো হচ্ছে, কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে তার পর্যালোচনা-সমালোচনা করা; দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিকতা মোটকথা প্রতিটি বিষয়ের কুরআন ও সুন্নাহর উপস্থাপিত মূলনীতির আলোকে ব্যাখ্যা দান এবং বর্তমান যুগের অবস্থার সাথে এসব মূলনীতিকে সুসামঞ্জস্য করা এ পত্রিকাটির মূল লক্ষ্য ও আলোচ্য বিষয়। এ পত্রিকাটি উম্মতে মুসলেমাকে এক নব জীবনের দাওয়াত দিচ্ছে। তার দাওয়াতের সারমর্ম এই ঃ

"নিজের মন-মস্তিষ্ককে মুসলমান বানাও। জাহেলিয়াতের রীতি-পদ্ধতি পরিহার করে ইসলামের সিরাতুল মুস্তাকীমের উপরে চলো। কুরআন হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড় এবং দুনিয়ার বুকে বিজয়ীর বেশে অবস্থান কর"।

আল্লাহ তায়ালার খাস মেহেরবানীতে অল্প বয়সেই সাইয়েদ মওদূদী একজন সূক্ষ্মদর্শী, তত্ত্ববিদ ও তত্ত্বদর্শীর গুণাবলী অর্জন করেছিলেন। তিনি একজন সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় মুসলিম জাতির সত্যিকার ব্যাধি নির্ণয় করে তার সঠিক ব্যবস্থাপত্রও দান করেন। মাওলানা তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ" প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলেন,

প্রত্যেকেই একটুখানি চিন্তা-ভাবনা করলে এ কথা বুঝতে পারে যে, একটি পুরাতন আন্দোলনকে তার বিকৃতি ও পতনের পর পুনর্জাগরিত করা কোন নতুন আন্দোলন শুরু করা অপেক্ষা বড়ো কঠিন ও জটিল। নতুন আন্দোলনকারীর পথ তো পরিষ্কার থাকে। তাকে তো এমন সব লোকের সম্মুখীন হতে হয় যারা

www.pathagar.org

আন্দোলন সম্পর্কে অনবহিত। তাকে শুধু তার আন্দোলনের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য পেশ করতে হয়। তারপর লোক তার দাওয়াত হয় গ্রহণ করবে নয়ত প্রত্যাখ্যান করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন পুরাতন আন্দোলনকে তার পতন ও বিকৃতির পর পুনর্জীবিত করতে চায়, তার কাজ শুধু ততোটুকু হয় না যে, সে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন সব লোকের কাছেই তার দাওয়াত পেশ করবে। বরঞ্চ তাকে ঐসব লোকের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হয় যারা আগে থেকে আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট। সে তাদেরকে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না, যারা আগে থেকেই এ আন্দোলনের সাথে জড়িত এবং অন্যের তুলনায় নিকটতর। এখন তাকে সর্বপ্রথম দেখতে হয় যে, তাদের অধঃপতন-অবনতি কতখানি হয়েছে এবং মূল আন্দোলনের প্রভাব এদের মধ্যে কতটুকু বাকী রয়েছে। তারপর তাকে চিন্তা করতে হয় যে, পতনের দিকে যতদূর তারা অগ্রসর হয়েছে, তার থেকে যেন আর সামনে এগুতে না পারে এবং আন্দোলনের যতোটুকু প্রভাব তাদের মধ্যে আছে তা যেন সংরক্ষিত থাকে।... সংরক্ষণের এ প্রক্রিয়ায় কিছুটা সাফল্য লাভের পর এটা লক্ষ্য করা তার জন্যে অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, তারা যেন বর্তমান অবস্থার উপরেই স্থির হয়ে না থাকে। বরঞ্চ মূল আন্দোলনের দিকে তাদেরকে টেনে আনতে হবে যাতে অন্য কিছু তাদের লক্ষ্য না হয়ে পড়ে এবং তাদের চেষ্টা-চরিত্রের কেন্দ্রবিন্দু অন্য কিছু না হয়ে পড়ে তার দিকেও তাকে লক্ষ্য রাখতে হয়। এসব স্তর অতিক্রম করার পর সাধারণ দাওয়াত পেশ করার সুযোগ তার আসে এবং সে তখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যেখান থেকে সে এক নতুন আন্দোলন পেশকারীর কাজ শুরু করতে পারে।

মাওলানা বলেন, যেহেতু আমার লক্ষ্য ছিল ইসলামী আন্দোলনের পুনর্জাগরণ, সে জন্যে আমাকে উপরোক্ত ক্রমানুসারে আমার উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হতে হয়েছে। তর্জুমানুল কুরআনের প্রথম চারটি বছর আমাকে এ চেষ্টাই করতে হয়েছে যে, মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে গোমরাহী যে যে রূপ ধারণ করেছিল, সুস্পষ্ট করে তা ধরে দিতে হয়েছে এবং ইসলাম থেকে তাদের মধ্যে দৈনন্দিন যে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছিল তা রুখবার চেষ্টা করেছি।

মাওলানা মওদূদীর উপরোক্ত মহান দায়িত্ব ও চেষ্টাচরিত্রের বিশদ বিবরণ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর "তানকীহাত" গ্রন্থে, যা বাংলা ভাষায় ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব নামে প্রকাশিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আবু মুহাম্মদ মুসলেহ সাহেবের মালিকানাধীন যে তর্জুমানুল কুরআন মাওলানা সম্পাদনা করছিলেন, ১৯৩২ সালের প্রারম্ভেই তার মালিকানা তিনি খরিদ করে স্বাধীনভাবে দ্বীন ও মিল্লাতের খেদমত করতে থাকেন। এভাবে পাঁচ বছর অতীত হওয়ার পর ১৯৩৭ সালে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে এক ভয়ঙ্কর

www.pathagar.org

কালো মেঘের সঞ্চার হয় এবং তা থেকে ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের যে প্রবল ঘূর্ণিবার্তা শুরু হয় তার প্রচণ্ড আঘাতে মুসলমানদের জাতীয় সত্তা বিপন্ন হয়। ঘটনা এই যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে সারা ভারতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৭ সালে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

ভৌগোলিক একজাতীয়তার ভিত্তিতে নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে ভারতের ভবিষ্যত ক্ষমতা হস্তান্তরের কি ভয়াবহ ও বিষময় ফল হতে পারে- তারই বাস্তব প্রমাণ পেশ করলো এই কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলো। এ প্রদেশগুলোতে (বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বে) মুসলমানদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বেড়ে যায়, গান্ধীর ওয়ার্ধা স্কীম অব এডুকেশন, বিদ্যামন্দির প্রভৃতি শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনার মাধ্যমে মুসলমান জাতির স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুসলমানদেরকে গোলাম জাতিতে পরিণত করার অপপ্রয়াস চলতে থাকে। দৃশ্যত এ প্রদেশগুলোতে হিন্দু রামরাজত্ব কায়েম হয়। সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কায়েম হলেও তা ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মুসলমান- ডাঃ খান, সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গাফফার খানের ভাই।

এটা উল্লেখযোগ্য যে, ঊনচল্লিশের মাঝামাঝি যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় যার এক পক্ষের সাথে বৃটিশ সরকার সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এ যুদ্ধের ব্যাপারে বৃটিশের সাথে সহযোগিতার প্রশ্নের ভারতীয় কংগ্রেস দ্বিমত পোষণ করে এবং প্রতিবাদস্বরূপ সকল কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা এক সাথে পদত্যাগ করে, যার জন্যে মুসলিম লীগ সারা ভারতে শুকরিয়া দিবস পালন করে। এর বেশী কিছু করার তাদের ছিল না।

যা হোক, এসব মন্ত্রিসভার আমলে একবার হায়দরাবাদ থেকে দিল্লী সফরকালে মাওলানা মওদূদী লক্ষ্য করেন যে, বিভিন্ন স্টেশনে মুসলমানগণ জনৈক হিন্দু নেতা- ডাঃ খারের সাথে এমনভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করছে যেন গোলাম তার প্রভুর সামনে নতশিরে কাকুতি-মিনতি জানাচ্ছে। মাওলানা এ দৃশ্য দেখে অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হন। তিনি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন গণসংযোগের (Mass Contact Movement) মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আন্দোলন এবং হিন্দুদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন যাপন পদ্ধতি এতোটা বদলে দেবে যে, দু'এক পুরুষের মধ্যে ভারতে ইসলাম এতোটা অপরিচিত হয়ে পড়বে যতোটা জাপান অথবা আমেরিকায় অপরিচিত রয়েছে এবং এ অবস্থা কিছুতেই চলতে দেয়া যায় না। তাই মাওলানা শক্ত হাতে কলম ধরেন এবং মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন- যা চল্লিশের আগে তিন খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.org

দারুল ইসলাম ট্রাস্ট গঠন ও ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যে দল গঠনের পটভূমিকা রচনা

উনিশ শ' সাঁইত্রিশ সালে আল্লামা ইকবাল হায়দরাবাদ থেকে পাঞ্জাবে হিজরত করার জন্যে মাওলানা মওদূদীকে আহ্বান জানান। আল্লামা ইকবাল তর্জুমানুল কুরআনের মাধ্যমে মাওলানার গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। অসুস্থতা ও শারীরিক দুর্বলতার কারণে তিনি কখনো সাইয়েদ নাযীর নিয়াযী এবং কখনো মিয়া মুহাম্মদ শফীকে দিয়ে তর্জুমানুল কুরআন পড়াতেন এবং মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।

ঠিক এ সময়ে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত এসডিও চৌধুরী নিয়ায আলী তাঁর ষাট-সত্তর একর জমি ইসলামের খেদমতের জন্যে ওয়াকফ করেছিলেন। সেখানে বিভিন্ন ধরনের পাকা ঘর-বাড়ী তৈরী করে বিশেষ পরিকল্পনার অধীনে দ্বীনের বৃহত্তর খেদমতের অভিলাষী তিনি ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে আল্লামা ইকবালের পরামর্শ চাইলে আল্লামা একমাত্র মাওলানা মওদূদীকেই এ কাজের জন্যে যথাযোগ্য ব্যক্তি মনে করেন। মাওলানা মওদূদী ডঃ ইকবালের অনুরোধে তাঁর সাথে বিস্তারিত আলোচনার পর এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হন এবং চিরদিনের জন্যে হায়দরাবাদ পরিত্যাগ করে ১৯৩৮ সালের ১৬ই মার্চ পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোট নামক স্থানে হিজরত করেন। অতঃপর 'দারুল ইসলাম' নামে একটা ট্রাস্ট গঠন করে তাঁর মহান কাজের সূচনা করেন।

দারুল ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। খেলাফতে রাশেদার অবসানের পর মুসলমানদের সামনে চিন্তা ও কাজের দিক দিয়ে কোন আদর্শ পরিবেশ ছিল না এবং আজকাল মুসলমানদের জন্যে দারুল ইসলামের কোন নমুনা কোথাও বিদ্যমান নেই।

২। এখন এ উদ্দেশ্যে কাজের সূচনা করতে হলে এমন এক জনপদের প্রয়োজন, যেখানে আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসার মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রাধান্য সূচিত হবে এবং গোটা পরিবেশে ইসলামের প্রাণ সঞ্চারিত হবে।

৩। এখানে ইসলামী শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামী চরিত্র গঠনেরও ব্যবস্থা থাকবে এবং এখানে দ্বীনি ইলেমের সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেও কিছু লোককে বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলা হবে- যেন তাঁরা চিন্তার ক্ষেত্রে বাতিল ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন।

৪। এ সংস্থার অধীনে মুবাল্লেগীনের একটি সুদক্ষ ও চরিত্রবান টীম তৈরী করা হবে- যাঁরা মুসলমান জনপদে ইসলামী চিন্তাধারা ও কাজের প্রচার-প্রসার করবেন এবং তারপর তাদেরকে সংগঠিত করবেন।

www.pathagar.org

৫। এ ইসলামী পরিবেশে অবস্থান করার জন্যে সাময়িকভাবে বাইরে থেকেও কিছু লোক আসতে পারবে- যাতে করে এ পরিবেশের প্রভাবে তাদের আকীদাহ-বিশ্বাস ও স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন ঘটতে পারে। অমুসলিম বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতগণও এখানে এসে ইসলামী জীবন যাপনের নমুনা স্বচক্ষে দেখতে পারবেন। অতএব এভাবেই খেলাফতে রাশেদার মহান সভ্যতাকে তুলে ধরা যেতে পারে।

দারুল ইসলামে হিজরত করার সিদ্ধান্তের পর মাওলানা ঘোষণা করেন যে, ১৯৩৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী তর্জুমানুল কুরআনের হায়দরাবাদ অফিস বন্ধ হয়ে যাবে এবং পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অধীন জামালপুর, পাঠানকোটের দারুল ইসলামে ২৩শে জানুয়ারী তর্জুমানুল কুরআনের অফিস খোলা হবে।

আটত্রিশের ১৬ই মার্চ পাঠানকোটে পৌঁছার পর ঐদিনই তিনি ট্রাস্ট্রের ওয়াক্‌ফ কমিটির সামনে দারুল ইসলামের শর্তনামা পেশ করলে কমিটি তা অনুমোদন করে। তারপর মাওলানা তাঁর কাজের পরিকল্পনা তৈরী করেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে মাওলানার সাথে ট্রাস্ট্রের যাঁরা দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁরা ছিলেন- মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, জনাব আবদুল আযীয শার্কী, মিস্ত্রী মুহাম্মদ সিদ্দীক এবং সাইয়েদ মুহাম্মদ শাহ। মাওলানা মাত্র চারজন সহকর্মী নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের যে বীজ বপন করেন, তা পরবর্তীকালে এক বিরাট ও শক্তিশালী বৃক্ষে পরিণত হয়- যার শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

www.pathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়

দারুল ইসলাম পরিকল্পনা ও মাওলানা মওদূদী

বিগত ঊনিশশ' আটত্রিশ সালে আল্লামা ইকবালের পরামর্শে এবং চৌধুরী নিয়ায আলী নামক জনৈক ইসলাম দরদী মহৎপ্রাণ ব্যক্তির অনুরোধে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ শহর থেকে চিরদিনের জন্যে হিজরত করে পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার পাঠানকোট থানার অধীন জামালপুর নামক নিভৃত পল্লীতে বসবাস শুরু করেন। তিনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার যে চিত্র তাঁর মনে এঁকেছিলেন এবং নিরলসভাবে বছরের পর বছর ধরে তিনি চিন্তার যে জাল বিস্তার করে চলেছিলেন তাকে বাস্তবরূপ দেয়ার জন্যে উপরোক্ত নিভৃত পল্লী বেছে নিয়েছিলেন। এখানে এসে তিনি 'দারুল ইসলাম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। এ প্রতিষ্ঠান কায়েমের লক্ষ্য এবং এর পটভূমি সম্পর্কে যে বিবরণ তিনি দারুল ইসলাম ট্রাস্ট্র কমিটির সামনে পেশ করেন- তা প্রতিটি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর জানার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। বিবরণ পাঠ করলে পাঠক নিজেই তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

ষোলই মার্চ পাঠানকোট আগমনের একমাস পর ১৬ই এপ্রিল দারুল ইসলাম ট্রাস্ট্রের সামনে মাওলানা তিনটি শর্ত উপস্থাপন করেন। এই শর্তগুলোর যে কোন একটি গ্রহণের আবেদন জানিয়ে তিনি যে বক্তব্য পেশ করেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো। দারুল ইসলাম ট্রাস্ট্র গঠিত হয়েছিল পাঁচ ব্যক্তিকে নিয়ে- যথা, খান সাহেব শেখ মুহাম্মদ নাসীর, মৌলভী রহমত আলী, আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ, চৌধুরী নিয়ায আলী খান (দাতা) এবং মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

মাওলানার বক্তব্য ঃ

"দারুল ইসলামের ব্যবস্থাপনা সঠিক মূলনীতির ভিত্তিতে কায়েম করার পর তাকে পরিচালনা করার ব্যাপারে আমার প্রস্তাব-পরামর্শ পেশ করার পূর্বে তার পটভূমি আপনাদের সামনে রাখতে চাই যাতে আপনারা জানতে পারেন যে, এর ধারণা কিভাবে আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল, ক্রমবিকাশের কোন কোন স্তর অতিক্রম করে কতদূর তা অগ্রসর হয়েছে এবং আমি কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে হায়দরাবাদ থেকে এখানে এসে পড়েছি।

"আপনারা জানেন, বিগত পাঁচ বছর ধরে আমি "তর্জুমানুল কুরআন" পত্রিকাটি প্রকাশ করে আসছি। এ পত্রিকাটি প্রকাশের উদ্দেশ্য শুধু এটা ছিল না যে, আমি একটা পত্রিকা বের করতে চাই। বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ ১৫ বছর যাবৎ মুসলমানদের জাতীয় জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের সাথে সাথে পড়াশুনা ও চিন্তাভাবনা করার পর আমি এ সিদ্ধান্তে

www.pathagar.org

পৌঁছেছি যে, মুসলমানদের জাতীয় শক্তি যেভাবে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে এবং তারা ক্রমশ যেভাবে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তার প্রত্যক্ষ কারণ হচ্ছে এই যে, তারা তাদের সভ্যতা- সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদ থেকে সরে পড়েছে। এখন তাদের সামগ্রিক জীবনকে চিন্তা ও কাজের দিক দিয়ে ঐ মূল বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা ব্যতীত তাদের সংশোধনের আর কোন উপায় নেই। এ উদ্দেশ্যে আমি এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করতে চাচ্ছিলাম। তার খসড়া এখন আমি আপনাদের সামনে পেশ করব। কিন্তু এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান কায়েমের পূর্বে প্রয়োজন ছিল যে, সর্বপ্রথম আমি ঐসব ধারণা-বাসনা লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দেই যা আমার মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। তারপর একটা যথেষ্ট সময় কাল পর্যন্ত তা লোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকবে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে এমন কিছু লোক তৈরী হয়ে যাবে যাদের ধারণা-বাসনা ও লক্ষ্য আমার ধারণা-বাসনা ও লক্ষ্যের সাথে এক হয়ে যাবে। তখন তাদের একটি কেন্দ্রের দিকে আহ্বান করা হবে এবং ঐ ব্যবস্থাকে রূপ দান করা হবে যা আমি করতে চাই।"

"এ উদ্দেশ্যে আমি তর্জুমানুল কুরআন পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করি। অন্য কথায় এটা মনে করুন যে, আমি একখানা পত্রিকা চালু করিনি, বরঞ্চ মাছ ধরার জন্যে একটি জাল ছড়িয়েছিলাম। সেই সাথে আমি একটা ব্যবসার কাজও শুরু করেছিলাম।[১] তারপর যতোদিন না আমি আমার পরিকল্পিত কেন্দ্র নির্মাণ করার জন্যে জমি লাভ করতে সমর্থ হই, ততোদিন যেন আমার এ ব্যবসার এতোখানি উন্নতি হয় যে তা যেন কেন্দ্রের ব্যয় বহন করতে সক্ষম হয় এবং কেন্দ্রের ঘরদোর নির্মাণের জন্যে আমাকে কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয়। কারণ আমি আমার সমকালীন সামর্থ্যবান ও মর্যাদাশীল মুসলমানদের মানসিকতা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমি জানি, কোন মহৎ প্রেরণা সহকারে এ সব লোক কোন কাজে অর্থ ব্যয় করলে তাঁরা চান যে, সে কাজের নির্দেশ তাঁরাই দেবেন এবং পরিচালনা তাঁরাই করবেন- পরিচালনার যোগ্যতা তাঁদের থাক বা না থাক। তার জন্যে আমি প্রথম থেকেই স্থির করে রেখেছিলাম যে, এ ইমরাতটি আমি আপন শক্তি-সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে এবং নিজের তৈরী নকশা অনুযায়ী বানাব। যাঁরা এ কাজে আর্থিক সাহায্য করতে চাইবেন এ শর্তে তাঁদের সাহায্য গ্রহণ করব যে, নির্মাণ কাজে তাঁরা কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করবেন না। আমার এ পরিকল্পনা অনুযায়ী হায়দরাবাদে একখণ্ড জমিও খরিদ করেছিলাম। সেখানে আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘরদোর তৈরীর ইচ্ছা ছিল।"

"আমি আমার পথেই অগ্রসর হচ্ছিলাম এমন সময় হঠাৎ একটি জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তা হলো চৌধুরী নিয়ায আলী খান সাহেবের একখানা পত্র যা ১৯৩৫ সালের আগস্টে আমার হস্তগত হয়। সে পত্রে চৌধুরী সাহেব

১- মাওলানা ১৯৩৭-৩৮ সালে একজন হেকিমের সাথে অংশীদার হিসেবে ঔষধের ব্যবসা শুরু করেন।

www.pathagar.org

কোন মহৎ কাজের জন্যে একটি মূল্যবান সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। তা কোন কাজে ওয়াক্‌ফ করা যায় এ সম্পর্কে তিনি আমার পরামর্শ চান। জবাবে আমি আমার চিন্তাধারা তাঁকে লিখে জানাই যার জন্যে আমি নিজেই কাজ করছিলাম। ঐ বছরই ২১শে আগস্ট আমি তাঁকে এ পত্র লিখি ঃ

"প্রথম যুগে মুসলিম সুফীগণ এক বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছিলেন, যা আসহাবুসসুফ্‌ফার অনুকরণে করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'খানকাহ' নামে তা প্রসিদ্ধি লাভ করে। আজকাল তা বিকৃত হয়ে এমন বিশ্রী হয়ে পড়েছে যে, খানকাহ নাম শুনতেই মন ঘৃণায় ভরে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ছিল একটা অতি উত্তম প্রতিষ্ঠান। এই খানকাগুলো থেকে ইসলামের বিরাট বিরাট মনীষী তৈরী হয়েছেন। এখন এই পূর্বতন প্রতিষ্ঠানকে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধিত করে প্রাণ সঞ্চার করতে হবে। ভারতের স্থানে স্থানে ছোটো ছোটো এমন কিছু খানকাহ কায়েম করতে হবে, যেখানে শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন এমন কিছু লোককে কিছুকাল রেখে ইসলাম সম্পর্কে অত্যন্ত উচ্চস্তরের সাহিত্য তাঁদেরকে পড়াতে হবে। সাথে সাথে সেখানকার পরিবেশ এমন হতে হবে যেখানে বসবাস করার পর তাদের চরিত্র বিশুদ্ধ ইসলামের রঙে রঞ্জিত হবে। এ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্লাব, লাইব্রেরী, একাডেমী, আশ্রম প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয় থাকবে। তার সভাপতি বা প্রধান ব্যক্তি শুধু একজন দূরদর্শী ও উদারপন্থী আলেমই হবেন না, বরং বাস্তব জীবনে একজন সত্যিকার পূর্ণ মুসলমান হবেন। তাহলেই তাঁর সুহবতে খানকার সদস্যগণের জীবন ইসলামী ছাঁচে গড়ে উঠবে। এসব পরিকল্পনা নির্ভর করে উক্ত খানকার শায়খ নির্বাচনের উপর। অন্তত পরিচিত ও প্রসিদ্ধ লোকদের মধ্যে এমন কোন লোক আমার চোখে পড়ে না যাঁর মধ্যে সকল শর্ত পুরোপুরি পাওয়া যায়। এ কাজ যদি আপনি করতে চান, তাহলে একবার গোটা হিন্দুস্তান সফর করুন। হয়তো কোন নিভৃত স্থানে কোন আলেম বা-আমল আপনি পেয়ে যেতে পারেন।"

সৌভাগ্য বলতে হয় যে, চৌধুরী সাহেবের মনও তাই তালাশ করছিল যা আমি তাঁর সামনে পেশ করেছিলাম। এ চিন্তা-ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয় এবং তার জন্যে তিনি চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁর কয়েক মাস পর ১৯৩৬ সালের ৬ই মার্চ তাঁর দ্বিতীয় পত্র আমার হস্তগত হয়। তাতে তিনি আমাকে জানান যে, ওয়াক্‌ফনামা রেজিস্ট্রি করা হয়ে গেছে এবং ঘরদোর বানানোও শুরু হয়েছে কিন্তু শায়খ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

"জনাব আমাকে বলেছিলেন, আমি যেন এখন কোন বুযুর্গের সন্ধানে হিন্দুস্তানে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু এ কাজে এ ধরনের লোক কি কোথাও পাওয়া যাবে? যদি আমাকেই এ কাজ করতে হয়, তাহলে আমি আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি কেন?

www.pathagar.org

জনাব, আপনি স্বয়ং কেন এ শিক্ষাপীঠ (দারসগাহ) বা খানকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন না? আপনার পত্রিকা তর্জুমানুল কুরআন এখান থেকেই চালান।"

ঐ পত্রের জবাব ২৩শে এপ্রিল দিই এবং তা হলো নিম্নরূপ ঃ

"আমার অবস্থা এই যে, আমি ক'বছর আগেই এ স্কীম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছিলাম যা আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি। এ স্কীমের সূচনা আমি তর্জুমানুল কুরআন দিয়ে করেছি। আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্যে পত্রিকা প্রকাশনার সাথে সাথে একটা ব্যবসার কাজও শুরু করেছি, যা আল্লাহর ফজলে কামিয়াবীর পথে। এতে কামিয়াব হওয়ার পর ইনশাআল্লাহ স্বয়ং উচ্চ শিক্ষিত যুবকদের একটা দল বেছে নেব এবং স্কীম বাস্তবায়নের চেষ্টা করব। এমন অবস্থায় আমার পক্ষে হায়দরাবাদ ত্যাগ করা বড় মুশকিল। আর আপনিও তা পছন্দ করবেন না। কিন্তু পরামর্শ দেয়ার ব্যাপারে আমি আপনাকে সকল প্রকারের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। এ ধরনের অনেক কেন্দ্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন আছে এবং এতে উদ্দেশ্যের ঐক্য ও চিন্তার ঐক্যের সাথে সাথে পারস্পরিক সহযোগিতাও যদি হয় তা হলে সুফল লাভের আশা করা যায়।" এর পরে তো আর প্রশ্নই থাকেনা যে, এখানে এসে আমি কাজ করব। অবশ্য এ দায়িত্ব আমি নিয়েছি যে, প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যে কাজের পরিকল্পনা আমি তৈরী করব। অতএব বিভিন্ন সময়ে পত্রের মাধ্যমে আমি আমার চিন্তাধারা চৌধুরী সাহেবকে জানিয়ে দিতে থাকি। ১৯৩৬ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তাঁকে নিম্নরূপ পত্র লেখি ঃ

১। যে জিনিসের বিরাট অভাব রয়েছে তাহলো সঠিক ইসলামী প্রশিক্ষণ, আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তো ইংরেজদের স্বার্থে তৈরী হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রাচীন মাদ্রাসাগুলো এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও এ ব্যাপারে ত্রুটিপূর্ণ। খানকাহতে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যেখানে 'শায়খ' এবং 'মুরীদ' (এ শব্দগুলো আমি বাধ্য হয়ে ব্যবহার করছি, পারিভাষিক অর্থে নয়) উভয়ে তাদের সংশোধন করবে, একে অপরকে প্রশিক্ষণ দেবে। তাদের মধ্যে বাইরের যতোটুকু রং লেগেছে তা পরস্পর মিলে তুলে ফেলতে হবে। পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে সত্যিকার ইসলামী চরিত্র গঠন করার চেষ্টা করবে। সাহাবায়ে কেরাম এবং ইসলামী মনীষীগণের জীবন চরিত সামনে রাখতে হবে। বিশেষ করে সেসব পন্থা-পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, যেসবের মাধ্যমে নবী (সঃ) সাহাবাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

২। যাঁরা এ প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করবেন, তাঁদেরকে অন্তত পক্ষে দু'বছর শহরে জীবন যাপন করতে দেয়া হবে না। বাইরে দুনিয়া থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে যাতে করে এ সময়ের মধ্যে তাদের মধ্যে ইসলামী রং

www.pathagar.org

দেখতে পাওয়া যায় এবং তা এতোটা পাকাপোক্ত হবে যে, অন্যের উপর সে রঙের ছাপ লাগাতে না পারলেও নিজে অন্য কারো রং গ্রহণ করবে না।

৩। সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হবেন। নিজের কাজ স্বহস্তে করার অভ্যাস করতে হবে। দৈহিক পরিশ্রমের জন্যে এক খণ্ড জমি নির্দিষ্ট করে নিতে হবে, যেখানে শায়খ এবং মুরীদ নিজ হাতে শাক-সব্জি লাগাবার কাজ করবেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার আধুনিক নিয়ম-পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। পাশ্চাত্যের জীবনধারার মধ্যে যেগুলো আমাদের জন্যে মঙ্গলকর তা গ্রহণ করতে হবে এবং যা ক্ষতিকর তা বর্জন করতে হবে।

৪। সিপাহীসুলভ স্বভাব-চরিত্র গঠনের জন্যে সামরিক নিয়ম শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা পালনের অভ্যাস করতে হবে। ব্যায়াম প্রভৃতি বিশেষ করে ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস করতে হবে। তরবারি ও তীর চালনার নিয়মিত চর্চা ও অন্যান্য কলাকৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা করতে হবে।

৫। নামায-রোযার পুরোপুরি পাবন্দি করতে হবে, ভালো কাজের আদেশ হলে তা মেনে চলতে হবে এবং মন্দ কাজের আদেশ প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এ ধরনের আদেশ মানা-নামানা স্বতঃস্ফূর্ত হতে হবে, বাধ্যতামূলক নয়। প্রতিষ্ঠানের পরিবেশটাই এমন ইসলামী হবে যে, যেখানে নেক কাজ আপনা-আপনিই বিকাশ লাভ করতে থাকবে এবং পাপ-প্রবণতা বিনষ্ট হয়ে যাবে।

৬। প্রতিষ্ঠানে আপাতত শুধু এতোজন লোক নিতে হবে যাদের ব্যয়ভার আপনার ওয়াক্‌ফ করা সম্পত্তি বহন করতে পারে। সমস্ত ব্যয়ভার ওয়াক্‌ফ গ্রহণ করুক অথবা কিছুটা তাঁরা (প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী) নিজেরা গ্রহণ করুন, দু-তিন বছর প্রশিক্ষণের পর এমন ব্যবস্থা করতে হবে যে, প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ মিলিতভাবে ব্যবসার নীতিতে কোন প্রেস অথবা প্রকাশনী সংস্থা কায়েম করবেন। এর মাধ্যমে তাঁরা শুধু নিজেদের ব্যয় বহন করতেই সক্ষম হবেন না, বরঞ্চ অন্যকেও তাঁদের প্রতিষ্ঠানে শরীক করতে পারবেন এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণও দিতে পারবেন।

৭। যদি কেউ স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য করতে চান, তাহলে তা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু কারো কাছে সাহায্য চাওয়া হবে না আর না চাঁদা আদায় করার জন্যে কোন বিভাগ খোলা হবে।

৮। প্রতিষ্ঠানে যাঁরা আসবেন, তাঁরা অবশ্যই কোন ইংরেজী অথবা আরবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হবেন এবং তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমানের হতে হবে। পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমে দু'মাসের জন্যে তাঁদেরকে নেয়া হবে, তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় গোঁড়ামি অথবা পাশ্চাত্যের মানসিকতা থাকা চলবে না।

www.pathagar.org

৯। প্রতিষ্ঠানে নিয়ম-মাফিক শিক্ষাদানের প্রয়োজন নেই। যাঁরা আরবী জানেন তাঁরা প্রত্যেক ইংরেজী শিক্ষিত লোককে আরবী ও ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দেবেন এবং ইংরেজী শিক্ষিত লোক আরবী শিক্ষিত লোককে ইংরেজী ভাষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবেন। এমন এক সময় আসবে যখন শায়খ কুরআনের দারস দেবেন কিন্তু এমনভাবে যে শায়খসহ প্রত্যেকে ছাত্রও হবেন এবং শিক্ষকও হবেন, অর্থাৎ কুরআনের আয়াতগুলো প্রত্যেকেই ভালোভাবে আগে থেকে পড়াশুনা করে আসবেন এবং দারসের সময় প্রত্যেকে তাঁদের নিজ নিজ চিন্তা-গবেষণা তুলে ধরবেন। এভাবে একে অপরের দ্বারা উপকৃত হবেন। এ প্রসংগে হাদীস ফেকাহ, শরীয়তের মূলনীতি, ইসলামী দর্শন ও ইতিহাস, মোটকথা বিভিন্ন বিষয়ের উপর সম্যক আলোচনা হবে। প্রত্যেকে অধ্যয়ন ও গবেষণায় লিপ্ত থাকবেন। এ কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নাজুক। শায়খকে এ দায়িত্ব নিতে হবে যে, কোন কোন বিষয়ের উপর গবেষণার কাজ করতে হবে, কোন কোন সদস্য কোন কোন বিষয়ের গবেষণা করবেন এবং কিভাবে তাঁদেরকে পরিচালনা করা হবে। আমার দৃষ্টিতে তিন-চারটি বিষয় এমন যার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া দরকার। যথাঃ

(১) ফিকাহ (২) অর্থনীতি (৩) সমাজ বিজ্ঞান এবং (৪) দর্শন ও অব্যবহারিক বিজ্ঞান (Theoretical Science)।

এ সব বুদ্ধিবৃত্তিক ও গবেষণামূলক কাজ এ বুনিয়াদী দৃষ্টিভঙ্গিসহ করতে হবে যে, জ্ঞানের প্রকৃত উৎসই হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ এবং সবকিছুই এ দুটো থেকেই গ্রহণ করতে হবে। এ সৌরজগতে প্রতিটি বস্তু যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, ঠিক তেমনি আমাদের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহকে কেন্দ্র করেই হবে।

১০। প্রতিষ্ঠান থেকে যখন একটি দল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবে, তখন প্রকাশনার কাজ শুরু করা হবে। প্রকাশনার জন্যে তিনটি ভাষা আমার মতে উপযোগী যথা- আরবী, ইংরেজী ও উর্দু। প্রকাশনা অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাকারে করা হবে। আধা স্বায়ত্তশাসিত কাউন্সিলগুলোর পক্ষ থেকে ফেৎনা উঠবে বলে মনে হয়। বহু সংখ্যক জাহেল লোক মুসলমানদের প্রতিনিধি সেজে কাউন্সিলে যাবে এবং সোশ্যাল রিফর্মের নামে 'সোশ্যাল ডিফর্ম' করে বসবে। নতুন আইন করে মুসলমানদের পার্সনাল ল'কে অধিকতর বিকৃত করবে। তখন আলেমদের হৈ-চৈ করে কোন লাভ হবে না। কারণ তাঁরা ছশ' বছর পূর্বের দুনিয়ায় বাস করেন। এ অবস্থায় আধুনিক আলেমদের দ্বারা কিছু কাজ হতে পারে। তাঁরা এ যুগের ভাষায় ইসলামী আইনের সঠিক ব্যাখ্যা পেশ করবেন এবং আইন-প্রণেতাদের বলে দেবেন সোশ্যাল রিফর্মের সঠিক পন্থা কি এবং ভুল পন্থা কি।

www.pathagar.org

২৬শে মার্চ ১৯৩৭-এ যে পত্র লিখি তা নিম্নরূপ ঃ

এ কাজ একেবারে নতুন। অতীত ও বর্তমানে কোথাও এ জন্যে প্রথম থেকে কোন বুনিয়াদ বিদ্যমান নেই। এ জন্যে অধিকাংশ লোককে সন্দিগ্ধ পাবেন এবং স্বয়ং আপনিও সঠিক পন্থা নির্ণয় করতে অসুবিধায় পড়বেন। কিন্তু যেহেতু উদ্দেশ্য আমাদের একেবারে পরিষ্কার, সে জন্যে শত অসুবিধা সত্ত্বেও সঠিক পথ আমরা পাবই।

আমরা বিশুদ্ধ কুরআনের ভিত্তিতেই ইসলামী রেনেসাঁ চাই। কুরআনের স্পিরিট এবং ইসলামের মূলনীতি আমাদের কাছে অপরিবর্তনীয়, কিন্তু চিন্তাধারা ও তথ্যাবলীর সুবিন্যাস এবং বাস্তব জীবনের অবস্থার উপর সে স্পিরিট ও মূলনীতির প্রয়োগ-প্রক্রিয়া অবস্থার পরিবর্তন ও জ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে পরিবর্তিত হওয়ার প্রয়োজন হয়। ইসলামের অতীত মনীষীগণ এটা মনে করেছিলেন যে, মূলনীতি ও স্পিরিটের ন্যায় তার প্রয়োগ-প্রক্রিয়াও অপরিবর্তনীয়। এ এমন এক স্থবিরতা সৃষ্টি করেছিল যা সাত শ' বছর যাবৎ আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও জীবন বিধানের উপর বিরাজ করেছে। আধুনিক যুগের মুসলমানদের একটি দল এ স্থবিরতা দূর করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁরা যে রেনেসাঁ সৃষ্টি করতে চাইলেন তা ইসলামী রেনেসাঁ নয়। এ জন্যে যে, তা কুরআনের স্পিরিট ও মূলনীতি বিবর্জিত ছিল। তাঁদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগি ইসলামী ছিল না। এ জন্যে না তাঁরা মুসলমান হিসেবে চিন্তা করতে পারতেন, আর না ইসলামী পদ্ধতিতে তথ্যাবলী সুবিন্যস্ত করতে পারতেন।

আমাদের পথ উপরোক্ত উভয় দল থেকে পৃথক। আমাদেরকে একদিকে কুরআনের প্রাণশক্তি সঠিকভাবে নিজেদের মধ্যে অভিনিবিষ্ট করে নিতে হবে এবং আপন চিন্তাশক্তিকে ইসলামী নীতির সাথে পুরোপুরি অবিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে। অন্যদিকে বিগত আট শ' বছর যাবত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও অবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে তার মূল্যায়ন করতে হবে। অতঃপর সঠিক ইসলামী পদ্ধতিতে চিন্তাধারা ও তথ্যাবলী সুবিন্যস্ত ও জীবন-বিধান প্রণয়ন করতে হবে যাতে ইসলাম আবার একটি গতিশীল শক্তি (Dynamic Force) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ফলে ইসলাম অনুসারী হওয়ার পরিবর্তে নেতৃত্বের আসন লাভ করতে পারবে। এ এক বিরাট কাজ (Herculian Task)। আমরা তো এভাবে কাজ শুরু করছি যে, আমাদের আগে কেউ পদচিহ্ন রেখে যায়নি। আমাদের গন্তব্যস্থলকে লক্ষ্য করে আমাদের পথ করে নিয়ে সে পথেই চলতে হবে। এ এতো বড়ো কাজ যে, আপনি, আমি এবং আমাদের মতো শত শত লোকের জীবন এ কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়। যদি আমরা এ আশা করি যে, আমাদের জীবনেই এর সুফল দেখা দেবে, তাহলে এ হবে দুরাশা। এ খেজুর গাছ লাগাবার মতো। যে তার গাছ লাগায় সে তার ফল খেতে পারে না। আমরা এ গাছ লাগাবো এবং আমাদের রক্ত দিয়ে তার সেচকার্য চালাতে থাকব। আমাদের পরে দ্বিতীয় বংশধর আসবে। তারাও হয়ত এর ফলের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না। অন্তত দু'তিন

www.pathagar.org

পুরুষ প্রয়োজন হবে এর ফল ভোগ করার জন্যে। অতএব ফলের জন্যে আমাদের অধৈর্য হলে চলবে না। আমাদের কাজ হলো নকশার উপরে যথাযথভাবে প্রাসাদ তৈরী করা। নকশার উপরে ভিত করে দিয়ে পরবর্তী বংশধরের জন্যে নির্মাণ কাজ ছেড়ে দেব। সম্ভবত এর বেশী আমরা করতে পারব না।

"আপনারা আন্দাজ করতে পারেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে কোন স্কীম আমার মনে ছিল। আমি চাইছিলাম যে, এ ধরনের একটা প্রতিষ্ঠান আমি হায়দরাবাদে কায়েম করি এবং এ ধরনের একটা প্রতিষ্ঠান এখানে কায়েম করা হোক, যাকে কোন যোগ্য ব্যক্তি উপরোক্ত পদ্ধতিতে চালাতে থাকবেন।"

"তারপর হঠাৎ অবস্থার পট পরিবর্তন হলো। মুসলমানদের জাতীয় শক্তির দৈনন্দিন অবনতি ও তাদের চিন্তা ও কাজের বিচ্ছিন্নতা থেকে যে আশঙ্কা আমি বহুদিন যাবত পোষণ করেছিলাম, অবস্থার গতিধারা হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তা আমার সামনে এনে দিল। ১৯৩৭ সালের সূচনাতেই এ বিপদের চিহ্ন ও আলামত সুস্পষ্ট নজরে পড়ছিল। অবশেষে ঐ সালেরই মার্চ মাসে আমি দিল্লী গেলাম এবং নিজের চোখে দেখলাম রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে মুসলমানদের উপর তার প্রভাব কতখানি পড়েছে। আমি এটাও দেখলাম যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না যিনি অবস্থার প্রকৃত ধারণা উপলব্ধি করে তাদেরকে আসন্ন ধ্বংস থেকে রক্ষা করার কোন সঠিক ইসলামী পন্থা বলে দেবেন। তখন বাধ্য হয়ে আমি এ সিদ্ধান্ত করলাম যে, যতটুকু শক্তি আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন তা এ বিপ্লবের মুকাবিলায় ব্যয় করব। কারণ এ বিপ্লব যদি জাতিকে ধ্বংস করে দেয়, তাহলে তো কোন গঠনমূলক কাজের কোন সুযোগই পাওয়া যাবে না। অতএব আমি দিল্লী থেকে হায়দরাবাদ পৌছামাত্র এ নতুন অভিযানের সূচনা করলাম। তার প্রাথমিক নিদর্শনাদি আমার এসব প্রবন্ধাদির মধ্যে পাওয়া যাবে যা সম্প্রতি "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ" শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আমি ২৭শে এপ্রিল লিখিত এক পত্রে চৌধুরী সাহেবকে জানিয়ে দিই ঃ

"এখন আমার সামনে এক বিরাট অভিযান, যার জন্য আমাকে একাগ্রচিত্তে কাজে লেগে যেতে হবে। মহররম মাসের তর্জুমানুল কুরআন থেকে আমি এ অভিযানের সূচনা করি যার মধ্যে "ইসলামী ভারতের ভবিষ্যত" শীর্ষক প্রবন্ধাদি লেখা শুরু হয়। আগামী ক'মাসের মধ্যে কতজন সংগীসাথী পাওয়া যাচ্ছে তা দেখতে হবে। মোটকথা, আমি এ স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলেছি, যদি সারা ভারতে একজনও সাথী না পাওয়া যায় আমি একাকীই আমার এ সংগ্রাম শুরু করব এবং শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখব। এখন মুসলমানদের যে নাজুক অবস্থা এবং যে ভয়াবহ ভবিষ্যতের সম্মুখীন তারা হতে যাচ্ছে তা উপলব্ধি করার পর আগামী দশ-বিশ বছরেই দেশে ইসলামের ভাগ্যের ফয়সালা হয়ে যাবে। এখন আমরা এ সময় আত্মরক্ষার প্রস্তুতি না নিলে কয়েক বছর পর এমন কোন শান্ত পরিবেশ খুঁজে

www.pathagar.org

পাওয়া যাবে না, যেখানে বসে আমরা গঠনমূলক কাজ করতে পারব। আজকাল আমার চিন্তাধারার মধ্যে এক উত্তেজনা বিরাজ করছে, যা আমাকে প্রশান্ত মনে চিন্তা করার যোগ্য রাখেনি। আমি দিল্লী থেকে আমার বুক ভরে একটা আগুন এনেছি এবং প্রতি মুহূর্তেই চিন্তা করছি যে, এখন কি করি।"

এ অভিযান শুরু করার পর আমি অনুভব করতে লাগলাম, এখন আমার জন্যে হায়দরাবাদ কোন উপযুক্ত স্থান নয়। প্রথমে যে বিশুদ্ধ গঠনমূলক কাজ করতে চাইলাম তার জন্যে এমন এক নিরিবিলি স্থানের প্রয়োজন যা দুনিয়ার হৈহল্লা থেকে দূরে হবে। হায়দরাবাদ এ ধরনের নিরিবিলি ও নিরাপদ স্থান আমাকে দিতে পারতো। কিন্তু যখন আমাদের বিপ্লবী শক্তিগুলোর মুকাবিলায় বাঁচার লড়াই (Struggle for Existance) করার জন্যে উঠতে হলো, তখন অনিবার্য হয়ে পড়লো যে, নিরিবিলি স্থান ছেড়ে আসল যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যাই। অতএব আমি ১৯৩৭ সালের দুসরা জুন চৌধুরী সাহেবকে এ ব্যাপারে লিখে জানাই ঃ

"এখন আমি মনে করছি আসল রণক্ষেত্র উত্তর ভারত। মুসলমানদের ভাগ্যের ফয়সালা সেখানেই হবে। আর সে ফয়সালার প্রভাব গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়বে। এখন আমার জন্যে এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই যে, এখান থেকে হিজরত করি এবং উত্তর ভারতের কোথাও গিয়ে অবস্থান করি। কিন্তু দারুল হিজরত (কোথায় পাব সে নির্দিষ্ট স্থান) নির্বাচনে দীর্ঘ দ্বন্দ্বে ভুগছি। মহররম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর এমন বহু চিঠিপত্র আসছে যাতে দাবী করা হচ্ছে যে কোন কর্মপন্থা আমি পেশ করি। অধৈর্য হয়ে কাজ করা আমি পছন্দ করি না। বহু চিন্তাভাবনার পর এক সংগ্রামের নকশা বানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ দু'তিন মাসের মধ্যে এ নকশা তৈরী হয়ে যাবে। এ নকশা প্রকাশ করার পর

مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ

এর আওয়াজ বুলন্দ করব। শুধু এমন লোকদেরই দাওয়াত দেবো যারা সময় এলে একথা যেন না বলে

١. اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ

স্বয়ং চৌধুরী সাহেবও এটা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। তিনি তার ২৫শে মে ১৯৩৭-এ লিখিত পত্রে বলেন-

"যে ভালো এবং মন্দ ভারতে পৌঁছে, তার অগ্রদূতের বোঝা বহন করার দায়িত্ব পড়ে পাঞ্জাবের উপর। এখানে এসে আপনি আপনার মোর্চা তৈরী করুন। যে বিপ্লবের আশঙ্কা করে আপনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন তার সূচনা এখান থেকে

১. "তুমি ও তোমার রব, তোমরা দুজন যাও, তোমরা দুজন লড়াই করো, আমরা এখানেই বসে রইলাম।"

www.pathagar.org

হবে। যদি আপনি পাঞ্জাবকে দাবিয়ে রাখতে পারেন, তাহলে গোটা হিন্দুস্থানকেও পারবেন। এ বিষয়ে চিন্তা করুন এবং রণকুশলী জেনারেলের মতো উপযুক্ত স্থানে ফ্রন্ট তৈরী করুন।"

তার জবাবে আমি বলি, "আগে যেমন বলেছি আমি স্বয়ং উত্তর ভারতে স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত করেছিলাম-কিন্তু এ সিদ্ধান্ত করার সাথে সাথে আমি কঠিন মানসিক সংঘাতে পড়ে গেলাম। একদিকে আমার বিশ বছরের চিন্তাভাবনা ও পড়াশুনা আমাকে বলছিল যে, দুনিয়াকে মজবুত করার জন্যে ঐ গঠনমূলক কাজ ছাড়া আর কিছু ফলপ্রসূ হতে পারে না যার নকশা আমি তৈরী করেছি। অপরদিকে মুসলমানদের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত দলগুলোর উপর বিপ্লবের যে আগ্রাসী হামলা হচ্ছে তা দেখে আমি বুঝতে পারছি যে, এখন জাতীয় শক্তি যা কিছু রয়ে গেছে অবিলম্বে তা সামলানো দরকার। নতুবা যে সময় পর্যন্ত আমরা আমাদের গঠনমূলক কাজ এতো পরিমাণ উন্নত করতে পারব যে তা জাতিকে সামলাবার যোগ্য হবে, ততো সময় পর্যন্ত জাতিটাই শেষ হয়ে যাবে। যদি গঠনমূলক কাজের নকশা আপনাদের সামনে থাকে যার বর্ণনা এক্ষুণি আমি দিলাম-তাহলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারেন যে, কিছু লোক কুরআন ও সুন্নাহ এবং প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণামূলক অধ্যয়ন ও খাঁটি ইসলামী তরবিয়তের মাধ্যমে ইলম ও চরিত্রের দিক দিয়ে এতোটা যোগ্য হবে যে, তারা জাতির বিকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও নৈতিকতাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করবে এবং তারপর সে সংশোধিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার দ্বারা জাতির মধ্যে এমন শক্তির সঞ্চার হবে যে, সে জাতি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অধঃপতন থেকে নিজেকে রক্ষা করে উন্নতির পথে অগ্রসর হবে-এসব কাজের জন্যে কত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন! একাজ যদি আজ শুরু করা যায়, তাহলে খুব কম করে হলেও তৃতীয় বংশধর (GENERATION) পর্যন্ত গিয়ে তা ফলপ্রসূ হতে পারে। এখন আপনারাই আমাকে বলুন, যে ঝড় আমাদের মাথার উপর এসে পড়েছে তা আমাদের এতখানি অবকাশ দিতে কি প্রস্তুত যে, আমরা নিশ্চিন্তে বসে আমাদের ভাঙা নৌকা নতুন করে তৈরী করবো? যে অবস্থা আপনাদের সামনে তা আমার সামনেও। কোন কিছুই অপ্রকাশ নেই যে, যা দেখছি তা আপনারা দেখছেন না। একদিকে রয়েছে সংগঠিত শক্তি–যা জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের যৌগিক পদার্থকে (COMPOUND) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের (PROVINCIAL AUTONOMY) বিরাট উপায়-উপাদানের সাহায্যে ভারতের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে এবং নতুন ভারতের নির্মাণ এমন এক নকশার উপরে শুরু হয়েছে যার মধ্যে মুসলিম জাতির জন্যে "মুসলিম জাতি" হিসেবে কোন স্থান নেই। অপরদিকে মুসলমান এক পাল ভেড়া-ছাগলের মতো ভারতের সর্বত্র পথহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের বিভিন্ন দল-উপদল বিভিন্ন পথে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি যদি খুব আশাবাদসহ

www.pathagar.org

অনুমান করি, তাহলে বলতে পারি খুব বেশী দশ বছর যদি এ অবস্থা চলতে থাকে, তাহলে ময়দান একেবারে আপনাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং এ জাতির আর অস্তিত্বই থাকবে না-যাদের সামলাবার জন্যে আপনারা বসে বসে দরসে কুরআন দিতে থাকবেন। সম্ভবত আপনারা সে নিরাপদ স্থানটুকুও পাবেন না, যেখানে বসে এ ধরনের দরসে কুরআন আপনারা দিতে পারবেন।"

এসব চিন্তার মধ্যেই আমি আজ থেকে দশ মাস পূর্বে নিমগ্ন ছিলাম। অবশেষে খুব চিন্তাভাবনার পর আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আমার অসুবিধা যতোই হোক না কেন আর আমার দায়িত্বের বোঝা যতই অসহনীয় হোক না কেন, সর্বাবস্থায় আমাকে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা এবং জাতীয় পুনর্গঠনের এ দুটি কাজ সাথে সাথেই করতে হবে। ফলে যে ময়দান দ্রুত হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে রাজনৈতিক প্রচেষ্টার দ্বারা তা যেন রক্ষা করা যায়। তারপর যতোটুকু ময়দান হস্তগত হয় তাকে আয়ত্তে রাখার জন্যে গঠনমূলক কাজের দ্বারা জাতিকে তৈরী করতে হবে। এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। তার কারণ এই যে, আমি আমার রাজনৈতিক প্রবন্ধাদির দ্বারা জাতির মধ্যে একটা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি। এখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মাঝখানে একটা দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করার প্রয়োজন তারা অনুভব করলো, ফলে আমার উপর এ নৈতিক দায়িত্ব এসে পড়লো যে, আমি নিজেই সে দ্বিতীয় পথ তৈরী করে দেখিয়ে দিই এবং এ পথে চলে বাস্তবে প্রমাণ করে দিই যে, এইটিই মুক্তির পথ। এ অবস্থায় আমার পশ্চাৎপদ হওয়ার অর্থ এই যে, আমি আমার জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছি এবং তাদের উস্কানি দিয়ে এমন স্থানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি, যেখানে তার বুকফাটা তৃষ্ণা অনুভব করছে কিন্তু পানি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যাপার শুধু এতটুকু নয় যে, এটা আমারই ধারণা, বরং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে অগণিত চিঠিপত্র আসছে সেসবের স্তূপ দেখার কষ্ট স্বীকার যদি আপনারা করেন, তাহলে আপনারা জানতে পারবেন যে, দেশের যে সব অঞ্চলে আমার আওয়াজ পৌঁছেছে, তারা আমার কাছে কি আশা করছে এবং কোন জিনিসের দাবী করছে। তাদের দাবী পূরণ করতে যদি আমি কুণ্ঠাবোধ করি, তাহলে তারা আমাকে কেমন চোখে দেখবে? তারপর খোদার কাছে আমাকে যে জবাবদিহি করতে হবে সে ব্যাপারে তো আমার কেউ শরীক হতে পারে না। যেহেতু আপনারা আমার অবস্থানে নন, সে জন্যে এটা বলতে পারি না যে, এ দায়িত্বের কতটুকু ধারণা আপনাদের রয়েছে যতটুকু আমার আছে। কিন্তু আমি আপনাদের পরিষ্কার বলতে চাই এ দায়িত্বের অনুভূতি আমার উপরে এত বিরাট যে, এ দাবী পূরণের জন্যে আমাকে যতোই ক্ষতি স্বীকার করতে হোক না কেন, আমি একেবারে শেষ হয়ে যাই না কেন, আমার প্রিয়জনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হোক না কেন, কোন ভয় কোন প্রলোভন অথবা কোন সম্পর্কের খাতিরে এর থেকে সরে যেতে পারি না। আর

www.pathagar.org

না আমার সম্পর্কে কারো এরূপ আশা করা উচিত, আর না এমন কোন ব্যক্তি বা দলের আমি সহযোগিতা করতে পারি যাদের সাথে সহযোগিতা করার জন্যে আমাকে এ পথ থেকে সরে যেতে হবে।"

আমার এ সিদ্ধান্ত আমি ১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই আমার লিখিত পত্রে চৌধুরী সাহেবকে জানিয়ে দিই। পত্রের মর্ম নিম্নরূপ ঃ

"আপনার জানা আছে, প্রথমে আমার এটাই পরিকল্পনা ছিল যে, নীরবে একস্থানে বসে কাজের লোক তৈরী করব তারপর তাদের দ্বারা কোন বিরাট কাজ নেয়া যাবে। কিন্তু এ কাজ সময় সাপেক্ষ। এখনকার অবস্থা এই যে, বিপ্লব মাথার উপর এসে পড়েছে। এ সময়ে মুসলমানদের মধ্যে যদি কোন প্রাণ সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে গোটা জাতি তলিয়ে যাবে। আর গোটা জাতি যদি তলিয়েই গেল, তাহলে আমাদের ও আপনাদের কোন পাত্তাই থাকবে না যে, কোন গঠনমূলক কাজ আমরা করতে পারব। এ হচ্ছে একদিক। অপরদিকে এ সত্য অনস্বীকার্য যে, নিছক ভাসা ভাসা আন্দোলনের দ্বারা কোন স্থায়ী সুফল পাওয়া যায় না। গঠনমূলক কাজ এই যে, একটি ঈমানদার ও সক্রিয় দল তৈরী করতে হবে যা সমস্ত জাতিকে সুসজ্জিত করার যোগ্যতাসম্পন্ন হবে। এখন বিপদ এই হয়ে পড়েছে যে, সময় প্রথমে কাজের দাবী করছে যার জন্যে আশু পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন। আর হিকমত (সুষ্ঠু ও সুস্থ বিচারবুদ্ধি) দাবী করছে অন্য কাজের-অর্থাৎ ক্রমশ গঠনমূলক কাজের।"

"আমি কয়েক মাস যাবত এ চিন্তায় মগ্ন আছি যে কি করব? শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, একসাথে এ দু'টি কাজ আমারই করা উচিত। প্রথম কাজের জন্যে আমি নিষ্ঠাবান, চরম উৎসাহী এবং সক্রিয় যুবকদের একটি দল তৈরী করতে চাই। তারা জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে জাগরণ সৃষ্টি করবে। তার কেন্দ্র উত্তর ভারতের কোন এক স্থানে হবে। এখন রইলো দ্বিতীয় কাজ। এর জন্যে আপনার প্রতিষ্ঠানকেই কেন্দ্র বানানো হবে। এখানে দৃঢ় ও স্থায়ী বুনিয়াদের উপর গঠনমূলক কাজ করার জন্যে জ্ঞানবানদের একটি দল তৈরী করতে হবে। এ দু'টি কাজের সাথে আমার সম্পর্ক থাকবে। এর জন্যে এমন এক স্থানে আমি হিজরত করে যাব, যেখান থেকে এ দুটি আন্দোলনই সহজে চালাতে পারি।"

মাওলানা বলেন, "এ পত্রে আমি আমার এ অভিমতই ব্যক্ত করেছি যে, আমি আমার হেডকোয়ার্টার অন্য কোন স্থানে বানাবো, যেখান থেকে স্বাধীনভাবে আমি আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করতে পারি। সেহেতু হেডকোয়ার্টার এ স্থান থেকে যেন নিকটে হয় যাতে করে এখানে যে গঠনমূলক কাজ করা হবে তার সাথে আমি সংশ্লিষ্ট থাকতে পারি। এ সিদ্ধান্ত আমি দু'কারণে করেছি। এক, আমি আপনাদের নাজুক পজিশন বুঝতে পেরেছি। আমার শুধু এ

www.pathagar.org

ধারণাই ছিল না যে, এ ধরনের কোন আন্দোলনের দায়িত্বে কাজ করা আপনাদের জন্যে কঠিন, যা কখনো বর্তমান সরকার পছন্দ করবে না! বরঞ্চ আমি নিজেও আপনাদেরকে আমার সাথে এ দায়িত্বে নেয়া পছন্দ করি না। হয়তো কোন এক সময় আপনাদের জন্যে অসহনীয় হতে পারে।

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

দুই, "আমি ব্যক্তিগতভাবে জেনে, বুঝে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে ধারণা করতে পারতাম না যে, আপনাদের সাথে আমার সহযোগিতা হতে পারে কিনা। এটা ঠিক যে, যে জিনিসের নকশা আমি নিজে তৈরী করেছি, যার উপর নির্মাণ কাজ আমাকে করতে হবে, যার জবাবদিহি আমাকে গোটা জাতির কাছে এবং আখেরাতে খোদার কাছে করতে হবে- তা নির্মাণ ও পরিচালনার জন্যে চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা আমার থাকা উচিত। দায়িত্বশীল স্বয়ং জানে যে, তার দায়িত্ব সে কিভাবে পালন করবে। যে ইঞ্জিনিয়ারকে সব তৈরী করতে হয়-সে ভালভাবে এর ফয়সালা করতে পারে যে, ভিত কিভাবে খনন করতে হয়; দেয়াল কিভাবে গাঁথতে হয়। যদি নকশা তৈরী এবং ঘর নির্মাণের দায়িত্ব তার হয় এবং এক একটি ইট সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অন্য কেউ হয়, যে বলবে তা কোথায় রাখা যাবে বা যাবে না, রাখা হলে কখন এবং কোথায় রাখা হবে- তাহলে বুঝতেই পারছেন যে, এ অবস্থায় ইমারত তৈরী করা সম্ভবই নয়। কারো ইমারত বানাতে হলে তার নৈতিক দায়িত্ব হবে এধরনের হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা।"

"আমি পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে এ ধারণা করতে পারতাম না যে, আমার এ ধরনের স্বাধীনতা এখানে হবে কি না, যদিও আমার এমন সাহায্য-সহযোগিতাকারী অবশ্য প্রয়োজন যারা এ ইমারত বানাবার মাল-মসলা জোগাড় করে দেবেন কিন্তু এমন সহযোগিতা থেকে আমি খোদার আশ্রয় চাই যারা মাল-মসলা এ শর্তে যোগাড় করে দেবেন যে, ইমারতের নক্শা তৈরী এবং নির্মাণ কাজে তাঁদের ফয়সালাই মানতে হবে। অথবা ইমারত খারাপ হলে জাতির সামনে এবং খোদার সামনে তাঁদের নয়, আমারই মুখ কালো হবে।"

"যা হোক, এসব কারণে আমি এখানে আসার সিদ্ধান্ত করতে ইতস্তত করছিলাম। কিন্তু সাঁইত্রিশের অক্টোবরে যখন আমি দিল্লী গেলাম, চৌধুরী নিয়ায আলী সাহেব মেহেরবানী করে সেখানে আমার সাথে মিলিত হলেন। তাঁর সাথে আমি এখানে এলাম এবং এখান থেকে লাহোর গিয়ে আল্লামা ইকবালের সাথে সাক্ষাত করলাম। এ গোটা সফরের মধ্যে আমার চিন্তা, ধারণা, ইচ্ছা-বাসনা ভালভাবে চৌধুরী সাহেবকে জানিয়ে দিলাম। তারপর এ সবকিছু জানার পর যখন তিনি আমাকে এখানে আসার আহ্বান জানান এবং এ নিশ্চয়তা দেন যে, আমার

www.pathagar.org

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে- তখন আমি ফয়সালা করলাম আমার হেডকোয়ার্টার পৃথক স্থানে বানাবার প্রয়োজন নেই। দুটি কাজের কেন্দ্র একই স্থানে হবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে আমি স্থানান্তরিত হয়ে এখানে এসেছি। আপনারা জানেন এ স্থানান্তরের জন্যে যে আর্থিক ব্যয় হয়েছে তা আমি নিজেই বহন করেছি। এখানে থাকার জন্যে এবং পত্রিকা চালাবার জন্যে যে খরচপত্রের দরকার হবে তা আমি বহন করব। এমন কি যতদিন পর্যন্ত কোন জমি খরিদ করে আমি বাড়ী না বানাব, ততদিন ওয়াক্‌ফের যে বাড়ীতে আমি থাকব তার ভাড়া ওয়াক্‌ফ কমিটিকে দিতে থাকব। ইনশাআল্লাহ কোন সময়ে একটি পয়সাও আমাদের কমিটি থেকে অথবা আপনাদের কারো কাছ থেকে আমার নিজের জন্যে অথবা আমার পত্রিকার জন্যে নেব না। একথা ঠিক যে, এরপর আমার কোন নৈতিক দায়িত্ব থাকে না, যার ভিত্তিতে আমি এখানে এমন মর্যাদা কবুল করতে পারি, যা কোন প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক্ত হেড মাস্টারের হয়ে থাকে। আমার মনে হয় প্রকৃত অবস্থা সামনে রেখে আপনারাও এ আশা আমার কাছে করবেন না।

"এখন আমি আমার প্রস্তাব-পরামর্শ পেশ করার পূর্বে এক বাক্যে বলে দিতে চাই যে, প্রথম যে বিষয়ের ফয়সালা করতে হবে তা হলো এই যে- যদি আমার উপর আপনাদের আস্থা থাকে এবং যদি চান যে, এই ইমারত আমি আমার নক্‌শার উপর তৈরী করি, তাহলে আমাকে সে এখতিয়ার দিন! আর যদি আপনারা নিজেরাই বানাবার ধারণা রাখেন, তাহলে আমাকে পরিষ্কার বলে দিন যাতে আমি ফিরে যেতে পারি। ফিরে যাওয়ার দুঃখ-কষ্ট আমি স্বীকার করতে পারি। কিন্তু এটা আমার জন্যে হবে অসহনীয় যে-আপনারা প্রতিটি পর্যায়ে বলবেন, "প্রথমে অমুক কাজ কর, অমুক কাজ করো না-আমরা এটা করতে চাই, অমন কাজ করতে চাই না।" আমাকে বিরাট ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে একদিকে ভাঙ্গা নৌকাকে রক্ষা করার এবং অপরদিকে নতুন নৌকা বানাবার চিন্তা করতে হবে। এ কাজে চারপাশের অবস্থার গতিধারা, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, মুসলমানদের মেজাজ-প্রকৃতির অবস্থা এবং তার চড়াই-উৎরাই, সময়ের প্রয়োজন, নিজের উপায়-উপাদান, সম্ভাব্য বন্ধু-বান্ধবদের যোগ্যতা, মোট কথা এ সব বিষয়ের উপর ব্যাপক দৃষ্টি রেখে আমাকে মন-প্রাণের একান্ত চেষ্টাচরিত্রসহ এক একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর এমন আঁধারে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যে, আমার মনের আলো ব্যতীত অন্য কোন আলোকচ্ছটা বাইরের দুনিয়া থেকে আমার নজরে না পড়ে। এক এক পদক্ষেপ যা আমি গ্রহণ করি এবং তা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং দ্বিতীয় পদক্ষেপ করার দিক নির্ণয়ে আমাকে কতটা কলিজার খুন ব্যয় করতে হবে তার অনুমান আর কেউ করতে পারবে না। এখন যদি এমন কোন ব্যক্তি, যার উপরে এ দায়িত্বের বোঝা নেই, আর যে এ নকশা তৈরী করেনি, আমার পথে এসে এক কথায় আদেশ জারী করে যে, এদিকে পা বাড়াতে হবে, অমুক কাজ প্রথমে করতে হবে-

www.pathagar.org

অমুক কাজ এখন শুরু করা যাবে না, তাহলে আপনি ধারণা করতে পারেন এবং যিনি না করেন তিনিও ধারণা করতে পারেন যে, এ সামান্য কথাটুকুর দ্বারা যা তিনি খোলা মনে বলে ফেলেছেন, আমার কত মেহনত-পরিশ্রম মাঠে মারা গেল এবং আমার প্রতিষ্ঠিত ভারসাম্য কতোখানি জটিলতা ও বিরক্তির সম্মুখীন হলো। একে যদি কেউ সহযোগিতা মনে করেন, তাহলে এমন সহযোগিতা আমার প্রয়োজন নেই। নিঃসন্দেহে আমার সহযোগীর প্রয়োজন আছে, কিন্তু এমন সহযোগীর নয় যে, একদিকে আমাকে তুফানের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে আর একদিকে আমার সহযোগী আমার হাত-পা বাঁধতে থাকবে। যদি কোন ব্যক্তি এমন ধারণা করেন যে, তিনি স্বয়ং কাজের চড়াই-উৎরাই আমার চেয়ে ভালো বুঝতে পারেন এবং তা চালাবার পূর্ণ যোগ্যতা রাখেন, তাহলে তিনি নিজে এ দায়িত্ব গ্রহণ করুন। এ অবস্থায় আমি মনে করি আমার প্রয়োজন বা কি।"

"আমি নিঃস্বার্থ ও দ্ব্যর্থহীনভাবে যে প্রশ্ন আপনাদের সামনে রাখলাম, আমি চাই যে, তার ফয়সালাও আপনারা নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ মন দিয়ে করবেন। তারপর যে সব কথা আমি আপনাদের সামনে পেশ করলাম তার উপর চিন্তাভাবনা করার পর যদি মনে করেন যে, এ অবস্থায় আমার এখানে প্রয়োজন নেই, তাহলে আমি খোদাকে সাক্ষী করে বলছি, আপনারা তা প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। আর এ বিষয়ের এতোটুকু চিন্তা করবেন না যে, আমার এখান থেকে চলে যেতে কষ্ট হবে। এ পথে পা বাড়াবার পূর্বে এর চেয়ে হাজার গুণ কষ্ট স্বীকার করার জন্যে আমি তৈরী হয়েছি আর এ সামান্য কষ্ট স্বীকার আমার এর চেয়ে ভালো যে পরবর্তীকালে আমাকে প্রত্যেক পদে পদে মানসিক কষ্ট স্বীকার করতে হবে।"

"এখন আমি আমার এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে প্রতিষ্ঠানের কাজ পরিচালনার জন্য তিনটি প্রস্তাব পেশ করছি। তার মধ্যে কোন একটি যদি আপনারা গ্রহণ করেন এবং তার উপর স্থির থাকার ওয়াদা করেন, তাহলে এ কাজ পরিচালনার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করব। আর যদি এর কোন একটি আপনারা গ্রহণ না করেন, তাহলে চতুর্থ কোন পন্থায় আমার এখানে থাকা সম্ভব নয়।

প্রস্তাবসমূহ ঃ

১। ওয়াকফ কমিটি যাবতীয় সম্পত্তি এবং ওয়াকফ ব্যবস্থাপনার পূর্ণ এখতিয়ারের অধিকারী হবে। সম্পত্তি দেখাশুনার খরচপত্রাদির পর যে আয় হবে (Net income) তা প্রতিষ্ঠানের বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা তার উদ্দেশ্য পূরণ করা, বায়তুল মালের অর্থ কোথায় কোথায় ব্যয় হবে তা নির্ণয় করা প্রভৃতি কাজের এখতিয়ার কমিটির সদস্য হিসেবে আমার উপর অর্পণ করা হোক বলে আমার প্রস্তাব। আমি আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের এবং বাইরের সুস্থ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন

www.pathagar.org

লোকদের যখন যে বিষয়ে প্রয়োজন পরামর্শ গ্রহণ করব। কিন্তু কোন পরামর্শ গ্রহণ করা না করার জন্যে আমি বাধ্য থাকব না। কারো হস্তক্ষেপও পছন্দ করব না। অবশ্য আপনারা বায়তুল মালে যতো পরিমাণ অর্থ দান করবেন তার পুরো হিসেব চাইতে পারেন। মাসিক, ষান্মাসিক, ত্রৈমাসিক এমনকি যখন ইচ্ছা-হিসেব পরীক্ষা করতে পারেন। যাতে করে আপনারা নিশ্চিত হতে পারেন যে, অর্থ ঠিকমত ব্যয় হচ্ছে কিনা। কোন খরচের ব্যাপারে আমার এবং কমিটির মধ্যে মতানৈক্য হলে তার মীমাংসা দু'জন সালিস করবেন। তাদের মধ্যে একজন আমি নিয়োগ করব একজন কমিটি করবে। বায়তুল মালের উপর আমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হওয়া উচিত। নতুবা আমাকে এখতিয়ার দান অর্থহীন হবে। প্রতিষ্ঠানের ঘরদোরের জন্যে ওয়াক্ফ করা জমির এক অংশ, যা কমিটির অনুমোদনক্রমে আমি নির্দিষ্ট করে নেব, পৃথক করে দিতে হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মতো তার উপর যখন এবং যেমন ইচ্ছা ঘরদোর আমি বানাতে পারব।

২। উপরোক্ত শর্ত যদি আপনাদের পছন্দ না হয়- তাহলে দ্বিতীয় শর্ত এই যে, বর্তমান ঘরদোরগুলো এবং ওয়াক্ফকৃত জমির যতোটুকু অংশ আমার প্রয়োজন-তা আমাকে ভাড়া দিয়ে দেয়া হোক। এখানে আমি আমার নিজ দায়িত্বে প্রতিষ্ঠান কায়েম করব। কমিটি ওয়াক্ফের আয় থেকে খরচপত্রাদির পর যা থাকবে তা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দেবে এবং কোন কোন খাতে খরচ করা হবে তা ঠিক করে দেবে। কমিটি শুধু এ অর্থের হিসেব নিতে পারবে। তাছাড়া অন্যান্য কাজকর্মে তার কোন করণীয় থাকবে না। যে জমি আমি ভাড়া নেব, কমিটি ইচ্ছা করলে তার উপর ঘর তৈরী করে দিয়ে ভাড়া বাড়িয়ে দিতে পারেন অথবা আমাকে অনুমতি দেবেন যাতে আমি নিজে প্রয়োজন মতো ঘরদোর বানাতে পারি।

এসবের অর্থ এই নয় যে, আমি আপনাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এখানে কাজ করতে চাই। বরঞ্চ এর অর্থ এই যে, আইনগত ওয়াক্ফ কমিটির সদস্য হিসেবে না আপনাদের উপর কৃতকর্মের কোন দায়িত্ব চাপে। আর না আপনাদের পজিশন আমার হাত-পা বন্ধ করে। অবশ্য নীতিগতভাবে যতো প্রকার সহানুভূতি আপনারা আমার প্রতি দেখাবেন এবং যতো প্রকারে আমার কাজে সাহায্য করবেন তা আমি শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করব।

৩। দ্বিতীয় শর্তটিও যদি আপনারা কবুল না করেন, তাহলে তৃতীয় এবং সর্বশেষ শর্ত এই যে-যে প্রতিষ্ঠান আমি করতে চাই তার জন্যে ওয়াক্ফের পক্ষ থেকে কোন অর্থই দেবেন না। শুধু ভাড়ায় আমাকে এ ঘরদোর এবং জমির একটা অংশ দিন। ওয়াক্ফের অংশ থেকে আপনারা যেখানে খুশী ব্যয় করতে পারেন।

www.pathagar.org

"এ তিনটি শর্তের উপর আপনারা ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করে দেখুন এবং যেটাই আপনাদের পছন্দ হয় তার সিদ্ধান্ত আমাকে দুদিনের মধ্যে জানিয়ে দিবেন। কিন্তু আপনাদের এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে-এ তিনটি শর্ত ব্যতীত চতুর্থ কোন বিকল্প চিন্তা করা অর্থহীন হবে। তা আমার জন্যে গ্রহণযোগ্য হবে না। একথাও পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, মাসিক তর্জুমানুল কুরআন আমি আমার ব্যক্তিগত অর্থে বের করেছি এবং নিজের দায়িত্বেই চালাচ্ছি। কমিটির সাথে এর কোন সম্পর্ক থাকবে না আর না এর প্রতি হস্তক্ষেপ করার কারো কোন অধিকার থাকবে। উপরন্তু যেসব বইপুস্তক আমি প্রকাশ করব সে সবের সাথেও কমিটির কোন সম্পর্ক থাকবে না।"

মাওলানা দারুল ইসলাম ট্রাস্ট কমিটির সামনে যে দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন তা থেকে তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা হচ্ছে তাঁর দূরদর্শী ও সূক্ষ্মদর্শী মনের অংকিত এক সুদূরপ্রসারী মহান পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাঁর সর্বস্ব কুরবান করার দৃঢ় সংকল্প। সেই সাথে তাঁর অসীম আত্মবিশ্বাস এবং এ আত্মবিশ্বাসও তাঁকে অপরের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করে স্বাধীনভাবে কাজ করার অদম্য সাহস ও শক্তি দান করে। তাঁর মনের গভীরে যে মহান পরিকল্পনা ছিল তার ভিত্তিতেই তিনি তিন বছরের মধ্যেই একটি সত্যনিষ্ঠ, মজবুত, সুসংহত ও সৃশৃংখল ইসলামী দল গঠন করেন।

আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে মাওলানার আগাগোড়া বক্তব্যে তাঁর স্বাধীন ও বলিষ্ঠ মন-মানসিকতারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাঁর বক্তব্যে ছিল বলিষ্ঠ যুক্তি, প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী অদম্য ইসলামী আবেগ-উচ্ছ্বাস, আকর্ষণীয় প্রকাশভঙ্গি এবং হৃদয়গ্রাহী আহ্বান। তাঁর এক একটি বাক্য ও শব্দ শ্রোতার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে তাকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে। তাঁর গভীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও স্ট্রাটেজীর কাছে শ্রোতা নীরবে নতি স্বীকার করে।

ট্রাস্ট কমিটি তাঁর সর্বশেষ প্রস্তাব বা শর্তটিই গ্রহণ করেন এবং এতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে, দারুল ইসলাম ট্রাস্ট এবং 'দারুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠান দুটি আলাদা প্রতিষ্ঠান। দারুল ইসলাম ট্রাস্ট চৌধুরী নিয়ায আলী সাহেব কায়েম করেন যার একজন সদস্য অবশ্য মাওলানাও ছিলেন। চৌধুরী সাহেব দ্বীনের খেদমতের জন্যে এ ট্রাস্ট গঠন করেন এবং তাঁর আহ্বানেই মাওলানা হায়দরাবাদ থেকে হিজরত করে এখানে (পাঠানকোট) চলে আসেন। কিন্তু দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠান মাওলানার প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম দ্বীনি ও রাজনৈতিক প্লাটফরম ছিল যার মাধ্যমে তিনি এ উপমহাদেশে ইসলামী জীবন বিধান কায়েমের সংগ্রাম ও একটি প্রকৃত দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এ দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠানই পরবর্তী তিন বছর কালের মধ্যেই জামায়াতে ইসলামীতে রূপান্তরিত হয়।

www.pathagar.org

দারুল ইসলাম সম্পর্কে আরো কিছু কথা

মরহুম সাইয়েদ নকী আলী সাহেব বলেন, ভারত বিভাগের পর আল্লামা ইকবালের ঘনিষ্ঠতম সাথী সাইয়েদ নাযীর নিয়াযীর সাথে লাহোরে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সাইয়েদ নাযীর নিয়াযী তাঁকে বলেন ঃ

"চৌধুরী নিয়ায আলী খান পাঠানকোটের জামালপুর একটি ওয়াক্‌ফ কায়েম করার উল্লেখ করে ডঃ ইকবালের কাছে পরামর্শ চান। আল্লামা ইকবাল জবাবে বলেন, আমার মতে এ সময়ে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ইসলামী ফিকাহর পুনর্গঠন।"

এ ব্যাপারে কোন সব লোক একত্র করা যায় এ প্রশ্নের জবাবে আল্লামা বলেন, "আপাতত একটি নাম আমার মনে পড়ছে। হায়দরাবাদ থেকে একটি অতি সুন্দর পত্রিকা 'তর্জুমানুল কুরআন' প্রকাশিত হচ্ছে, আবুল আ'লা মওদূদী সাহেব তার সম্পাদক। তাঁর লেখা আমি পড়েছি। দ্বীনের সাথে সাথে আধুনিক সমস্যাবলীর উপরও তিনি খুব দক্ষতা রাখেন। তাঁর লেখা 'আলজিহাদু ফিল ইসলাম' গ্রন্থ আমার বড় ভালো লেগেছে। আপনি তাঁকেই দারুল ইসলামে আসার দাওয়াত দিন না! আমার মনে হয় তিনি এ দাওয়াত কবুল করবেন।"

এ ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী বলেন ঃ

"চৌধুরী নিয়ায আলী সাহেব আমার কাছে পরামর্শ চান যে, কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান তিনি কায়েম করবেন। আমি তাঁকে একটা খসড়া তৈরী করে পাঠিয়ে দেই। এটা ঠিক সে সব চিন্তাধারার ভিত্তিতে ছিল যা আমি পরে দারুল ইসলাম সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশ করি। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে চৌধুরী সাহেব আল্লামা ইকবালেরও পরামর্শ গ্রহণ করেন। উনিশ শ' ছত্রিশের শেষের দিকে আল্লামা ইকবাল আমাকে পাঞ্জাবে চলে আসার আমন্ত্রণ জানান। আমি তখন না আসার ওজর পেশ করি। কারণ আমি এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান কায়েমের জন্য হায়দরাবাদে জমি খরিদ করে ফেলেছিলাম। কিন্তু সাঁইত্রিশের মাঝামাঝি নাগাদ আমি অনুভব করছিলাম যে, দক্ষিণ ভারতে কাজ করার সুযোগ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ... এ সময় চৌধুরী সাহেব পীড়াপীড়ি করতে থাকেন যে, আমি অন্ততপক্ষে একবার পাঞ্জাব বেড়িয়ে যাইনা কেন এবং তিনি একটি প্রতিষ্ঠান কায়েমের জন্যে যে জমি ওয়াকফ করেছেন সে স্থানটাও দেখে যাইনা কেন। আমি সাঁইত্রিশ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে পাঞ্জাব সফরে বেরুই এবং জলন্ধর ও লাহোর হয়ে পাঠানকোট পৌঁছি। এ সফরে আল্লামা ইকবালের সাথে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তিনি বলেন, চৌধুরী সাহেব যে স্থানটি ওয়াকফ করেছেন তা যেন আমি গ্রহণ করি এবং সেই প্রতিষ্ঠান কায়েম করি যার খসড়া পরিকল্পনা আমি চৌধুরী সাহেবকে পত্রের দ্বারা জানিয়ে দিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে

www.pathagar.org

আমার এবং আল্লামার চিন্তাধারা প্রায় একই রকম ছিল। আল্লামা মরহুম আমার কাছে ওয়াদা করে বলেন, "তুমি যদি এ স্থানে এসে বসে যাও, তাহলে আমি বছরে ছ'মাস এখানে কাটাব।"

"তাঁর এ কথায় এমন আকর্ষণ ছিল যে, তাঁর প্রস্তাব আমি সাথে সাথেই মেনে নিলাম এবং হায়দরাবাদ থেকে পাঠানকোট চলে এলাম। কিন্তু এ গোটা কাহিনীর ট্রাজেডি এই যে, মার্চে আমি পাঠানকোট এলাম, আর এপ্রিলে আল্লামা ইন্তেকাল করলেন।"

আল্লামা ইকবাল তাঁর বন্ধু মহলে এ কথা বারবার উল্লেখ করেন এবং অন্যান্য বিশ্বস্ত সূত্রেও এ কথা জানা গেছে যে, ১৯৩৫ সালের শেষে সরকারী চাকুরী থেকে (এস-ডি-ও) অবসর গ্রহণের পর চৌধুরী নিয়ায আলী দারুল ইসলাম ট্রাস্ট গঠনের পরিকল্পনা যখন আল্লামার নিকটে পেশ করেন তখন তিনি এ সম্পর্কে একমত হন এবং তাঁর পরিকল্পনায় কিছু সংশোধন-সংবর্ধনের পর বলেন, এটাই যুক্তিসংগত যে, কোন শান্ত ও নিরিবিলি স্থানে একটি ছোট বস্তি বা জনপদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, যেখানে খাঁটি ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। সর্বোৎকৃষ্ট মন-মানসিকতা সম্পন্ন কিছু যুবককে সেখানে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যার মাধ্যমে ইসলামী দুনিয়ার সঠিক নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা তাদের মধ্যে পয়দা হবে।

ইসলামের খেদমত ও মুসলমানদের কল্যাণের জন্যে এ পরিকল্পনায় তিনি এতটা সন্তোষ প্রকাশ করেন যে, তিনি ১৯৩৭ সালের ২০ জুলাই চৌধুরী নিয়ায আলীর নিকটে একখানা পত্র লেখেন। এতে তিনি বিশ্বের অবস্থার পটভূমি বর্ণনা করে এ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর উচ্চাশা ও আনন্দকর সম্ভাবনা নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেন-

"এ দেশে ইসলামের জন্য এক অতি নাজুক পরিস্থিতি আসছে। যাদের এ অনুভূতি আছে তাদের অপরিহার্য কর্তব্য (ফরয) হচ্ছে তাকে রক্ষা করার জন্য এদেশের সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা-চরিত্র করা। ইনশাআল্লাহ আপনার প্রতিষ্ঠান এ উদ্দেশ্য ভালোভাবে পূরণ করবে।"

আল্লামা ইকবাল জামে আযহারের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর শায়খ আল্লামা মুস্তাফা আল মারাগীর কাছে লিখিত এক পত্রে এ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যটি প্রকাশ করেন এবং কোন উচ্চশিক্ষিত মিসরীয় আলেমকে এ কাজের জন্যে পাঠাতে অনুরোধ জানান। তিনি নিম্নোক্ত পত্র লেখেন ঃ

"পাঞ্জাবের একটি গ্রামে আমরা এমন এক প্রতিষ্ঠান কায়েম করার মনস্থ করেছি যেখানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত কিছু লোক এবং সেই সাথে দ্বীনি ইলমে বিশেষজ্ঞ কিছু লোক আমরা একত্র করতে চাই। তাঁরা এমন লোক হবেন যে, তাঁদের মধ্যে অতি উচ্চ মানের মানসিক যোগ্যতা থাকতে হবে, ইসলামের জন্যে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকবেন। বর্তমান সভ্যতার হৈহল্লা থেকে

www.pathagar.org

দূরে এক কোণে একটি হোস্টেল বা আবাসস্থল বানাতে চাই। তাঁদের জন্যে একটি মূল্যবান লাইব্রেরীও কায়েম করতে চাই। তাদের রাহনুমাই করার জন্য এমন একজন শিক্ষক প্রয়োজন যিনি কামেল, সৎ এবং কুরআন হাকীমে গভীর দূরদৃষ্টি ও দক্ষতাসম্পন্ন হবেন। সাথে সাথে বর্তমান যুগের বিপ্লবাদি সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল হবেন।"

কিন্তু আল্লামা ইকবাল ও চৌধুরী নিয়ায আলীর শত চেষ্টা ও অনুসন্ধান সত্ত্বেও এমন কোন মর্দে কামেল পাওয়া গেল না। জামে আযহারও এমন লোক পাঠাতে পারলো না। বহু চেষ্টার পর তাঁদের দৃষ্টি অবশেষে মাওলানা মওদূদীর উপরই পড়লো। দারুল ইসলাম পত্রিকায় ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় এক প্রবন্ধে চৌধুরী সাহেব বলেন ঃ

"সে সময়ে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সাথে এ সম্পর্কে আমার চিঠিপত্র লেখার সুযোগ হয় এবং আল্লামা ইকবালের শুভ দৃষ্টিও তাঁর উপর পতিত হয়। যার ফলে তিনি সাঁইত্রিশের শেষের দিকে এখানে সবকিছু দেখতে আসেন। তারপর আল্লামার খেদমতে হাযির হয়ে তিনটি বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনার পর এ প্রতিষ্ঠানে- যার নাম তিনি দিয়েছিলেন 'দারুল ইসলাম'- স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত করেন।"

চৌধুরী নিয়ায আলীর সাথে পত্রের আদান-প্রদান জামালপুর বস্তিতে গিয়ে সেখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি পরিদর্শন এবং আল্লামা ইকবালের সাথে আলাপ-আলোচনার পর যখন তাঁরা মাওলানাকে নতুন স্থানে এসে দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান এবং চৌধুরী সাহেবের ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা সম্পর্কে যখন মাওলানার পূর্ণ আস্থা জন্মে, তখনই তিনি হায়দরাবাদ থেকে চিরদিনের জন্যে হিজরত করে এখানে চলে আসেন।

যে মহান ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ভিত্তিতে দারুল ইসলাম কায়েম করা হয়, যাকে পরে জামায়াতে ইসলামীর সংগঠনে রূপান্তরিত করা হয়, তার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও কর্মপন্থায় বিবরণ জামায়াতে ইসলামীকে উপলব্ধি করার জন্য সহায়ক হবে যা ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করেছি।

দারুল ইসলামের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা

এ প্রতিষ্ঠান ১৯৩৮ সালের ১৪ অক্টোবর রোজ শুক্রবার কায়েম করা হয়। এ প্রতিষ্ঠান এভাবে কায়েম হয়েছিল যে, মাওলানা মওদূদী কতিপয় আলেম-ফাজেল, জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তির সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা ব্যাপক স্কীম তৈরী করেন, যা চল্লিশ ব্যক্তির কাছে মতামতের জন্যে পাঠানো হয়। এসব ব্যক্তি দারুল ইসলামের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন

www.pathagar.org

তাদেরকে জামালপুর আগমনের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হলে বারোজন তাশরাফ আনেন এবং নয়জন তাঁদের মতামত লিখে পাঠিয়ে দেন। তিনদিন যাবত বৈঠকে আলোচনার পর দারুল ইসলামের পরিকল্পনা ও নিয়ম-প্রণালী (Rules of procedures) গৃহীত হয়। যে পাঁচজন দারুল ইসলামের সদস্য হওয়ার জন্যে নিজেদের পেশ করেন তাঁরা ছিলেন- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, মাওলানা আবদুল আযীয শার্কী, মিস্ত্রী মুহাম্মদ সিদ্দীক এবং সাইয়েদ মুহাম্মদ শাহ। পরবর্তীকালে যাঁরা একেবারে দারুল ইসলামে হিজরত করে পরিবারসহ বসবাস করা শুরু করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ঃ

(১) মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহি (২) সাইয়েদ নকী আলী (৩) মালিক গোলাম আলী (৪) আবদুল গাফফার খান (৫) নাঈম সিদ্দিকী (৬) চেরাগুদ্দীন (৭) ফকীর হোসেন (৮) হাফেজ আবদুর রহমান (৯) মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ (১০) আবদুল জাব্বার গাজী (১১) আযম হাশেমী।

এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে নবী-জীবনের আদর্শে জীবনকে গড়ে তোলা এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হাসিল করা। এ এমন এক বিপ্লবাত্মক ধারণা যার মধ্যে বিরাট আকর্ষণ কিন্তু জীবনের চরম ঝুঁকি রয়েছে।

প্রতিষ্ঠান কায়েমের সাথে সাথে মাওলানা মওদূদী ও মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহীকে নিয়ে একটি শিক্ষা বিভাগ গঠন করা হয়। সূচনা অতি নগণ্য বটে, আর বিরাট কাজের সূচনা সাধারণত নগণ্যই হয়ে থাকে।

এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয় যে, যেহেতু খেলাফতে রাশেদার অবসানের পর মুসলমানদের সামনে চিন্তা ও কাজের দিক দিয়ে কোন আদর্শ পরিবেশ ছিল না এবং আজকাল মুসলমানদের জন্যে দারুল ইসলামের কোন নমুনা বিদ্যমান নেই, সেই জন্যে-

১। এখন এ উদ্দেশ্যে কাজের সূচনা করতে হলে- এমন এক জনপদের প্রয়োজন, যেখানে আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া ও উঠাবসার মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রাধান্য সূচিত হবে এবং গোটা পরিবেশে ইসলামের প্রাণ সঞ্চারিত হবে।

২। এখানে ইসলামী শিক্ষার সাথে সাথে ইসলামী চরিত্র গঠনেরও ব্যবস্থা থাকবে। দ্বীনি ইলমের সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে কিছু লোককে বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তোলা হবে যেন তাঁরা চিন্তার ক্ষেত্রে বাতিল ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন।

৩। এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে মুবাল্লিগের একটি সুদক্ষ ও চরিত্রবান টীম তৈরী করা হবে- যারা মুসলিম জনপদে ইসলামী চিন্তাধারা ও কাজের প্রচার-প্রসার করবেন এবং লোকদেরকে সংগঠিত করবেন।

www.pathagar.org

৪। এ ইসলামী পরিবেশে অবস্থান করার জন্যে বাইরে থেকেও কিছু লোক আসতে পারবে, যাতে করে এ পরিবেশের প্রভাব তাদের আকীদা বিশ্বাস ও স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অমুসলিম বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতগণও এখানে এসে ইসলামী জীবন যাপনের নমুনা স্বচক্ষে দেখতে পারেন। এভাবেই খেলাফতে রাশেদার মহান সভ্যতাকে তুলে ধরা যেতে পারে।

এ প্রতিষ্ঠানটি একটি আন্দোলনের রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এ দারুল ইসলাম আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের সংস্কার-সংশোধন, তালীম-তরবিয়ত ও সংগঠনের ফরমুলা তৈরী করা হয়েছিল। একটি মুসলমান পরিবারকে এর প্রাথমিক ইউনিট হিসেবে স্থির করা হয়েছিল। মুসলিম সমাজে যেহেতু পারিবারিক জীবনকে ভিত্তি বলে গণ্য করা হয়েছে- সে জন্য মানুষ গড়ার প্রাথমিক কারখানা এই পরিবার। এজন্য দারুল ইসলাম আন্দোলন পরিবারকেই সংস্কারের প্রাথমিক ইউনিট হিসেবে গ্রহণ করে। তার ফরমুলা হলো ঃ

"মুসলমানের পরিবার প্রশিক্ষণ ও সংস্কারমূলক কর্মসূচির কেন্দ্র। এখানে একটি পরিবার-একটি ইসলামী জামায়াত এবং মুসলিম পরিবারের প্রধানই হলো এ জামায়াতের আমীর- এবং শরিয়তের দিক দিয়ে এ আমীরই তার সংক্ষিপ্ত জামায়াতকে ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী চালাবার এবং তালীম-তরবিয়ত দেয়ার দায়িত্বশীল। এভাবে একটি পরিবারের সংস্কার-সংশোধন হয়ে গেলে সমগ্র জাতির সংস্কার-সংশোধন আপনা-আপনিই হয়ে যাবে। এ প্রতিষ্ঠানের মতে জাতির সংস্কারের জন্যে এটাই হচ্ছে সহজতম পন্থা।

দারুল ইসলামের গঠনতন্ত্র

ইসলাম নিছক একটা বিশ্বাস এবং কিছু দৈনিক ক্রিয়াকর্ম ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয় বরং একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা- যার নিয়ন্ত্রণ মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের উপর পরিব্যাপ্ত। এ এক ব্যাপক সভ্যতা যার মধ্যে রয়েছে একটা পরিপূর্ণ তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা। এ সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলনীতির উপর যারা ঈমান রাখে শুধু তাদেরকে বলে মুসলমান। আর মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে মানবীয় তামাদ্দুনের ভিত্তি ইসলামী মূলনীতির উপর কায়েম করা।

কাজের চিত্র

মুসলমান হিসেবে আমরা একটি বিপ্লবী মিশনের ধারক ও বাহক, আর এ মিশন মুসলমানিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও অংশ। এখন আমাদের বিশ্লেষণ করা দরকার যে, এ কাজ কিভাবে করা উচিত। সর্বপ্রথম যে জিনিসের প্রয়োজন তা হলো এই যে- এদেশে যতো লোক এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে একমত এবং এ লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত তাদের একটি দলে একতাবদ্ধ করতে হবে। তাদের দলীয়

www.pathagar.org

সংগঠন হবে বিশুদ্ধ ইসলামী মূলনীতির উপর। এ উদ্দেশ্যে যে গঠনতন্ত্র তৈরী করা হয়েছে তার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

১। প্রত্যেক মুসলমান এ দলের সদস্য হতে পারে। তার জন্য শর্ত এই যে, তাকে এর লক্ষ্যের সাথে একমত হতে হবে, সংগঠনের আনুগত্য করতে হবে। সদস্যপদের জন্য কোন ফিস নেই। শুধু ঈমান ও আমলই ফিস।

২। প্রত্যেক মুসলমান এর সভাপতি হতে পারবেন- যদি তিনি যোগ্যতার দিক দিয়ে দলের আস্থাভাজন হন।

৩। সভাপতির পদ নির্বাচনমূলক- স্বঘোষিত নয়।

৪। সভাপতিকে পদচ্যুত করা যাবে- যদি তিনি দলের আস্থা হারিয়ে ফেলেন।

৫। শূরা ও সভাপতির নির্বাচন, সভাপতির এখতিয়ার ও তাঁর জবাবদিহি সম্পর্কে আধুনিক যুগের তথাকথিত গণতন্ত্রের অনুকরণ করা হয়নি। বরঞ্চ খেলাফতে রাশেদার সাদাসিধে এবং সত্যিকার নমুনা অনুসরণ করা হয়েছে। জামায়াতের মর্জি অনুযায়ী একজন তার নেতা হতে পারবেন এবং যতোদিন জামায়াত তাঁর উপর আস্থা পোষণ করবে, ততদিন তিনি তাঁর দূরদর্শিতা অনুযায়ী কাজ করার পূর্ণ সুযোগ পাবেন।

৬। অবস্থার প্রতিকূলতা লক্ষ্য করে, এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যারা মন-প্রাণ দিয়ে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের জন্যে কাজ করতে পারেন এবং কাজে জন্য জীবনের সকল প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ করতে তৈরী থাকলে তাঁরাই এর সত্যিকার কর্মী হবেন। আর যারা উদ্দেশ্যের সাথে একমত ও সহানভূতিশীল এবং কিছু পরিমাণে আর্থিক সাহায্যও করে থাকেন কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে অধিকতর নাজুক দায়িত্ব বহন করতে অক্ষম, যেহেতু আমাদের জাতি এমন দুর্বলতার স্তরে রয়েছে এবং আমরা সকল সম্ভাব্য শক্তি কাজে লাগাতে চাই, সেজন্য এ ধরনের লোককেও আমরা ছাড়তে পারি না। আমরা তাঁদেরকে 'সহযোগী' হিসেবে গণ্য করি।

ইসলামী সীরাত

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে- যারা দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রস্তুত হবেন, তাদেরকে বাস্তবে মুসলমান হতে হবে এবং ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের নমুনা হতে হবে। আমরা তাদের মত হতে চাই না যাদের কথাবার্তা সোশ্যালিস্টদের মত কিন্তু জীবন যাপন বুর্জোয়াদের মত। এ ধরনের লোক কোন বিপ্লব সাধন করতে পারে না। কারণ তারা যেসব মূলনীতির ধারক-বাহক বলে নিজেদের প্রচার করে অথচ স্বয়ং তদনুযায়ী কাজ করে না, তারা কি করে অন্যদেরকে তাদের

www.pathagar.org

অনুসারী বানাতে পারে? এজন্যে গঠনতন্ত্রে প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও সহযোগীদের জন্য এ অপরিহার্য শর্ত রাখা হয়েছে যে, তাঁরা কার্যত ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করবেন।

আর্থিক উপায়-উপকরণ

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-আর্থিক উপকরণের। এ প্রসঙ্গে আমরা প্রাথমিক ইসলামী যুগের অনুসরণ করেছি। যাঁরা ইসলামের মূল লক্ষ্য নিজেদের জীবনের লক্ষ্য বানাতে চান, তাঁরা তাঁদের কাজের জন্যে এমন লোকের কাছে হাত পাতবেন না যাদের সামনে এ ধরনের কোন লক্ষ্য নেই। তাঁদেরকে, নিজের হাতে অর্জিত সম্পদ এ পথে ব্যয় করতে হবে। বাইরের লোকেরা স্বেচ্ছায় যদি আমাদের কাজে সাহায্য করে, তাহলে তাদের সাহায্য গ্রহণ করব কিন্তু আমরা স্বয়ং তাদের কাছে চাইতে যাব না। এজন্যে সচ্ছল রুকন (সদস্য) ও সহযোগীদের জন্যে এটা অপরিহার্য করা হয়েছে যে, তারা তাদের আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ এ প্রতিষ্ঠানের বায়তুল মালে জমা দেবেন।

দ্বিতীয় পন্থা এ রাখা হয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি বা দল প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য করতে চান, অথবা এ উদ্দেশ্যে কোন সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করতে চান, তাহলে এ প্রতিষ্ঠানের পলিসি অথবা তার কর্মপদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার তাদের থাকবে না। এ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার প্রতি যার পূর্ণ আস্থা থাকবে সে এর সাহায্য করতে পারে। আস্থা না থাকলে করবে না। এমনি আর্থিক সাহায্যকারীদের হিসাবপত্র জানার অধিকার থাকবে। কোন কোন খাতে ব্যয় হবে তাও তাঁরা নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন।

উদ্দেশ্য হাসিলের পথ

জামায়াত গঠনের পর দ্বিতীয় প্রশ্ন দাঁড়ায় আমরা আমাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে কোন পন্থা অবলম্বন করব। এ ব্যাপারে একথা জেনে রাখা দরকার যে, দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে বাধাবিঘ্নের এক বিরাট পাহাড় সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে যা সরিয়ে দেয়া কোন সহজ কাজ নয়। অতঃপর প্রতিবন্ধকতা দূর করার সাথে সাথে দারুল ইসলামের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করাও এক কঠিন কাজ। এ দুটি কাজ অসাধারণ হিকমত ও চরম ত্যাগের মাধ্যমে ক্রমশ করে যেতে হবে।

প্রতিরোধ

সর্বপ্রথম করার কাজ এই যে, বিরোধী আদর্শের বিপ্লবী শক্তিগুলো যেভাবে গোটা পরিবেশের উপর ছেয়ে আছে তার প্রতিরোধ করতে হবে। কারণ আমরা যদি শুধু গঠনমূলক কাজেই লেগে থাকি এবং প্রতিরোধের চিন্তা না করি, তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে গঠনমূলক কাজেরও কোন সুযোগ থাকবে না। এর জন্যে প্রথম

www.pathagar.org

প্রয়োজন এই যে, আমাদের কেন্দ্রে অতি শীঘ্রই এক প্রচার বিভাগ কায়েম করতে হবে। এরপর পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তাধারা সৃষ্টি করতে হবে।

কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের বাইরে যেসব সদস্য ও সহযোগী দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকবেন তাঁদের কাজ এই হবে যে, কেন্দ্র থেকে যে আওয়াজ উঠবে তা মুসলিম জনসাধারণ, বিশেষ করে জাতির কর্তৃত্বশীল ও কর্মীমহলে পৌঁছিয়ে দেবেন এবং জনমত সৃষ্টির পুরোপুরি চেষ্টা করবেন। সম্ভব হলে কেন্দ্রের বাইরেও প্রচার বিভাগের বিভিন্ন কেন্দ্র খোলা যেতে পারে এবং সেগুলোকে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের নির্দেশে কাজ করতে হবে।

গঠনমূলক কাজ

আমাদেরকে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। সাধারণত মানুষ এ ভুল ধারণায় লিপ্ত আছে যে, দারুল ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্যে শুধু তরবারির শক্তির প্রয়োজন। এ নাম উচ্চারিত হবার সাথে সাথে তাদের মনের মধ্যে এক ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাতের চিত্র ভেসে ওঠে এবং তারা মনে করে এ কাজ করার জন্যে অর্থাৎ দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলমানদেরকে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র বিপ্লব করতে হবে এবং এর জন্য হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে কিছু মুসলমানের মাথা কাটাকাটি অনিবার্য হয়ে পড়বে। কিন্তু এটা ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। তামাদ্দুনিক ব্যবস্থার বিপ্লব এভাবে হয় না এবং হতে পারে না। তামাদ্দুনিক বিপ্লবের জন্যে সর্বপ্রথম যে জিনিসের প্রয়োজন তা হলো এই যে, বিপ্লবের চিন্তাধারার ভিত মজবুত করতে হবে। আধুনিক যুগের সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মূলনীতি ও তার শাখা-প্রশাখার ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করতে হবে যাতে করে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা দল এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং তারা অনুভব করতে থাকে যে, এ ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে অযৌক্তিক ও অনিষ্টকর। তারপর এ ব্যবস্থার পরিবর্তে যা কায়েম করতে হবে তার মৌলিক ধারণা থেকে শুরু করে তার বাস্তব বিবরণ এমন পুংখানুপুংখরূপে বিশ্লেষণ করতে হবে যেন জনগণের বিরাট সংখ্যক লোক তাতে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে এবং বুঝতে পারে যে, এ ব্যবস্থা শুধু অত্যন্ত যুক্তিগত ও স্বাভাবিকই নয়, বরঞ্চ পুরোপুরি কার্যোপযোগী এবং সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান তার মধ্যেই নিহিত। একে শুধু তাত্ত্বিক দিক দিয়েই প্রমাণ করা হবে না, বরঞ্চ সাথে সাথে বাস্তব দিক দিয়েও তা করে দেখাতে হবে, তা যতই সীমিত পরিমাণে হোক না কেন। এ কাজ গভীর বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা ও ক্রমাগত অক্লান্ত পরিশ্রমের সাথে কিছুকাল পর্যন্ত করে যেতে হবে। অবশেষে অধিকাংশ লোককে সমমনা বানিয়ে ফেলতে হবে। শুধুমাত্র সে মহলটিই এর বিরোধিতা করবে যারা হঠকারিতায় লিপ্ত থাকবে এবং বর্তমান তামাদ্দুনিক

www.pathagar.org

ব্যবস্থার সাথে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে তাকে সমর্থন করতে থাকবে। তারপর অবশ্য প্রয়োজন হবে শক্তির মাধ্যমে এ তামাদ্দুনিক ব্যবস্থাকে উৎখাত করে নতুন বিপ্লবী ব্যবস্থা কায়েম করা। তারপর বিরুদ্ধবাদীদের এ ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য করা হবে।

ইসলামী বিপ্লবের এই একমাত্র পথ যা কুরআন হাকীম পেশ করেছে এবং রসূলে করীম (সঃ) করে দেখিয়েছেন, এর অনুসরণই আমাদেরকে করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে কাজকে দুভাগে ভাগ করতে হবে- তাত্ত্বিক বিভাগ (Theoritical Section) এবং ব্যবহারিক বিভাগ (Practical Section)।

তাত্ত্বিক বিভাগ

১। এ বিভাগে শুধু তাদেরকে নেয়া হবে যারা আরবীতে মাদ্রাসা ও ইংরেজী কলেজ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। অথবা যাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমানের। শর্ত এই যে, তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক সদস্য হতে হবে এবং ইসলামের খেদমতের জন্যে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করবেন। প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে তাঁদের স্বভাব-চরিত্র ও মানসিক যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

২। তাঁদেরকে স্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় সংগঠনে অবস্থান করতে হবে এবং এখানকার নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে যাতে করে পরিবেশের প্রভাবে তাদের মধ্যে পুরোপুরি ইসলামী মন-মানসিকতা তৈরী হয় এবং তাকওয়ার সে প্রাণশক্তি তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় যা দ্বীন ইসলামের মর্মকথা উপলব্ধি করার জন্যে প্রয়োজন।

৩। আরবী শিক্ষিত লোকদেরকে ইংরেজী ভাষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ইংরেজী শিক্ষিতদেরকে আরবী ভাষা ও ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে তাদের মধ্যে এ বিষয়েও প্রাথমিক যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে তাঁরা গবেষণা ও ইজতেহাদের পথে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। এ শিক্ষাকালে এ চেষ্টাও করা হবে যার ফলে এ উভয় দল একই স্তরে এসে যায়, উভয়ের মনে প্রাপ্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্যাদির যে স্তূপ ভ্রান্তভাবে গড়ে উঠেছে তা যেন সংশোধিত ও সুবিন্যস্ত করা যায় এবং তাদের দৃষ্টিকোণকে ইসলামের দৃষ্টিকোণে পরিণত করা যায়।

৪। ইসলামের সঠিক ধারণার জন্যে কুরআনে করীমের দরস নিয়মিতভাবে দিতে হবে। এ দরস এ মৌলিক ধারণার উপর দেয়া হবে যে, কুরআন এ জ্ঞানের প্রকৃত উৎস, সত্যের কেন্দ্রবিন্দু এবং সৃষ্টিজগতের সকল সমস্যার চাবিকাঠি তার মধ্যেই নিহিত আছে। সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার এই হচ্ছে সঠিক সূচনাবিন্দু এবং এই হচ্ছে সঠিক গন্তব্যস্থল। এর পথ-নির্দেশনা থেকে সম্পর্কহীন হয়ে একটি জ্ঞান সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তা সঠিক পথে আসতেও পারে না যতক্ষণ না কুরআনকে পথপ্রদর্শক বলে গ্রহণ করা

www.pathagar.org

হয়েছে। শুধু পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানই নয়, ইসলামী জ্ঞানও এজন্যে উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়েছে যে, কুরআনকে সম্মুখে রাখার পরিবর্তে পেছনে রাখা হয়েছে। হাদীস ফিকাহ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মূলনীতি, ইসলামী বিজ্ঞান, দর্শন, ইসলামী ইতিহাস সকলেরই প্রাণশক্তি কুরআনে আছে। এ প্রাণশক্তির অভাবে সবই প্রাণহীন এবং এ প্রাণশক্তি লাভ করলে সবই জীবন্ত ও গতিশীল হয়ে পড়ে।

৫। দ্বীনের মধ্যে ইজতিহাদী দূরদর্শিতা সৃষ্টি করার জন্যে সীরাত পাকের শিক্ষা অবশ্যই দেয়া হবে যাতে শিক্ষার্থী নবী পাকের মেযাজ ও রুচি-প্রকৃতির সাথে পরিচিত হতে পারে যা শরীয়ত ও মিল্লাতের রুচি-প্রকৃতি। সেই সাথে সাহাবায়ে কেরাম ও অতীতের মুজতাহিদগণের সীরাত ও অবিস্মরণীয় অবদান সম্পর্কে পড়াশুনা করাতে হবে। তা হলেই শিক্ষার্থী ভালোভাবে জানতে পারবে দ্বীন ইসলামের সীমারেখার মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন গবেষণার অবদান কতদূর পর্যন্ত পাওয়া যায় এবং কোথায় পৌঁছার পর এ স্বাধীনতা দ্বীনের সীমান্ত অতিক্রম করে।

৬। এভাবে গবেষণা ও ইজতিহাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং ইসলামের প্রাণশক্তি সম্পর্কে জ্ঞান সৃষ্টি করার পর তাদেরকে তাদের যোগ্যতা ও ঝোঁকপ্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা হবে। অতঃপর এক এক গ্রুপকে এক এক বিষয়ে (Subject) গবেষণার কাজে লাগানো হবে। যেমন এক গ্রুপ দর্শন ও অব্যবহারিক (Theoritcal) বিজ্ঞান, দ্বিতীয় গ্রুপ সমাজ ও অর্থনীতি, তৃতীয় গ্রুপ আইন ও তথ্য সংক্রান্ত বিষয়াদির উপর গবেষণা করবে।

৭। গবেষণা ও সমালোচনার এসব বিভিন্ন বিভাগে পথ-নিদের্শনা দেবেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং তার পথ-নির্দেশনার পন্থা এমন হবে যে, গবেষকদের মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতার প্রাণশক্তিও অক্ষুণ্ন থাকবে এবং সেই সাথে ইসলামের সীরাতে মুস্তাকীম থেকে তাঁরা সরেও পড়বেন না। আর বিভিন্ন বিভাগের উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য থাকবে।

৮। বাইরের সদস্য ও সহযোগী এসব বিভাগে তিন প্রকারে সাহায্য করবেন। এক, যোগ্যতম লোক তালাশ করে এসব বিভাগে কাজের জন্য পাঠাবেন। দ্বিতীয়, এসব বিভাগ থেকে যেসব সাহিত্য প্রকাশিত হবে তা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিবেন। তৃতীয়ত এসব বিভাগের আর্থিক প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করবেন।

www.pathagar.org

ব্যবহারিক বিভাগ

১। এ বিভাগে ঐসব লোক নেয়া হবে যাদের মধ্যে উচ্চমানের বাস্তব যোগ্যতা রয়েছে।

২। প্রথমত, তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে যাতে তাঁরা তাঁদের বিশেষ কর্মক্ষেত্রে সঠিক ইসলামী পদ্ধতিতে কাজ করতে পারেন।

৩। প্রশিক্ষণের সময় তাঁদের যোগ্যতার সঠিক আন্দাজ-অনুমান করে তাঁদের কাজের বিভিন্ন পথ বলে দেয়া হবে- যার মধ্যে কিছুর উল্লেখ নিম্নে করা হলো ঃ

(ক) একটি দল মসজিদে ইমামতির জন্যে তৈরী করা হবে। তাঁরা মসজিদের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করবে, তাদের সংস্কার ও সংগঠন করবে। বাইরের সদস্য ও সহযোগীদের কাজ হবে- এভাবে যেসব ইমাম তৈরী হবেন তাঁদেরকে তাঁরা কেন্দ্রীয় স্থানগুলোতে নিযুক্ত করবেন।

(খ) একটি দলকে গ্রামাঞ্চলে কাজের জন্যে তৈরী করা হবে। তাদের কর্মক্ষেত্র তৈরী করার দায়িত্ব বাইরের সদস্য ও সহযোগীদের উপর।

(গ) একটি দল বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও কারিগরী স্কীমকে ইসলামী মূলনীতির উপর চালু করার জন্যে তৈরী করা হবে। তাঁরা বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক ও কারিগরী সমস্যাবলীর সমাধান করে বাস্তবে ইসলামী তামাদ্দুনের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন।

৪। এ বিভাগে প্রত্যেক বিষয়ের লোক এবং সকল প্রকার যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন। এঁদের তালাশ করে কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়া এবং পরবর্তীকাল তাদের জন্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মক্ষেত্র সংগ্রহ করে দেয়া প্রতিষ্ঠানের বাইরের শাখাগুলোর কাজ হবে।

কাজের প্রসার

প্রথমত, এ দুটি বিভাগ কেন্দ্রে কায়েম করা হবে। কিন্তু অবস্থা অনুকূল হলে দেশের অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

এ সময়ে আমরা গঠনমূলক কাজের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে পদক্ষেপ করছি এবং এ পর্যায় সম্পর্কেই আমরা বিস্তারিত কিছু বলতে পারি। এখন এ কথা বলা মুশকিল যে, প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির পর আমরা আমাদের লক্ষ্যের দিকে কিভাবে অগ্রসর হব।

প্রথম মনযিলের নিকটবর্তী হওয়ার পর দ্বিতীয় মনযিলের পথ ইনশাআল্লাহ আপনা-আপনি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

www.pathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

মাওলানা মওদূদীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা

উপরে বলা হয়েছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯৩৭ সালে ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস শাসন তথা হিন্দু রামরাজত্ব কায়েম হয়েছিল এবং একজাতীয়তার ভিত্তিতে ভারতে কোন শাসন ব্যবস্থা যে মুসলমান জাতির জন্যে মৃত্যুরই নামান্তর তা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল- যার জন্যে মাওলানা তাঁর ঐতিহাসিক ও মূল্যবান প্রবন্ধাদি "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ" শিরোনামে লেখা শুরু করেছিলেন, যা পরে তিন খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর এ প্রবন্ধগুলো মুসলমানদের মধ্যে যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে তাদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে কিছু আলোচনার একান্ত প্রয়োজন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মুসলমান নেতৃবৃন্দকে উপেক্ষা করে সাধারণ মুসলমানদেরকে জালে আবদ্ধ করার জন্যে মুসলিম গণসংযোগ আন্দোলন (Muslim Mass Contact Movement) শুরু করে। এ আন্দোলনের প্রকৃত কর্মী ছিল কমিউনিস্ট, যার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু- মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর পিতা। আলেমদের একটি দলও এর মধ্যে শামিল ছিল। তাঁরা একথা মেনে নিয়েছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান মিলে এক জাতি হতে পারে এবং এ জাতির মধ্যে একটা গণতান্ত্রিক অবস্থা চালু করা যায়, যার ফয়সালা করার অধিকার থাকবে সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে।

ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যানুপাত ছিল তিন ও এক। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের হাতে সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ার পর মুসলমানদের মৌলিক অধিকারসমূহ এবং জাতীয় সত্তা বিলুপ্ত হলেও তাদের বলার কিছুই থাকবে না। কারণ তারা হিন্দু-মুসলিম একজাতীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছে। একজাতীয়তার ফাঁদে আবদ্ধ করে মুসলমানদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য নির্মূল করার যে কত বড় ষড়যন্ত্র চলছিল তা আর কোন মুসলমান উপলব্ধি না করলেও মাওলানা মওদূদী করেছিলেন। দারুল উলুম দেওবন্দ- এর শায়খুল হাদীস, মুসলমানদের সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন আলেম, ইসলামী শরিয়তের মুখপাত্র মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী দিল্লী জামে মসজিদ থেকে তো ফতোয়াই জারী করলেন যে, হিন্দু-মুসলমান মিলে এক জাতি। এরপর আর কথা বলার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু এর ফলে মুসলমানদের অস্তিত্ব যে বিপন্ন হবে একথা উপলব্ধি করেছিলেন মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষিত অ-আলেম

www.pathagar.org

নেতৃবৃন্দ। তাই তারা মুসলমান জাতিকে রক্ষা করার জন্যে 'রক্ষাকবচ' দাবা করলেন। এটাও যে অর্থহীন তা মাওলানার কাছে সুস্পষ্ট ছিল। কারণ, কোন ব্যক্তি রাক্ষসের ক্ষুধার শিকার হওয়ার পর তার কাছে 'রক্ষাকবচের' দাবী করে কোন ফল লাভ হয় না। মুসলমান জাতির এমন এক নাজুক পরিস্থিতিতে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর মাসিক তর্জুমানুল কুরআনে জাতীয়তার উপর তাঁর ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। মাওলানার ভাষায় মুসলমানরা তাদের জাতীয়তা যেন কোনক্রমেই ভুলে না যায় এবং তাদেকে অমুসলিম জাতীয়তার মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া থেকে কি করে রক্ষা করা যায় সে সময়ে এটাই ছিল তাঁর সর্বপ্রথম করার কাজ।

তর্জুমানুল কুরআনে মাওলানা বলেন

একদল লোক মুসলমানদের জন্যে 'জাতি' শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, 'জাতি' অথবা 'উম্মত' শব্দ দুটো কোন অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং ইসলামের 'জাতীয়তা' কোন ধরনের। ফলে তাঁরা মুসলমানদেরকেও ঠিক ঐ অর্থেই জাতি মনে করেন যেমন হিন্দু একটি জাতি অথবা জার্মান একটি জাতি এবং এ ভুল ধারণা তাদের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পলিসিকে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারে ভ্রান্ত এবং মারাত্মক করে ফেলে।

দ্বিতীয় দল জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক নীতি একেবারে ভুলে যান। শুধু তাই নয় যে, তাঁরা মুসলমানদের জন্য অমুসলিমদের সাথে একজাতীয়তায় শরীক হওয়া জায়েয মনে করেন, বরঞ্চ এতখানি অগ্রসর হন যে, জাতীয়তাবাদের (Nationalism) মতো একটা অভিশপ্ত জিনিসকে গ্রহণ করতে এবং তা প্রচার করতেও দ্বিধাবোধ করেন না।"

ইসলামী জাতীয়তা ছাড়াও অন্যান্য জাতীয়তার সমালোচনা করে মাওলানা বলেন, "বংশ, জন্মভূমি, ভাষা ও বর্ণ এসবের ভিত্তিতে তৈরী জাতীয়তা মানব জাতির জন্যে এক বিরাট বিপদ। তাঁরা মানব জাতিকে শত শত, হাজার হাজার অংশে বিভক্ত করেছেন এবং সে অংশগুলো এমন যে, সেগুলোকে নির্মূল করা যেতে পারে কিন্তু অন্য অংশের সাথে কিছুতেই একীভূত করা যেতে পারে না।

তারা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা, প্রতিবন্ধকতা ও কপটতার এক চিরন্তন সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে। একটি অন্যটিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে এবং পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে শেষও হয়ে যায়।

এসবই হচ্ছে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তাহীনতা ও হানাহানির চির উৎস, খোদার সবচেয়ে বড় অভিশাপ এবং শয়তানের সার্থক হাতিয়ার, যার দ্বারা সে তার আদি দুশমনকে নিপাত করে।

www.pathagar.org

মাওলানা জিজ্ঞেস করেন

এর চেয়ে অধিকতর অযৌক্তিক মানসিকতা মানুষের জন্যে আর কিছু হতে পারে কি যে, সে অযোগ্য, লম্পট ও দুষ্ট লোককে একজন সৎলোকের উপর শুধু এজন্যে প্রাধান্য দেবে যে, প্রথম ব্যক্তি এক বংশে জন্মগ্রহণ করেছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্য বংশে। প্রথম ব্যক্তি একটি পাহাড়ের পশ্চিম দিকে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি পাহাড়ের পূর্ব দিকে! প্রথম ব্যক্তি এক ভাষায় কথা বলে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্য ভাষায় এবং কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির মনে এমন কোন ধারণার অবকাশ থাকতে পারে কি যে, সততা, ভদ্রতা ও শালীনতা এবং মানবতার গুণাবলীকে শিরা-উপশিরা, রক্ত, মুখের ভাষা এবং জন্মভূমির মাটির মানদণ্ডে যাচাই করা হবে?

অতঃপর মাওলানা বলেন,

মানুষের জন্যে মানুষের মর্যাদা লাভ তার দেহের বর্ণের ভিত্তিতে হয় না, বরঞ্চ তার আত্মচেতনা এবং প্রকাশভঙ্গির ভিত্তিতে হয়।

তিনি আরও বলেন,

জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি যতই প্রসারিত হচ্ছে, দূরদৃষ্টি যতই বেড়ে চলেছে এবং মনের প্রশস্ততা যতই সৃষ্টি হচ্ছে, জাতীয়তার এ জড়বাদী ধারণা বিদূরিত হচ্ছে এবং আঞ্চলিকতার স্থানে আন্তর্জাতিকতার প্রেরণা সৃষ্টি হচ্ছে।

ইসলামী জাতীয়তা

মাওলানা পাশ্চাত্যের জাতীয়তা খতম করে ইসলামী জাতীয়তাকে সঠিক মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে পেশ করে বলেছেন- "আপনারা গোটা কুরআন অধ্যয়ন করে দেখুন যার মধ্যে একটি শব্দও বংশীয় ও আঞ্চলিক জাতীয়তার সমর্থনে পাওয়া যাবে না। তার আহ্বান সমগ্র মানবজাতির প্রতি। দুনিয়ার সকল মানুষকে সে মঙ্গল ও কল্যাণের দিকে ডাকছে। (ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ পৃঃ ১৪)

"কুফর ও শির্কের অজ্ঞতার পর ইসলামের দাওয়াতে হকের যদি কোন বড় দুশমন থাকে, তাহলে সে হচ্ছে এ বংশ ও জন্মভূমির শয়তান। (ঐ ১৮)

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সঃ) বিশুদ্ধ যুক্তিসম্মত ভিত্তির উপর এক নতুন জাতীয়তার প্রাসাদ গড়েছেন। এ জাতীয়তার ভিত্তিও বৈশিষ্ট্যমূলক। কিন্তু বস্তুবাদী ও গতানুগতিক বৈশিষ্ট্যের উপর নয় বরঞ্চ আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বৈশিষ্ট্যের উপর। সে মানুষের সামনে এক প্রাকৃতিক সত্যতা পেশ করে যার নাম ইসলাম। এ খোদার বন্দেগী ও আনুগত্য, মনের পবিত্রতা, সৎকর্মশীলতা এবং তাকওয়ার দিকে মানব জাতিকে আহ্বান জানায়। তারপর বলে যে, যে এ আহ্বানে সাড়া

www.pathagar.org

দেয়, সে এক জাতিভুক্ত এবং যে এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে, সে অন্য জাতিভুক্ত। একটি জাতি ঈমান ও ইসলামের এবং তার সব লোক একটি উম্মাহ। আর একটি জাতি কুফর ও পথভ্রষ্টতার। তার অনুসারীগণ তাদের পারস্পরিক মতানৈক্য সত্ত্বেও একটি দল বা জাতি। (ঐ পৃঃ ২০)

এ দুটি জাতির মধ্যে পার্থক্যের বুনিয়াদ বংশ ও বংশ-পরম্পরা নয়, বরঞ্চ বিশ্বাস ও কর্ম। হতে পারে যে, এক পিতার দুটি পুত্র ইসলাম ও কুফরের পার্থক্যের জন্যে পৃথক পৃথক হয়ে যাবে এবং দুজন অপরিচিত লোক ইসলামে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কারণে একই জাতিভুক্ত হয়ে যাবে। (ঐ পৃঃ ২০)

এটাও সম্ভব যে, একটি মহল্লা ও একটি বস্তির দুজন লোকের জাতীয়তা ইসলাম ও কুফরের অনৈক্যের কারণে পৃথক হবে এবং একজন হাবশী ইসলামের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কারণে একজন মরক্কোবাসীর ভাই হয়ে যাবে। (ঐ পৃঃ ২০)

এখানে বিচার্য মুখের ভাষা ও বর্ণের দিক দিয়ে নয়, বরঞ্চ আল্লাহর রঙের দিক দিয়ে। এমনও হতে পারে যে, ইসলামের দিক দিয়ে একজন গৌরবর্ণের ও একজন কালো বর্ণের লোক এক জাতি হবে এবং কুফরের দিক দিয়ে দুজন গৌরবর্ণের লোক দুটি পৃথক জাতি হবে। (ঐ পৃঃ ২০-২১)

এখানে মুখের ভাষা নয় শুধু মনের ভাষাই ধরা হবে, যা দ্বারা দুনিয়ায় বলা এবং বুঝা যায়। (ঐ পৃঃ ২১)

এখানে ঝগড়া ধন-দৌলতের নয়, ঈমানের। মানুষের শাসনের নয়, খোদার বাদশাহীর। (ঐ পৃঃ ২১)

"যারা আল্লাহর শাসনে অনুগত এবং যারা খোদার হাতে নিজের জানমাল বিক্রি করেছে তারা সকলে একজাতি, তারা হিন্দুস্তানের হোক অথবা তুর্কিস্তানের। আর যারা খোদার শাসন-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং শয়তানের সাথে জানমালের সওদা করেছে, তারা অন্য এক জাতি। আমাদের এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই যে, তারা কোন রাজ্যের প্রজা এবং কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট।" (ঐ পৃঃ ২১)

"ইসলাম জাতীয়তার যে পরিসীমা এঁকে দিয়েছে তা কোন ভাবপ্রবণ ও জড়বাদী পরিসীমা নয়, বরঞ্চ একটি বিশুদ্ধ যুক্তিসঙ্গত পরিসীমা এর পরিসীমা পরিবেষ্টন করে আছে-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

এ কালেমার উপরেই বন্ধুত্ব এবং এর উপরেই দুশমনি। এর স্বীকৃতিই একত্র করে, এর অস্বীকৃতিই পৃথক করে। যাদেরকে পৃথক করে দিয়েছে তাদেরকে না

www.pathagar.org

রক্তের সম্পর্ক একত্র করতে পারে, না মাটির, না ভাষার, না বর্ণ ও বংশের, রুচি হালুয়ার আর না কোন রাষ্ট্রের সম্পর্ক। যাদেরকে সে একত্র করেছে, তাদেরকে কেউ পৃথক করতে পারে না।" (ঐ ২১-২২)

"কোন নদী, কোন পাহাড়, কোন সমুদ্র, কোন ভাষা, কোন বংশ, কোন বর্ণ, কোন ধন-দৌলতের (অথবা অন্য) ঝগড়া-বিবাদ এ অধিকার লাভ করে না যে, ইসলামের পরিসীমার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী রেখা টেনে মুসলমান ও মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য করবে।" (ঐ ২১-২২)

"প্রত্যেক মুসলমান সে চীনের হোক অথবা মরক্কোর, সাদা হোক বা কাল, হিন্দীভাষী হোক অথবা আরবীভাষী, অনার্য হোক বা আর্য, একই সরকারের প্রজা হোক অথবা অন্য সরকারের সে মুসলমান জাতিরই একজন, ইসলামী সমাজেরই সদস্য, ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক, ইসলামী ফৌজেরই সিপাহী, ইসলামী আইন সংরক্ষণের অধিকারী।" (ঐ ২২)

"ইসলাম দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুর উপর অগ্রগণ্য, প্রতিটি বস্তু ইসলামের জন্যে কুরবান করা যেতে পারে এবং ইসলামকে কোন বস্তুর জন্যে কুরবান করা যেতে পারে না।" (ঐ ২৪)

"ইসলামী জাতীয়তা গঠনে বংশ, জন্মভূমি, ভাষা ও বর্ণের কোনই অংশ নেই। এ প্রাসাদ যে নির্মাতা বানিয়েছেন তাঁর ধারণা দুনিয়া থেকে স্বতন্ত্র। তিনি সারা মানব জগতের কাঁচামালের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। যেখানে যেখানে তিনি ভালো এবং মজবুত মসলা পেলেন, ঈমান ও আমলের পাকা চুন দিয়ে বিভিন্ন অংশগুলোকে একত্রে গাঁথলেন এবং বিশ্বজনীন জাতীয়তার প্রাসাদ গড়লেন, যা সমগ্র ভূমণ্ডলে ছেয়ে রয়েছে।" (ঐ পৃঃ ৩০)

"যেভাবে একটি রাজ্যের মধ্যে কয়েকটি রাজ্য হতে পারে না, তেমনি একটি জাতির মধ্যে কয়েকটি জাতি হতে পারে না। ইসলামী জাতীয়তার ভেতরে বংশীয়, ভৌগোলিক, ভাষাভিত্তিক ও বর্ণভিত্তিক জাতীয়তাগুলো কখনোই একত্র হতে পারে না। এ দুপ্রকার জাতীয়তার মধ্যে একটাই কায়েম থাকতে পারে।" (ঐ পৃঃ ৩১)

"যে মুসলমান মুসলমান থাকতে চায়, তাকে সকল জাতীয়তার অনুভূতিকে বাতিল এবং সকল মাটি ও রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। আর যে, এ সম্পর্ক ধরে রাখতে চায়, তার সম্পর্কে আমরা এ কথা বলতে বাধ্য যে ইসলাম তার মনের গভীরে প্রবেশ করেনি।" (ঐ পৃঃ ৩১)

www.pathagar.org

ইসলামী জাতীয়তার প্রভাবে পর্যালোচনা করতে গিয়ে মাওলানা বলেন-

"ইসলামের গোটা ইতিহাস পড়ে দেখুন। যেখানেই কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র আপনাদের চোখে পড়বে, তার বুনিয়াদের মধ্যে দেখতে পাবেন বিভিন্ন বংশ ও জাতির খুন। তাদের রাষ্ট্রনায়ক (Statesman), তাদের সেনাধ্যক্ষ, তাদের সাহিত্যিক এবং তাদের অস্ত্রধারী সকলকেই পাবেন বিভিন্ন জাতি থেকে।" (ঐ পৃঃ ৩৩)

"মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তাদের বীরপুরুষ সংগ্রহের ব্যাপারে কোন একটি দেশ অথবা বংশ-গোত্রের উপায়-উপকরণের উপর নির্ভর করেনি। প্রত্যেক স্থান থেকে বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন এবং কর্মঠ লোক তাদের জন্যে একত্র হয়েছে এবং তারা প্রত্যেক দারুল ইসলামকে নিজস্ব দেশ ও বাড়ী মনে করেছে।" (ঐ পৃঃ ৩৩)

"যে জিনিস পাশ্চাত্য জাতিগুলোর জন্যে অমৃত, তাই ইসলামী জাতীয়তার জন্যে হলাহল।" (ঐ পৃঃ ৩৩)

গোটা মানব জাতিকে একস্থানে একত্র করার জন্যে কি করা উচিত এবং কিভাবে করা উচিত-এ ব্যাপারে মাওলানা বলেন-

আপনাদেরকে একত্রে ঐক্যবদ্ধকারী এ কালেমা নয়-যাকে পাহাড়, অথবা নদী-সমুদ্র সীমিত করতে পারে, না ঐ যাকে কোন বংশ ও গোত্র সীমিত করতে পারে। আর না ঐ যাকে কোন বর্ণ সীমিত করতে পারে, না কোন ভাষা, অথবা কোন অর্থনৈতিক স্বার্থ সীমিত করতে পারে। বরঞ্চ এ এমন এক কালেমা, যা সমগ্র দুনিয়াকে পরিবেষ্টন করে আছে। যা সমগ্র মানব জাতিকে আপন আবেষ্টনীর মধ্যে নিতে পারে, যার পরিব্যাপ্ত হওয়াকে দুনিয়ার কোন জড় পদার্থ রুখতে পারে না। যার বন্ধনে কালো, গোরা, হলুদ, সাদা, প্রাচ্য-প্রতীচ্য সকলে একই রকমে আবদ্ধ-এজন্যে সর্বব্যাপী যে, সমগ্র জগতের মানুষকে সে একত্র করার যোগ্যতা রাখে।"

"দুনিয়ার বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন বংশগোত্র এবং বিভিন্ন দেশের জাতিসমূহ যদি মিলিত হয়ে একজাতি হতে পারে, তাহলে শুধু এ অবস্থায় হতে পারে যে, তারা সকলে খোদাওন্দে আলম (বিশ্বজগতের প্রভু) তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ এবং কেয়ামতের দিনের উপর ঈমান আনবে। এছাড়া আর কোন কিছুই তাদেরকে এক ও একাত্ম করতে পারে না।" (ঐ পৃঃ ৩৯)

"এ কালেমা কোন পত্র বা কাগজের টুকরার মত নয় যে, সামান্য বাতাসে তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, যা একস্থানে স্থির থাকতে পারবে না, যা প্রতিটি আবিষ্কার, প্রতিটি নতুন মতবাদ, প্রতিটি চিন্তা ও ধারণার সাথে ডিগবাজি খেতে থাকবে।" (ঐ পৃঃ ৪১)

www.pathagar.org

"ইসলামের এ বৃক্ষ থেকে সর্বদা শান্তি ও নিরাপত্তার ফল উৎপন্ন হয়েছে। কোন আদম সন্তানকে তার ছায়ায় আশ্রয় নিতে এবং তার ফল ভক্ষণ করতে বাধা দেয় না। এ কাউকে জিজ্ঞেস করে না সে কোন বংশের, কোন ভাষায় কথা বলে, কোথাকার অধিবাসী। তার ছায়ার বৈশিষ্ট্য এই যে, যে ব্যক্তিই তার নিচে এসেছে, সে তার বংশ গৌরব ভুলে গেছে। ভাষার পার্থক্য, বর্ণের বৈশিষ্ট্য, দেশের বিভিন্নতা তার দৃষ্টিতে তুচ্ছ ও নগণ্য হয়ে পড়েছে।" (ঐ পৃঃ ৪২-৪৩)

"যে ব্যক্তি এ কালেমার প্রতি বিশ্বাসী হবে, তার খুন হারাম, তার ইজ্জত হারাম, সে তোমার ভাই। তার হত্যাকারী জাহান্নামের চিরন্তন শাস্তি ভোগ করবে এবং তার মানসম্মানে আঘাতকারী পাপাচারী।" (ঐ পৃঃ ৪৪)

এভাবে মাওলানা কংগ্রেসের একজাতীয়তাবাদ মতবাদের খণ্ডন করেন এবং এ ভ্রান্ত মতবাদ নস্যাৎ করে ইসলামী জাতীয়তার ধারণা শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এবং তাদের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানের মনমস্তিষ্কে বদ্ধমূল করার বিরাট খেদমত করেন। কংগ্রেসের সাথে সংশ্লিষ্ট উলামা মদীনায় ইহুদীদের সাথে নবী করীমের (সঃ) সন্ধির সাথে তুলনা করে এক-জাতীয়তাকে জায়েয করার চেষ্টা করেছিলেন। মাওলানা তার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন ঃ

"ওখানে কি কোন সম্মিলিত রাষ্ট্র (Common State) গঠন করা হয়েছিল? ওখানে কি কোন সম্মিলিত গণপরিষদ গঠন করা হয়েছিল? এটা কি স্থিরীকৃত হয়েছিল যে, ইহুদী ও মুসলমান মিলিত হয়ে একটি সংঘ হবে এবং এ সংঘে যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হবে, তারা মদীনার শাসনকার্য চালাবে এবং তাদের অনুমোদিত আইন মদীনায় চালু করা হবে? সেখানে কি কোন সম্মিলিত আদালত কায়েম হয়েছিল, যেখানে ইহুদী ও মুসলমানদের মামলা-মোকদ্দমা একত্রে এবং একই দেশীয় আইনের অধীনে ফয়সালা করা হবে? ওখানে কি কোন আঞ্চলিক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, যেখানে ইহুদী সংখ্যাগরিষ্ঠের নির্বাচিত 'হাইকমান্ড' তার অঙ্গুলি সংকেতে ইহুদী ও মুসলমানদেরকে নৃত্য করাবে?

ওখানে কি রসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে চুক্তি করার পরিবর্তে কা'ব বিন আশরাফ ও আবদুল্লাহ বিন উবাই মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে গণসংযোগ (Mass Contact) করতে এসেছিল? ওখানে কি 'ওয়ার্ধা স্কীম অব এডুকেশান' এর মত কোন শিক্ষা পদ্ধতি তৈরী করা হয়েছিল যাতে করে মুসলমান ও ইহুদীদের সন্তানদেরকে নিয়ে এক সম্মিলিত সমাজ গঠন করা যেতে পারে? ওখানে কি কোন বিদ্যামন্দির স্কীম-এর মত কোন শিক্ষা পদ্ধতি সমগ্র মদীনাবাসীদের জন্য তৈরী করা হয়েছিল আর নবী (সঃ) এ শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে মুসলমান সন্তানদেরকে পাঠাতে রাজী হয়েছিলেন?"

www.pathagar.org

মুসলমান আলেমদের একজাতীয়তা সমর্থনের কি দাঁতভাঙা জবাব! মাওলানা বলেন- "যখন চিকিৎসালয় থেকে হলাহল পরিবেশন হতে থাকে, তখন অমৃত কোথায় তালাশ করা হবে? (ঐ পৃঃ ৫৬)

মাওলানা বড় সত্য কথা বলেন

"আমি ইসলামের অপরিবর্তনীয় মূলনীতির ভিত্তিতে বলতে চাই যে, ঐ ধরনের কোন সামগ্রিক কাঠামো মেনে নেয়া মুসলমানদের জন্য সর্বদাই গোনাহ ছিল। আজও গোনাহ এবং ভবিষ্যতেও গোনাহ থাকবে, যার সংবিধান মানুষকে এ অধিকার-এখতিয়ার দেয় যে, সে এসব বিষয়ে আইন রচনা করবে অথবা এমন সব বিষয়ের মীমাংসা করবে যেসব বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সঃ) দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। আর এ গোনাহ এ অবস্থায় তো আরো অধিক হয়ে যায় যে, এ ধরনের এখতিয়ার সম্পন্ন সামগ্রিক কাঠামোতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অমুসলিমদের হবে এবং সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ের উপর। (ঐ পৃঃ ৫৭)

ধর্মহীন সংবিধান সম্পর্কে মাওলানা বলেন

এ ধরনের সংবিধানের অধীনে জীবন যাপন করা মুসলমানদের জন্য হারাম-গোটা জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত গোনাগার থাকবে-যতোক্ষণ পর্যন্ত না সে এ সংবিধানকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে এবং এতে তাদের গোনাহ কঠিনতর হবে যারা এ সংবিধানে সম্মতি জ্ঞাপন করবে এবং তা চালাতে অংশগ্রহণ করবে। ঐ ব্যক্তির গোনাহ সর্বাধিক হবে, যে খোদার শরিয়ত ও রসূলের সুন্নাতকে ঐ সংবিধান জায়েয করার দলীল হিসেবে পেশ করবে। (ঐ পৃঃ ৫০-৫১)

বৃটিশ পূজারী বলে যারা গালি দেয় তাদের জবাবে মাওলানা বলেন

"বৃটিশ শাসনের অবসান এবং ইসলামের অস্তিত্ব-এ দুটোই আমাদের বাঞ্ছনীয়। এটাকে যদি কেউ বৃটিশ পূজা বলে তো এ গালির আমরা কোন পরোয়া করি না।" (ঐ পৃঃ ৫৮)

মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানীর দেশ পূজার সমালোচনায় মাওলানা বলেন-

"আমার উচিত কথা এসব লোকের খুবই খারাপ লাগবে যারা ব্যক্তিত্বকে সত্যের দ্বারা জানার পরিবর্তে সত্যকে ব্যক্তিত্বের দ্বারা জানতে অভ্যস্ত। আর আমার এ উচিত কথার জবাবে আরও কিছু গালি খাওয়ার জন্যে আমি নিজেকে প্রথমেই তৈরী করে রেখেছি।"

www.pathagar.org

মুসলমানদের অতীত ইতিহাসে শাসকবৃন্দ এবং কতিপয় নাদান আলেমের আঁতাতের উল্লেখ করে মাওলানা বলেন-

"জালেম শাসকগণ এবং ফাসেক রাজনীতিবিদগণ যা কিছু করেছে, আলেমদের একদল তা কুরআন ও হাদীস থেকে বৈধ প্রমাণ করে তাদের জুলুম ও পথভ্রষ্টতার জন্যে ধর্মীয় ঢাল সরবরাহ করেছেন।" (ঐ পৃঃ ৬৪)

ইংরেজ শাসন এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু মুসলমান এ ভ্রান্ত দৃষ্টিকোণের পতাকাবাহী হয়ে পড়ে যে, "যখন যেমন তখন তেমন" হতে হবে অথবা "সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে।"

তার জবাবে মাওলানা বলেন

"দুনিয়া যদি আমাদের এজন্যে কোন মর্যাদা না দেয় যে, আমরা তার পেছনে চলছি না। তাহলে এমন দুনিয়াকে আমাদের লাথি মারা উচিত।" (ঐ পৃঃ ৬৭)

অতঃপর মাওলানা খুব আক্রমণাত্মক ভাষায় বলেন

"আমাদের আকীদাহ-বিশ্বাসে যা হক ছিল তার যুগ যদি অতীত হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের তো এতটা সাহস ও শক্তি থাকা দরকার যাতে করে আমরা যুগের কান ধরে পুনরায় তা হকের দিকে টেনে আনতে পারি। এরূপ ধারণা করা ভীরু ও পরাজিত লোকের কাজ যে, এখন এখানে অমুক জিনিসের যখন প্রচলন হয়েছে, তখন চল তাকে সত্য মনে করে নিই।"

মাওলানা আরও কি চমৎকার বলেন

"আমি মুসলমান শুধু ততক্ষণ পর্যন্ত যতোক্ষণ আমি জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে ইসলামী মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করব। এ দৃষ্টিভঙ্গি যখন পরিহার করব এবং অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হব তাহলে এ আমার অজ্ঞতা হবে- যদি আমি এটাই মনে করতে থাকি যে এ নতুন স্থানেও আমি মুসলমান থাকব। মুসলমান থাকা অবস্থায় অনৈসলামী মতবাদ অবলম্বন করা একেবারেই অর্থহীন। (ঐ পৃঃ ৬৮)

ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের পার্থক্য বুঝাতে গিয়ে মাওলানা বলেন

"ইসলামের চরম লক্ষ্য হচ্ছে একটা বিশ্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তার মধ্যে বংশীয় ও জাতীয় বিদ্বেষ এবং পক্ষপাতিত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করে সকল মানুষকে সমান অধিকার ও সমান উন্নতির সুযোগ দানের সাথে সাথে একটি সাংস্কৃতিক ও

www.pathagar.org

রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশীদার বানানো যায়। তারপর শত্রুতামূলক মুকাবিলার পরিবর্তে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা সৃষ্টি করা যায় যাতে করে লোক একে অপরের বৈষয়িক সাফল্যে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সহায়ক হতে পারে।" (ঐ পৃঃ ৬৭)

"ইউরোপে যে সব ধারণা ও মূলনীতির উপর জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছে তা মানবতার একেবারে পরিপন্থী। তারা মানবতাকে পশুত্ব বরঞ্চ হিংস্রতার স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তারা খোদার যমীনকে ফ্যাসাদ, জুলুম ও হত্যাকাণ্ডে পরিপূর্ণ করেছে এবং মানবীয় সভ্যতার শান্তিপূর্ণ উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে।" (ঐ পৃঃ ৭৭)

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে সময়ের মুসলমানদের শিক্ষিত মহলকে একজাতীয়তার বিপদ থেকে সতর্ক করে দিয়ে ইসলামী জাতীয়তার দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে মাওলানার কত বড় অবদান ছিল।

www.pathagar.org

মুসলিম জাতীয়তা
মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত
(প্রথম খণ্ড)

এ গ্রন্থের ভূমিকায় মাওলানা বলেন,

"খেলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর পনেরো বছর যাবত মুসলমান চিন্তা ও কর্মের বিভ্রান্তিতে মগ্ন ছিল। তা দেখে মন একেবারে ভেঙে যেত। কিন্তু সর্বদা মনের মধ্যে এ ধারণাই চেপে রাখতাম যে, জ্ঞান-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, শক্তি ও প্রভাব রাখেন এমন লোক তো বিদ্যমান আছেন। তাঁরা কোন না কোন সময়ে পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করবেন এবং তা দূর করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন যা মুসলমান হিসেবে তাঁদের গ্রহণ করা উচিত। দিনের পর দিন চলে যেতে থাকল, কিন্তু আশা ফলবতী হলো না। অবশেষে মুসলমানদের ভাগ্যের ফয়সালার শেষ সময় এসে গেল।

এ অবস্থায় পৌঁছার পর বিবেক বলে উঠল এ চুপচাপ বসে থাকার সময় নয়। এখন দ্বীন ও মিল্লাতের সবচেয়ে বড় খেদমত এই যে, মুসলমানদেরকে, জনসাধারণ ও তাদের বিশেষ মহলকে ও আলেম সমাজকে মোটকথা তাদের সকলকে ঐসব বিপদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে মুসলমান জাতি হিসেবে যেসবের সম্মুখীন আমরা হয়েছি। সাথে সাথে তাদেরকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, তোমাদের হেদায়েতের প্রকৃত উৎস খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূলের (সঃ) সীরাত পাক। এ দুটো পরিহার করে শুধু নিজেদের চিন্তা ও চেষ্টা-তদবীরের উপর আস্থা পোষণ করে থাকা ধ্বংসের ইঙ্গিত বহন করবে।

এ সমগ্র আলোচনায় আমার বক্তব্য শুধু তাদেরই কাছে, যারা প্রথমেও মুসলমান, শেষেও মুসলমান এবং মুসলমান ছাড়া আর কিছু নয়।"

মাওলানা স্বাধীনতা শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য এভাবে পেশ করেন,

"আমার এমন স্বাধীনতার প্রয়োজন, যার সাহায্যে আমি পতনোন্মুখ ইসলামী শক্তিকে সামলাতে পারি। জীবনের যাবতীয় সমস্যাবলী মুসলমান হিসেবে সমাধান করতে পারি এবং হিন্দুস্তান 'মুসলিম জাতি'কে একটা স্বাধীন জাতি হিসেবে দেখতে চাই।"

"আমার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, মুসলমানদের সকল দল তাদের দলীয় সংকীর্ণতা থেকে মন পরিষ্কার করে বিশুদ্ধ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আপন জাতি এবং

www.pathagar.org

ভারতের বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তারপর ইসলামী মানসিকতাসহ নিজের জন্যে মুক্তির পথ তালাশ করবে।"

সমগ্র রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনার পর মাওলানা বলেন ঃ

"মুসলমানদের জন্যে দেশের এমন স্বাধীনতার সংগ্রাম একেবারে হারাম যার ফলে ইংরেজ অমুসলিমদের হাত থেকে ভারতীয় অমুসলিমদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে। তাদের জন্যে এটাও হারাম যে তারা এ হস্তান্তর ক্রিয়া চুপচাপ বসে থেকে দেখবে। তাদের জন্যে এটাও হারাম যে, তারা এ হস্তান্তর রুখবার জন্যে ইংরেজ শাসন কায়েম রাখার সহায়ক হবে। ইসলাম এ তিনটি পথই অবলম্বন করতে আমাদেরকে বাধা দেয়।"

"এখন আমরা যদি মুসলমান থাকতে চাই এবং ভারতে মুসলমানদের যে দুর্দশা দেখতে প্রস্তুত না হই যা স্পেন ও সিসিলিতে হয়েছিল, তাহলে আমাদের জন্যে একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে। তাহলো এই যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখ কুফরী সরকারের দিক থেকে সত্যনিষ্ঠ সরকারের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা আমরা করব। এ উদ্দেশ্যে আমাদেরকে এক সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্যে বদ্ধপরিকর হতে হবে। তার পরিণাম সাফল্য হোক অথবা মৃত্যু।"

কর্মপন্থা সম্পর্কে মাওলানা বলেন,

"আমি মনে করি এ জাতিকে বাঁচাতে হলে তার শেষ সুযোগটাই বাকী রয়েছে। আমাদের বিশেষ মহল যতই পথভ্রষ্ট হোক না কেন, আমাদের জনসাধারণের মধ্যে ঈমানের এক দমিত অগ্নিশিখা বিদ্যমান আছে এবং এটাই আমার শেষ আশার কিরণ। এটা নির্বাপিত হওয়ার পূর্বে তার থেকে আমরা অনেক কাজ নিতে পারি। শর্ত এই যে, কিছু এমন মর্দে মুমিন দাঁড়িয়ে যেতে হবে যারা খালেস নিয়তের সাথে খোদার পথে জিহাদ করার জন্যে তৈরী হবে।"

কংগ্রেস জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে মুসলিম গণসংযোগ আন্দোলন (Muslim Mass Contact Movement) শুরু করে। জওহরলাল নেহরু বলেন যে, নিজের মতবাদ প্রচার এবং বিপরীত ধারণা পোষণকারীকে তার ধারণা পরিবর্তনে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে চেষ্টা করার অধিকার প্রত্যেক দলের আছে।

মাওলানা তার জবাবে বলেন,

"আমরা বলি যে, আপনার যদি এ অধিকার থাকে, তাহলে আমাদেরও পাল্টা প্রচারের অধিকার অবশ্যই থাকবে। দেশপূজা ও সমাজতন্ত্রের প্রচার আমাদের মতে শুদ্ধি আন্দোলনের প্রচার থেকে পৃথক কিছু নয়। এ সংঘাতের জন্যে যদি তৈরী থাকেন এবং ভারতের ভবিষ্যতের জন্যে এটাকে মঙ্গলকর মনে করেন, তাহলে এটা হবে আপনার চরম নির্বুদ্ধিতা।"

www.pathagar.org

কুরআন ও সীরাত পাকের আলোকে মাওলানা বলেন,

"এ জাতির জন্যে যদি কোন কিছু উপযোগী হয়, তাহলে তা হবে এমন এক গণতান্ত্রিক আন্দোলন, যা শুরু করতে হবে সমগ্র জাতিকে একটি ইঞ্জিন মনে করে। আন্দোলনের প্রসার ও সংহতির মধ্যে সেই অনুপাতের প্রতিই লক্ষ্য রাখতে হবে, যা নবী (সঃ) রেখেছিলেন। আপনারা যদি কাঁচা ও দুর্বল মসলা দিয়ে বালুর উপর কোন দালান নির্মাণ করে তাকে দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করতে চান, তাহলে তা দুর্ঘটনার সয়লাবের সামান্য আঘাতও সহ্য করতে পারবে না।"

এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেন,

"এ মেশিনকে সে নৈতিক শক্তিই চালাতে পারে, যা সীরাতে মুহাম্মদীর (সঃ) উৎস থেকে সংগৃহীত। বাতিল কর্তৃক ভীত, শংকিত হওয়ার এবং প্রত্যেক বর্ধমান শক্তির সামনে মাথা নত করার দুর্বলতা যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে এবং যাদের এতটা দৃঢ়তা নেই যে, ভয়ানক ঝড়-ঝঞ্ঝায় অটল-অবিচল থাকতে পারে, তাদের দ্বারা এ মেশিনে কোন গতি সৃষ্টি করা যেতে পারে না।"

অভাব কিসের?

"অভাব শুধু এমন এক নেতার এবং কতিপয় কর্মীর-যারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে নিজেদের জীবন ও প্রবৃত্তির লালসাকে উৎসর্গ করতে পারে, যাদের অন্তর থাকবে নাম ও সুখ্যাতি লাভের লালসা, ব্যক্তিগত গুরুত্ব ও শ্রদ্ধা অর্জনের পিপাসা, ধন-দৌলতের লোভ এবং মুনাফেকী ও হিংসার আগুন থেকে বহু উর্ধে; যাদের মধ্যে থাকবে সত্যকে সমুন্নত করার এমন সংকল্প যে, তারা কোন অবস্থাতেই বিচলিত হবে না এবং যাদের মধ্যে এমন যোগ্যতা পাওয়া যাবে না যে, তারা নবী (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) পথে শৃঙ্খলার সাথে কাজ করতে পারে।"

মাওলানার উপরোক্ত ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলো ১৯৩৮ সালের তর্জুমানুল কুরআনে প্রকাশিত হয় এবং সমগ্র ভারতে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। প্রবন্ধের শেষের দিকে মাওলানা বলেন,

"খোদার আইনে পক্ষপাতিত্ব কোথাও নেই। এ আইনের বিপরীত যে চলবে তা সে একজন মুমিন হোক না কেন, নিষ্পেষিত হবে এবং যে ব্যক্তি এ আইনের শর্তগুলো পূরণ করবে, সে কাফের ও মুশরিক হোক না কেন বিজয়ী হবে।

"যে খোদা এমন পক্ষপাতহীন আইন দ্বারা এ সৃষ্টিজগতের উপর শাসন পরিচালনা করছেন, তাঁর কাছে যদি আপনি এ আশা করেন যে, আপনার মধ্যে মুমিনের গুণাবলী না থাকলেও তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন এবং মুশরিকের মুকাবিলায় আপনাকে অবিচলতা দান করবেন, যে মুশরিক খোদার প্রাকৃতিক আইনের শর্তগুলো আপনার চেয়ে বেশী ভালোভাবে পূরণ করছে, তাহলে আমি আপনার খেদমতে শুধু এতটুকু আরয করতে চাই যে, সুস্থ বুদ্ধি-বিবেক এবং কুরআনের জ্ঞান-এ দুটো থেকে আপনি বঞ্চিত রয়েছেন।

www.pathagar.org

মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত (দ্বিতীয় খণ্ড)

হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক সংঘাত ক্রমশ বেড়ে চলে। কংগ্রেস ও একজাতীয়তার সমর্থকগণ মুসলমানদেরকে তাদের মধ্যে টেনে নেয়ার এক চেষ্টাতো মুসলিম গণসংযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে শুরু করেছিল। অপরদিকে ওয়ার্ধা শিক্ষা পদ্ধতি (Wardha Scheme of Education) এবং তার বাস্তব ভয়াবহ রূপ বিদ্যামন্দির স্কীমের মাধ্যমে মুসলমানদের উপরে হিন্দু সভ্যতার প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল। ভারতীয় ভাষার নামে হিন্দী ভাষার প্রচারণার প্রতি দৃষ্টি এভাবে দেয়া শুরু হয় যাতে উর্দু ভাষা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কারণ গান্ধীর ভাষায় উর্দু আরবী অক্ষরে লেখা হয়। এ জন্যে এ শুধু মুসলমানের ভাষা।

কংগ্রেসের হিন্দুসুলভ ও একনায়কত্বসুলভ আচরণের প্রতিবাদে মাওলানা প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনার সাথে সাথে জওহরলাল নেহরুর আচরণ, তাঁর বক্তৃতা ও লেখার পলিসি প্রভৃতি সব কিছুর সমালোচনা করেন। কারণ, যে ভৌগোলিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সম্ভাবনা নিশ্চিত হতে যাচ্ছিল তা জওহরলালের চিন্তা–ধারণা ও কাজের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছিল। মুসলমানদের জন্যে এর চেয়ে অধিক মারাত্মক বিষয় সে সময়ে আর কিছু ছিল না। এ সময়ে মাওলানা যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে দেয়া হলো ঃ

"ইংরেজ শাসন যখন ভারতের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, তখন তার সাথে আমাদের মধ্যে এক ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়। আমাদেরকে শুধুমাত্র সম্মান ও রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়া হয়নি, বরঞ্চ অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, আমাদের চারধারে চিন্তাধারা, মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি, শাসনব্যবস্থা, রাজনীতি মোটকথা প্রতিটি বস্তু আমাদের সামাজিক রুচি ও আমাদের জাতীয় মেযাজ-প্রকৃতির একেবারে পরিপন্থী হতে থাকে।"

প্রথমে আমরা চেষ্টা করলাম পাথরের মতো অটল হয়ে পরিবর্তন ও বিপ্লবের সে স্রোতধারার মুকাবিলায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করার ..... এক শতাব্দী পর্যন্ত খুব নিষ্পেষিত এবং বৈষয়িক ও নৈতিক দিক দিয়ে ধ্বংস হওয়ার পর আমাদের জ্ঞানীগণ আমাদেরকে আর এক পলিসি শিক্ষা দেন এবং তা ছিল এই যে-

ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে ইংরেজ সরকারের পুরো কলকব্জা হয়ে যাই।

প্রথম পলিসি-একশ' বছরের অভিজ্ঞতার পর ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পলিসি সত্তর বছরের অভিজ্ঞতায় শুধু ভুলই নয়, ভুলও মারাত্মক প্রমাণিত হয়েছে।

এখন আমাদের জন্যে তৃতীয় পলিসি রয়ে যাচ্ছে এবং তা এই যে-

"এসো এখন বীরের মতো লড়াই করে ঐ কাঠামো ভেঙে দাও এবং বাধ্য কর যে কাঠামো এখন তোমার মনমতো হোক.... হতে পারে যে, এতে তোমার সাফল্য

www.pathagar.org

হবে না, খুব সম্ভব তুমি স্বয়ং এ লড়াইয়ে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু ছাগলের একশ বছরের জীবন থেকে সিংহের জীবনের একটা দিন অধিক মূল্যবান।

মাওলানা জোর দিয়ে বলেন-

"এটা হচ্ছে বিপ্লবী মানসিকতা, যা এখন আমি মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে সৃষ্টি করতে চাই। .... এ ব্যাপারে মানুষকে কঠিন পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। বাইরের লোকের আগে প্রথমে ঘরের লোকের সাথে লড়াই করতে হয়, যেমন- তেমন লড়াই নয়, একেবারে চতুর্মুখী লড়াই।

"তারপর পুরাতন চিন্তাধারার এক জগত আসে। বিপ্লবের আহ্বানকারীকে তা ভেঙে চুরমার করতে হয়। আর নতুন চিন্তাধারার এক জগত থাকে, যা তাকে বানাতে হয়।"

বিপ্লবাত্মক সমালোচনার ব্যাপারে মুশকিল এই যে, পুরাতন পলিসির ভুলভ্রান্তি ও তার ক্ষতি প্রমাণ করার জন্যে সে সব পলিসি মেনে যারা চলে এবং যারা তা চালায়, তাদের সমালোচনা করা ব্যতীত উপায় থাকে না। আর এ এমন এক কাজ যা মনের উপর পাথর চেপে করতে হয়।"

"মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত" ১ম খণ্ডের দিকে ইঙ্গিত করে মাওলানা বলেন,

পূর্ববর্তী খণ্ডে যেসব প্রবন্ধ পেশ করা হয়েছিল, তা লিখতে গিয়ে আমি বিশেষ করে এ বিষয়ে লক্ষ্য রেখেছিলাম যে, এখন শুধু মানুষকে জাগিয়ে দেয়া এবং তাদের মনমস্তিষ্ককে বিপ্লবের জন্যে তৈরী করা প্রয়োজন। এর অধিক তাদের সহ্য হবে না।

দ্বিতীয় খণ্ড সম্পর্কে মাওলানা বলেন,

"এখন এ খণ্ডে আমি এক ধাপ আগে বাড়ছি। এখন আমি আরও বিস্তারিতভাবে ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও তার ভিত্তিগুলোর পর্যালোচনা করছি এবং এক এক স্থানে অঙ্গুলি রেখে বলছি এখানে মুসলমানদের জন্যে ধ্বংস রয়েছে এবং এখানে তাদের জন্যে ক্ষতি এবং এসব কিছু তাদের জাতীয় মেযাজ-প্রকৃতিরও পরিপন্থী।

মাওলানা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন-

"যারা মুসলমান এবং মুসলমান থাকতে চান, তাঁরা জাতিপূজা ও জাতীয়তাবাদের নাম পরিহার করুন এবং ঐ আন্দোলন থেকে পৃথক হয়ে যান, যা ইসলামী জাতীয়তাকে আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক জাতীয়তায় রূপান্তরিত করতে চায়।

www.pathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব

আগেই বলা হয়েছে চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টিকারী মাওলানার তর্জুমানুল কুরআন তার দফতরসহ পাঠানকোটের দারুল ইসলামে স্থানান্তরিত হয়েছে। এ বছরেই মাওলানা তর্জুমানুল কুরআনের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায় পর পর তিনটি বিকল্প শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব সরকার ও জাতির সামনে উপস্থাপিত করেন।

যেসব কারণে মাওলানা উক্ত প্রস্তাব তিনটি পেশ করেন তা হলো এই যে, একদিকে পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের প্রচারণা এবং অপরদিকে ভারতের একজাতীয়তার ভিত্তিতে যে শাসনক্ষমতা হস্তগত করার সংগ্রাম চলছিল, তা মুসলিম জাতির পতনেরই সংকেতধ্বনি করছিল।

মাওলানা তাঁর বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা উভয় জাতীয়তাবাদ খতম করে ইসলামী জাতীয়তা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন।

মাওলানা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট ও সঠিক প্রমাণিত করে তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত প্রায় সকল নেতৃত্বের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী, মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী [১], মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উক্তি উদ্ধৃত করে তাঁদের যুক্তি খণ্ডন করেন এবং একজাতীয়তার দিকে মুসলমানদের আহ্বান জানানোর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেন। তাঁর এ সমালোচনার ফলে যেসব মুসলমান এ সব আলেমের উপর ভরসা করে কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হয় পড়েছিলেন, তারা এ ভ্রান্ত পথ পরিহার করে মুসলিম জাতির স্বার্থে চিন্তাভাবনা শুরু করেন।

কংগ্রেস নেতাদের সমালোচনা করা থেকেও তিনি বিরত থাকেন নি। স্বয়ং জওহরলাল নেহরুর বক্তৃতা-বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়ে সে সবের কঠোর সমালোচনা করেন।

পণ্ডিত নেহরুর বই "আমার কাহিনী" থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন যে, পণ্ডিতজি যে ধরনের ধর্মহীন গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র দেখতে চান তার জন্যে কি আপাতমধুর কথা বলে মুসলমানদেরকে তিনি প্রতারিত করতে চান। মাওলানা তাঁর সমালোচনায় বলেন,

কথাগুলো কত সুন্দর, কত নির্দোষ ও কত অক্ষতিকর। কিন্তু কত হলাহলপূর্ণ। এর আগে স্বয়ং পণ্ডিতজির ভাষায় যেসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করেছি তা সামনে

(১) মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী একজন জাতীয়তাবাদী আলেম ছিলেন। পরে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করে দারুল ইসলামে হিজরত করেন।

www.pathagar.org

রেখে যদি আপনারা এ নতুন পলিসির দিকে লক্ষ্য করেন, তাহলে স্পষ্টই দেখতে পাবেন যে, এ প্রকৃতপক্ষে একটি 'শুদ্ধি' আন্দোলন ভিন্ন রূপে ও আকারে। এ ধর্মীয় শুদ্ধি নয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শুদ্ধি। এর পরিণাম ফলও তাই যা ধর্মীয় শুদ্ধির ছিল। .....

.....এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা অত্যন্ত সুচতুর ব্যক্তি। তিনি বলেন, "তোমরা জাতিহীনও এবং তোমাদের কোন সভ্যতা নেই। অতএব কোন কিছু পরিত্যাগ করার প্রশ্নই তো আসে না। আসলে তোমরা ভারতীয় জাতিরই লোক..... এসো, আপন জাতির মধ্যে মিশে যাও এবং সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা কায়েমে অংশগ্রহণ কর, প্রচুর পেটের অন্ন জুটবে। এটাওতো এক চুমুক হলাহল। কিন্তু দেখুন, কত বুদ্ধিমান লোক তা মাতৃস্তন্য মনে করে পান করছে।"

প্রকাশ থাকে যে, তৎকালে মুসলমান যুব সমাজ, বিশেষ করে আলীগড়ের ছাত্রমহল পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। মাওলানার এসব সমালোচনার পর তাদের অধিকাংশের মোহ ভেঙে যায়। সাইয়েদ নকী আলী এম, এ, ডিপ-ইন-এড-এর মতো লোক যিনি পূর্ণ ইসলামী পারিবারিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে শৈশবকাল থেকেই ইসলামী চিন্তা-চরিত্রের ধারক-বাহক ছিলেন এবং যিনি দারুল ইসলামের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন, নিম্নের উক্তি করেন ঃ

"আমি আমার এ অপরাধ স্বীকার করি যে, ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত জওহরলাল নেহরু আমার প্রিয় নেতা ছিলেন।

এমন কি তাঁর ছবিও আমার কামরার শোভা বর্ধন করতো।"

একজাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীদের সমালোচনা

যেসব মুসলমান একজাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন মাওলানা তাঁদেরও সমালোচনা করেন। তাঁদের অনেকেই কংগ্রেসের বিভিন্ন পদ অলংকৃত করে ছিলেন। বিহার মন্ত্রিসভার একমাত্র মুসলমান সদস্য ডাঃ সাইয়েদ মাহমুদ, কংগ্রেসের ইসলামিয়াত বিভাগের সেক্রেটারী মুহাম্মদ আশরাফ, আর একজন এ বিভাগের বিশেষ সদস্য মানযার রিজভী এবং পাঞ্জাব প্রভিনশিয়াল মুসলিম মাসকনটাকট কমিটির সেক্রেটারী মুনশী আহমদ দ্বীন প্রমুখের বক্তৃতা-বিবৃতির উদ্ধৃতিসহ সে সবের কঠোর সমালোচনা করেন মাওলানা মওদূদী।

একবার মিঃ মানযার রিজভী বিজনৌর থেকে প্রকাশিত নভেম্বর ৩৭ সংখ্যার 'মদীনাতে" "মিঃ জিন্নাহর ফাঁকা বুলি" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখেন। মাওলানা মওদূদী তার কঠোর সমালোচনা করে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, রিজভী সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গিই ভ্রান্ত এবং মিঃ জিন্নাহরই সঠিক।

www.pathagar.org

মাওলানার এ সমালোচনা মুসলিম লীগমহল ও মিল্লাতে ইসলামিয়া কর্তৃক খুব সমাদৃত হয়। তার জন্যে জওহরলাল নেহরু ও তাঁর সহকর্মীদের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা বিরোধী এবং 'সাম্রাজ্যবাদী' বলে মাওলানাকে আখ্যায়িত করা হয়।

তার জবাবে মাওলানা বলেন, আমরা আমাদের নিজেদের কবর খনন করার ব্যাপারে তাঁদের হস্ত শক্তিশালী করতে অস্বীকার করছি। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার দুশমন এবং সাম্রাজ্যবাদী তাঁরা নিজেরাই, তাঁরা নিজেরাই স্বাধীনতা অর্জন করার এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এমন পন্থা অবলম্বন করেছেন যা ভারতের এক-চতুর্থাংশ অধিবাসী কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

অতঃপর মাওলানা মিঃ গান্ধী, কেন্দ্রীয় আইন সভার কংগ্রেস পার্টির নেতা ভুলা ভাই দেশাই, ইউপি-এর শিক্ষামন্ত্রী মিঃ সম্পূরানন্দ প্রমুখের উক্তিসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন যে, তাঁরা ভারতে একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক ধর্মহীন রাষ্ট্র (National Democratic Secular State) গঠন করতে চান। তিনি এ সবের সমালোচনা করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, এ মুসলমানদের জন্যে কোন ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনবে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন-

"মুসলমান কিছুতেই এ ধরনের রাষ্ট্র মেনে নিতে পারে না। .... মুসলমানদেরকে এতটা নির্বোধ কি করে মনে করা হলো যে, তারা এ ধরনের রাষ্ট্র নিজেদের মস্তকের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে সংগ্রাম করবে? .... একটি জাতি কি স্বয়ং তার কবর খনন করার জন্যে জীবন বিলিয়ে দেবে?

পাশ্চাত্য জাতীয়তা, ইসলামী জাতীয়তা ও একজাতীয়তা

মাওলানা মওদূদী পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের সমালোচনাও জরুরী মনে করেন। কারণ, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ইউরোপীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাকে মুসলমানদের সমস্যার সমাধান বলে মন্তব্য করেন। যেহেতু মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিলেন, সে জন্যে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার মিশ্রণে যে পদ্ধতি গঠিত হবে তার অনিষ্টকারিতাও সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল।

অতঃপর উর্দু ভাষার বিরোধিতা ও হিন্দী ভাষার সপক্ষে প্রচার-প্রচারণা, ওয়ার্ধা স্কীম অব এডুকেশন এবং বিদ্যামন্দির স্কীম সম্পর্কে কংগ্রেসের তথাকথিত স্বাধীনতাপ্রিয়গণ যা কিছু করছিলেন তার এক একটির সমালোচনাও মাওলানা করেন।

সর্বশেষে তিনি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের একটি বিবৃতির কঠোর সমালোচনা করেন, যা 'যমযম' পত্রিকার আটত্রিশের নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মাওলানা বড় দুঃখ করে বলেন-

www.pathagar.org

'আমাদের আসল পজিশন এখন এই যে, যদি তাঁরা (সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু) আমাদের উপর জুলুম করে তাহলে, আমাদের কোন কোন প্রতিনিধি সরদার প্যাটেলের খেদমতে অথবা অন্য কোন সরদারের কাছে আবেদন-নিবেদন করবে। তারপর জুলুমের প্রতিকার তখনই সম্ভব যখন নেহায়েত মেহেরবানী করে তাঁরা অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন প্রতিকার করতে চাইবেন।

প্রকৃতপক্ষে এ পজিশন কিছুতেই গোলামী পজিশন থেকে ভিন্নতর নয়, যা এযাবত ইংরেজ শাসনের আমলে আমাদের রয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে প্রশ্ন হলো, তাহলে মুসলমান এখন কি করবে?

এ প্রশ্নের জবাবে মাওলানা তিনটি বিকল্প শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব পেশ করেন, তাহলো ঃ

প্রথম প্রস্তাব

দুই অথবা তার অধিক জাতির দেশে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সঠিক ও সুবিচারপূর্ণ পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের (International Federation) মূলনীতির ভিত্তিতে। অন্য কথায় এটা একটিমাত্র কোন জাতির রাষ্ট্র হবে না, বরঞ্চ চুক্তিবদ্ধ জাতিসমূহের একটা রাষ্ট্র (A State of Federated Nations)।

দুই ঃ এ ফেডারেশনে শরীক প্রত্যেক জাতি সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের (Cultural Autonomy) অধিকারী হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতি তার জীবনের বিশেষ পরিমণ্ডলে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও সংস্কার-সংশোধনের জন্যে সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

তিন ঃ সকলের জন্যে সমান এমন আঞ্চলিক বিষয়সমূহের জন্যে যে কর্মপদ্ধতি তৈরী করা হবে তা হবে সমঅংশীদারিত্বের (Equal Partnership) ভিত্তিতে।

সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের মূলনীতি হবে নিম্নরূপ ঃ

১। যেসব জাতি নিয়ে ফেডারেল রাষ্ট্র হবে তার প্রত্যেকটি সার্বভৌম (Sovereign) হবে, অর্থাৎ সে তার কাজের পরিসীমার মধ্যে আপন এখতিয়ার খাটাতে পারবে।

২। শিক্ষা, ধর্মীয় বিষয়াদি (যথা মসজিদ, উপাসনালয়, আওকাফের নিয়ম-শৃঙ্খলা, ধর্মীয় নির্দেশাবলী আপন জাতির লোকের উপর কার্যকর করা এবং নির্দেশ লঙ্ঘন করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা) বিশেষ সাংস্কৃতিক,

www.pathagar.org

সামাজিক বিষয়াদি (যথা বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার) এবং জাতীয় সামাজিক ব্যবস্থা, (National Social System) প্রত্যেক জাতির পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকবে এবং কেন্দ্রের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না।

৩। এসব উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জাতির পৃথক পৃথক জেলা ও প্রদেশ ভিত্তিক কাউন্সিল থাকবে। এ সবের উপর থাকবে একটি সুপ্রীম কাউন্সিল। উপরোক্ত বিষয়গুলি এসব কাউন্সিলে পেশ করা হবে এবং এসব স্থান থেকেই সে সবের জন্যে আইন-বিধি অনুমোদন করা হবে। এসব আইনের মর্যাদা দেশীয় আইন থেকে কম মর্যাদাশীল হবে না। এসব কার্যকর করার জন্যে একটি প্রশাসনিক কাঠামো (Executive structure) থাকবে এবং জাতীয় কাউন্সিলের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলার ব্যয়ভার বহনের জন্যে কর আরোপ করার ও তা আদায় করার পূর্ণ এখতিয়ার এ জাতীয় ব্যবস্থায় থাকবে। দেশের রাজস্ব তহবিল থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশে প্রত্যেক জাতির জন্যে বরাদ্দ করা হবে- যেমন ফেডারেল রাষ্ট্রসমূহ এবং ফেডারাল কেন্দ্রের মধ্যে অর্থ বন্টন হয়ে থাকে।

৪। চুক্তিবদ্ধ জাতিসমূহের (Federated Nations) মধ্যে অথবা ফেডারেশনের কোন অংশ ও কেন্দ্রের মধ্যে কোন আইন সম্পর্কিত বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা ফেডারেল কোর্ট (Federal Court) করবে।

৫। নিজেদের বিশেষ আইন অনুযায়ী বিরোধ মীমাংসার জন্যে প্রত্যেক জাতির স্থায়ী বিচার ব্যবস্থা থাকবে আর দেশের কোর্টগুলোর তার পরিপূর্ণ বিচারের এখতিয়ার থাকবে।

তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশ্ন আসে। এ সম্মিলিত শাসন ব্যবস্থা অপরিহার্যরূপে 'সমঅংশীদারিত্বের' নীতির ভিত্তিতে হবে। কারণ এ হচ্ছে সার্বভৌম জাতিসমূহের ফেডারেশন। কোন একটি জাতির একক শাসন ব্যবস্থা নয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

যদি আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের এ কাঠামো গ্রহণ করা না হয়, তাহলে দ্বিতীয় এ হতে পারে যে, বিভিন্ন জাতির জন্যে পৃথক পৃথক ভূমিখণ্ডের সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে, যেখানে তারা তাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বানাতে পারে। অধিবাসী বিনিময়ের জন্যে পঁচিশ বছর অথবা কমবেশী দশ বছরের মুদ্দত নির্ধারিত করতে হবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে অধিক পরিমাণ আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে, ফেডারেল কেন্দ্রের অধিকার কম করা হবে। এ অবস্থায় আমরা মুসলিম

www.pathagar.org

রাষ্ট্রগুলোর সাথে মিলে একটা ফেডারাল রাষ্ট্র বানাতে শুধু রাজীই হবো না, বরঞ্চ একে প্রাধান্য দেব।

ডাঃ আব্দুল লতিফ পূর্ব বাংলা, হায়দরাবাদ, জুনাগড়, টুং আজমীর, দিল্লী, অযোধ্য উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে যে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের চিত্র পেশ করেছিলেন মাওলানা তা সমর্থন করে বলেনঃ

"এভাবে এটা সম্ভব যে, পঁচিশ বছরের মধ্যে মুসলমানগণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে হিজরত করে এসব অঞ্চলে এসে একত্র হবে এবং হিন্দুগণ নিকটস্থ অঞ্চলগুলোতে চলে যাবে।

তৃতীয় প্রস্তাব

এ প্রস্তাবও যদি গৃহীত না হয়, তাহলে সর্বশেষ দাবী আমাদের এই হবে যে, আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রগুলো পৃথক পৃথকভাবে গঠন করা হোক। তাদের একটা পৃথক ফেডারেশন হবে। এমনি হিন্দু ও রাষ্ট্রগুলোর একটা পৃথক ফেডারেশন হবে। তারপর এ দুই অথবা ততোধিক ফেডারাল রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এক ধরনের (Confedaration) হতে পারে, যেখানে বিশেষ বিশেষ স্বার্থে যেমন প্রতিরক্ষা, পরিবহন ও বাণিজ্যিক সম্পর্কিত বিষয়ে নির্দিষ্ট শর্তে সহযোগিতা হতে পারে।

অতঃপর মাওলানা বলেন ঃ

এ তিনটি প্রস্তাব অথবা প্রস্তাবের খসড়া যা আমরা পেশ করলাম তার যেকোন একটি গ্রহণ করলে তার উপর আমরা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় আসতে পারি। কোন চতুর্থ অথবা পঞ্চম প্রস্তাব কেউ পেশ করলে তার উপরও চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে।

কিন্তু আমাদের হিন্দু প্রতিবেশীগণ এবং তাঁদের ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকদের ভালো করে বুঝে নেয়া উচিত যে, বর্তমান শাসনতন্ত্র এবং এমন প্রতিটি শাসন ব্যবস্থা যা একজাতীয়তার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে, তা কোন অবস্থাতেই আমাদের জন্যে গ্রহণযোগ্য হবে না।

তারপর মাওলানা বলেন,

এখন শুধু জান-মালের কুরবানীর দ্বারাই ঘটনাবলীর গতি পরিবর্তন করা যেতে পারে। যতক্ষণ না আমরা একথা প্রকাশ করব যে, এ শাসনতন্ত্র আমাদের জীবন্ত মস্তকের উপর নয়, বরঞ্চ কবরের উপরই কার্যকর করা হবে এবং যতক্ষণ না আমরা আমাদের কাজের দ্বারা একথা বলে দেব যে, মুসলমান তাদের জাতীয় জীবনের জন্যে জীবন দেয়ার শক্তিও রাখে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ শাসনতন্ত্রের একটি

www.pathagar.org

অক্ষরও পরিবর্তন করা হবে না। আর না তাঁরা জাতীয় গণতান্ত্রিক ধর্মহীন রাষ্ট্র আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া থেকে বিরত থাকবেন, যার জন্যে ইংরেজ, হিন্দু, আমাদের ভেতরের মুনাফিকগণ এবং অন্যান্য বহু বোধশক্তিহীন লোক একত্রে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভারতীয় মুসলিম রাজনীতির ময়দানে মাওলানার এক নজীরবিহীন অবদান এই যে, তিনি হিন্দুদের একজাতীয়তার জোরদার আন্দোলনের মুকাবিলায় স্বতন্ত্র ইসলামী জাতীয়তাকে যুক্তিসহ প্রমাণিত করেন এবং এ দ্বিজাতিত্বের ভিত্তিতেই মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ তার লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে। মাওলানা উপরোক্ত শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাবগুলোর সর্বশেষ প্রস্তাবের অনুসরণেই যে পনেরো মাস পর পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।*

মুসলিম লীগের প্রস্তাবের ভিত্তিতে যে পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয়, মাওলানা তার সাথে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করতে পারেননি। এ ব্যাপারে মতানৈক্য এ জন্যে ছিল যে, আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছিল মুসলিম জাতীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে- ইসলামী জাতীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়।

দ্বিতীয়ত- মুসলিম লীগের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তাধারার ও আকীদাহ-বিশ্বাসের লোক ছিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত অন্যান্যের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রের কোন চিহ্ন মাত্র ছিল না। তা ছাড়া ভারত বিভক্তি, দ্বিজাতিত্ব ও পাকিস্তান মতবাদের প্রশ্নে মাওলানার দ্বিমত তো ছিলই না বরঞ্চ এসব ধারণা তিনিই সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন। মাওলানা বার বার মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে বলেন যে, যে ধরনের রাষ্ট্রের কথা তাঁরা বলছেন তার জন্যে সে আদর্শের ভিত্তিতে একটি চরিত্রবান কর্মীবাহিনী গঠন করা উচিত। কিন্তু তাঁর এ কথার প্রতি তাঁরা মোটেই কর্ণপাত করেন না।

---

* মুসলিম লীগ ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করলেও মাওলানার উপস্থাপিত তৃতীয় বিকল্প প্রস্তাবটি আরও বিবেচনা করা উচিত ছিল। আমার মতে বাংলা-আসাম, অথবা বাংলা এবং আসামকে পৃথক পৃথকভাবে ধরে তার সাথে কাশ্মীর এবং বর্তমান পাকিস্তানকে নিয়ে তিনটি অথবা চারটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারত এবং তাদেরকে নিয়ে একটা ফেডারেশন হত। সেখানে প্রতিটি রাষ্ট্র স্বাধীন ও সার্বভৌম হত এবং স্বাধীনভাবে নিজেদেরকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে পারত। পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে ফেডারেশনে আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত করা হত।

মূল পাকিস্তান প্রস্তাবেও যে পরিকল্পনা ছিল তা বাস্তবায়িত না করে ১৯৪৫ সালে মুসলিম লীগ একটি কনভেনশনের মাধ্যমে পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলকে একত্র করার সিদ্ধান্ত করে। মাওলানার প্রস্তাবের অনুসরণে কাশ্মীরসহ কয়েকটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা হলে প্রতিটিই শক্তিশালী হতে পারত বলে আমার ধারণা - গ্রন্থকার।

www.pathagar.org

যা হোক, পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হবার পর পাকিস্তান তথা ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজে নানান প্রশ্নের উদয় হতে থাকে।

ঐ বছরেই (১৯৪০) ১১ই সেপ্টেম্বর আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রাচী হলে আনজুমানে ইসলামী তারিখ ও তামাদ্দুনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসমাবেশে মাওলানা মওদূদী এক দীর্ঘ ভাষণ দান করেন। আলোচ্য বিষয় ছিল "ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে কায়েম হয়"। তাঁর এ বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন ভাষায় তার তরজমা হয়। "ইসলামী বিপ্লবের পথ" বইখানি তারই বাংলা তরজমা। পাঠক সমাজকে বইখানি পড়ার আবেদন জানাই।

মাওলানা তাঁর বক্তৃতায় ইসলামী রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ চিত্র, তা কায়েম করার বিজ্ঞান-সুলভ পদ্ধতি, ধারা ও বৈশিষ্ট্য এবং ভুল পন্থার ভয়াবহ পরিণাম বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু এসবের প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করে পাকিস্তান আন্দোলন তার নিজস্ব ধারায় চলতে থাকে। মাওলানা তাঁর খোদাপ্রদত্ত দূরদর্শিতার ফলে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, গণআন্দোলনের ফলে একটা নবরাষ্ট্রের জন্মলাভ হয়ত নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র না হয়ে তা এমন ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে যে, তার ভয়াবহ পরিণাম ফল হতে বাঁচতে হলে পূর্বাহ্নে তার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

www.pathagar.org

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা এমন এক সময়ে হয়, যখন সমগ্র ভারতে পাকিস্তান আন্দোলনের দেড় বছর অতীত হয়ে গেছে। পাকিস্তান আন্দোলন প্রকাশ্যত ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার করেছিল। ঠিক এমন সময়ে আর একটি দল গঠনের কি প্রয়োজন ছিল- এ প্রশ্নে অনেকের মনেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল। এ দলের প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে অতীতের ঘটনাবলী ও তার তিক্ত অভিজ্ঞতার কিছুটা পুনরাবৃত্তি একান্ত প্রয়োজন মনে করি। এ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী স্বয়ং বলেন-

প্রকৃতপক্ষে এ কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না যে, কোন এক ব্যক্তির মনে হঠাৎ এক খেয়াল চাপলো যে, সে একটা দল বানাবে এবং কিছু লোক একত্র করে সে একটা দল বানিয়ে ফেলল। বরঞ্চ এ ছিল আমার ক্রমাগত বাইশ বছরের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, গভীর অধ্যয়ন ও চিন্তা-গবেষণার ফসল যা একটা পরিকল্পনার রূপ ধারণা করে এবং সে পরিকল্পনার ভিত্তিতেই জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয়।

("জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বৎসর যাপন" অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ)

মাওলানার পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানতে পারা যায় যে, সে সময় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের মধ্যে এতট বৈষম্য-বৈপরীত্য বিরাজ করছিল যে, তার থেকে স্বভাবতই মানুষের মনে বহু প্রশ্নের উদয় হত। কিন্তু খেলাফত আন্দোলন চলা পর্যন্ত এসব প্রশ্ন মনের মধ্যেই চাপা ছিল। একদিকে মুসলমানদের মধ্যে এ অদম্য প্রেরণা ছিল যে, তুরস্কের খেলাফত এবং পবিত্র স্থানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে জীবন বিলিয়ে দিতে হবে। অপরদিকে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সারা দেশে প্রতিহিংসার দাবানল প্রজ্বলিত করে, যার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়ে পড়ে। তারপর গান্ধীর নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলিম এক্য প্রতিষ্ঠা এবং অসহযোগ আন্দোলন, অতঃপর তুর্কী জাতীয়তাবাদ ও তার প্রত্যুত্তরে আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান, তারপর খেলাফতের বিলোপ সাধন ও ভারতে খেলাফত আন্দোলনের পতন, শুদ্ধি আন্দোলন, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যা, মুসলমানদের প্রতি পাশ্চাত্য সভ্যতা, ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার আগ্রাসী হামলা, ধর্মহীন ভৌগোলিক রাষ্ট্র গঠনের জন্যে একজাতীয়তাবাদের কলরব ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ভেঙে যাওয়ার পর দেশব্যাপী হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সাহিত্যের মধ্যে নাস্তিকতা, অশ্লীলতা ও কমিউনিজমের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, জওহরলাল নেহরুর সমাজতন্ত্রের পুরোধার পদে সমাসীন হওয়া প্রভৃতি সবকিছুই ১৯২৪ সালের পর থেকে পরবর্তী পনের

www.pathagar.org

বছর পর্যন্ত এমন সব ঘটনা-যার প্রত্যেকটির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা এবং সেসবের উপর গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করে তিনি নিম্ন সিদ্ধান্তের পৌছেন ঃ

"মুসলমানদের বাঁচার উপায় থাকলে শুধু এর মধ্যেই আছে যে, তাদেরকে আবার নতুন করে জাতির মুবাল্লিগের ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধুমাত্র এ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমেই তারা সেসব জটিলতা থেকে মুক্ত হতে পারে যার মধ্যে তারা এখন নিমজ্জিত আছে।..... এ কথা তাদের মনে বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে, ইসলামের নিজস্ব একটা জীবন বিধান আছে। তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা আছে, নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে, তার নিজস্ব চিন্তাধারা আছে, নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা আছে- যা সবদিক দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো থেকে অনেক ভালো ও উচ্চমানের। সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপারে কারো কাছে হাত পাততে হবে-এ ধারণা তাদের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে।"

'জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বৎসর যাপন' অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণ।

জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন- জামায়াতে ইসলামী তাঁর দীর্ঘ বাইশ বছরের চিন্তা-গবেষণার ফসল। তাঁর মনের গভীরে বহু সূক্ষ্ম প্রশ্ন জমাট বাঁধে- যার উত্তর তালাশ করতে গিয়ে তাঁকে একটি জামায়াত গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। তিনি বলেন-

"আমাদের ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ ঘটনা এই যে, আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এসে একটি অমুসলিম জাতি আমাদের ঘাড়ের উপরে মজবুত হয়ে চেপে বসে। ..... এ ঘটনা আমাদের জন্যে কয়েক দিক দিয়ে প্রণিধানযোগ্য।

"প্রথম প্রশ্ন যার জবাব আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে তা হলো এই যে, এ ঘটনা ঘটলই বা কেন? এটা কি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ছিল যা বিনা কারণে আমাদের উপরে এসে পড়েছে? এ কি প্রকৃতির কোন অন্যায়-অত্যাচার-যা বিনা অপরাধে আমাদের উপরে করা হয়েছে আমরা কি ঠিক সঠিক পথেই চলছিলাম, কোন দুর্বলতা, কোন দোষ-ত্রুটি আমাদের ছিল না? অথবা প্রকৃতপক্ষে বহুদিন যাবৎ আমরা আমাদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা ও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পোষণ করে আসছিলাম-যার শাস্তি একটা বৈদেশিক শক্তির গোলামী হিসেবে আমাদের উপর নেমে এলো?"

"দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এই যে বিপদটা বাইর থেকে এসে আমাদের ঘাড়ে চাপলো, একি শুধু একটি গোলামীর অভিশাপ ছিল, না তা সাথে করে এনেছিল নিজস্ব

www.pathagar.org

চরিত্র, চিন্তাধারা, ধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির অন্যান্য বহু অভিশাপ?"

"তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, এসব বিপদ-অভিশাপের মুকাবিলায় আমাদের ভূমিকা কি ছিল?" - (মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত)।

কোন ব্যাপারে এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে করে তার সূক্ষ্ম তলদেশ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করার লোক কমই দেখতে পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে সাইয়েদ মওদূদীই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তিত্ব। দৃশ্যত এ প্রশ্নগুলো জামায়াত গঠনের বহু পরে ১৯৫১ সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত জামায়াতের এক বার্ষিক সম্মেলনে সামনে তুলে ধরা হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ছিল মাওলানার প্রাথমিক চিন্তা-গবেষণারই একটা অংশ। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর বিপ্লব সৃষ্টিকারী গ্রন্থ "তানকীহাতে"। - (ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব)।

এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না যে, পাশ্চাত্যের নাস্তিকতাপূর্ণ সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রবল বন্যার গতিরোধ করার জন্যেই এ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁর অমর অবদানের একটা বিরাট অংশ এই যে, তিনি পাশ্চাত্যের ভীতিবিহ্বল ও বিবস-অচেতন জাতির মধ্য থেকেই একটা সক্রিয় শক্তি দাঁড় করিয়ে দেন যা পাশ্চাত্য সভ্যতার মুকাবিলায় ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির পতাকা হাতে দাঁড়াবে। বলতে গেলে এ একটা প্লাবন প্রতিহত করার জন্যে বিপরীতমুখী আর একটি প্লাবন সৃষ্টি করা যা মাওলানা করেছিলেন।

নীতিগতভাবে সাইয়েদ মওদূদী (রঃ) মানব জীবনের কল্যাণ ও সংস্কার সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, তা তাঁর নিজের ভাষায় ঃ

"দুনিয়ায় ফিতনা-ফাসাদের মূল উৎস হলো মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব (খোদায়ী)। এর থেকেই অনাচার-অকল্যাণের সূচনা হয় এবং এর থেকেই আজ হলাহলের বিষাক্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে। ..... কোথাও একটি জাতি আর একটি জাতির খোদা হয়ে বসেছে, কোথাও এক শ্রেণী আর এক শ্রেণীর খোদা, কোথাও একটি দল প্রভুত্ব-কর্তৃত্বের আসন অধিকার করে আছে, কোথাও জাতীয় রাষ্ট্র, খোদার আসনে বিরাজমান, কোথাও কোন ডিক্টেটর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন খোদা আছে বলে আমার জানা নেই-

(مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرِىْ . القصص : ٣٨)

এটাই হলো সেই অশুভ শক্তি, যা মানুষের সকল বিপদ-মুসিবত, সকল বিপর্যয় ও ধ্বংস এবং সকল বঞ্চনার মূল কারণ। তার উন্নতি-অগ্রগতির পথে এটাই বড় বাধা। ..... এর প্রতিকার এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে, মানুষ সকল

www.pathagar.org

খোদায়ীর দাবীদার শক্তিগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র আল্লাহকে নিজের 'ইলাহ' এবং একমাত্র রাব্বুল আলামীনকে নিজের 'রব' বলে মেনে নেবে..... এটাই সেই বুনিয়াদী সংস্কার-সংশোধনের কাজ যা আল্লাহর মহান নবীগণ মানুষের জীবনে করেছেন।"

- (ইসলামী রাষ্ট্র-ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ)

স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৩৭ সালে ভারতের ছ'টি প্রদেশে কংগ্রেসের হিন্দু মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর তাঁরা ভারতে 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছিলেন। তাঁদের এ স্বপ্ন সফল হতে পারে যদি একজাতীয়তার ভিত্তিতে বৃটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস মুসলমানদের গণসংযোগ আন্দোলন (Muslim Mass Contact Movement) শুরু করে। সে সম্পর্কে মাওলানা বলেন-

"মুসলিম গণসংযোগ অভিযান শুরু হয়- যার কর্মীবাহিনী ছিল মুসলমান কমিউনিস্ট। পরিতাপের বিষয় এই যে, আলেমদের একটি দলও তাদের সাথে সহযোগিতা করে। তাঁরা বলতেন, হিন্দু-মুসলমান মিলে এক জাতি হতে পারে এবং এ জাতির মধ্যে এমন এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন হতে পারে- যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। এ মতবাদ খণ্ডন করে আমি ঐসব প্রবন্ধ লিখি- যা "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ"- তৃতীয় খণ্ড, এবং 'মাসালায়ে কওমিয়ত' নামে প্রকাশিত হয়। .... আমি আমার সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত করি যাতে করে মুসলমানদেরকে হিন্দু জাতীয়তার মধ্যে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা যায়।"

- (উনত্রিশ বৎসর যাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ)।

তারপরের ঘটনা মাওলানার ভাষায় ঃ

"তারপর ১৯৩৯ সাল এবং তারপরের কথা। মুসলিম লীগের আন্দোলন জোরদার হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রস্তুতি হতে থাকে। অবশেষে ১৯৪০ সালে আন্দোলন পাকিস্তান প্রস্তাবের রূপলাভ করে। ... সে সময়ে আমার মনের মধ্যে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হলো এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এ অনুভূতির সঞ্চার করা হোক যে, তারা নিছক একটা জাতি নয়, বরঞ্চ একটা মুবাল্লিগ জাতি, একটা মিশনারী জাতি। তাদের এমন এক রাষ্ট্র কায়েম করা উচিত যা হবে একটা মিশনারী রাষ্ট্র। ... এ উদ্দেশ্যে আমি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখা শুরু করি- যা মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ তৃতীয় খণ্ড নামে প্রকাশিত হয়।"

www.pathagar.org

তারপর মাওলানা বলেন-

যখন আমি দেখলাম যে, আমার সবকিছু অরণ্যে রোদন হয়ে পড়েছে, তখন দ্বিতীয় পদক্ষেপ-যা আমি সমীচীন মনে করলাম তা এই যে, নিজের পক্ষ থেকে একটি জামায়াত গঠন করা উচিত- যা চরিত্রবান লোক নিয়ে গঠিত হবে এবং ঐসব ফিতনার মোকাবিলা করবে- যার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সে সময় যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমার মনে ছিল তা ছিল এই যে, অবস্থা যেদিকে চলছে তাতে একটা সংকট এটা হতে পারে যে, পাকিস্তান সংগ্রামে মুসলিম লীগ বিফল মনোরথ হবে এবং ইংরেজ ভারতে এক ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করে তা হিন্দুদের হাতে তুলে দিয়ে চলে যাবে। তখন কি করতে হবে? দ্বিতীয় অবস্থা এ হতে পারে যে, মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য সফল হবে এবং দেশ বিভক্ত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় কয়েক কোটি মুসলমান যে ভারতে রয়ে যাবে, তাদের কি দশা হবে এবং স্বয়ং পাকিস্তানে ইসলামের দশাটাই বা কি হবে? ... এ ছিল এমন এক পরিস্থিতি যখন আমি এ দৃঢ় সিদ্ধান্ত করলাম যে, 'জামায়াতে ইসলামী' নামে একটি জামায়াত গঠন করা হোক।"

- (উনত্রিশ বৎসর পালন অনুষ্ঠানে ভাষণ)।

যেসব পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জামায়াতে ইসলামী গঠন অপরিহার্য হয়েছিল, তা আশা করি পাঠকবর্গ যথার্থই উপলব্ধি করবেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বছরগুলো এ জামায়াতের অপরিহার্যতা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে একচল্লিশের তর্জুমানুল কুরআনে মাওলানা "এক সালেহ জামায়াত কি জরুরত" শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধে তিনি বলেন, দুনিয়াকে ভবিষ্যতের অন্ধকার যুগ থেকে রক্ষা করে তাকে ইসলামের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করার জন্যে এতোটুকুই যথেষ্ট নয় যে, এখানে ইসলামের সঠিক ধারণা ও মতবাদ বিদ্যমান আছে, বরঞ্চ সঠিক মতবাদের সাথে একটি সত্যনিষ্ঠ দলেরও প্রয়োজন। এ দলের সদস্যদেরকে ঈমানের দিক দিয়ে সুদৃঢ় ও অবিচল হতে হবে এবং আমলের দিক দিয়ে হবে প্রশংসনীয় ও উচ্চমানের। কারণ তাদেরকে সভ্যতা-সংস্কৃতির ভ্রান্ত ব্যবস্থা ও রীতিনীতির বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে এবং এ পথে আর্থিক কোরবানী থেকে শুরু করে কারাদণ্ড, এমনকি ফাঁসির ঝুঁকি নিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, মুসলিম লীগের সাথে চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির দিক দিয়ে মাওলানার মতানৈক্যের কারণে চৌধুরী নিয়ায আলীর সাথেও মতানৈক্য হয়। তার ফলে দারুল ইসলাম ট্রাস্টের দফতর ১৯৩৯ সালের ২৬শে জানুয়ারী পাঠানকোট থেকে পুঞ্চ রোড, মুবারক পার্ক লাহোরে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত হয়। সাথে সাথে

www.pathagar.org

তর্জুমানুল কুরআনের কার্যালয়ও স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে চৌধুরী নিয়ায আলীর পীড়াপীড়িতে ১৯৪২ সালের ১৫ই জুন দারুল ইসলাম ট্রাস্ট ও তর্জুমানুল কুরআনের দফতরসমূহ পুনরায় পাঠানকোট স্থানান্তর করা হয়।

একচল্লিশের মার্চ মাসে তর্জুমানুল কুরআনে মাওলানা 'জামায়াতে ইসলামীর গঠন' শীর্ষক এক প্রবন্ধ লেখার ফলে সমমনা লোক প্রবন্ধের ব্যাখ্যা দাবী করে মাওলানাকে পত্র লিখতে থাকেন। তার জবাবে এপ্রিল মাসের তর্জুমানুল কুরআনে বলা হয় যে, যাঁরা উক্ত প্রবন্ধে বর্ণিত পদ্ধতিতে কাজ করতে চান, তাঁরা আপন আপন জায়গায় কাজ শুরু করতে পারেন এবং সংগে সংগে যেন তাদের নাম ও ঠিকানা তর্জুমান অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হয় যাতে করে একটা সম্মেলনের রূপ দেয়ার পথ বেরোয়। এভাবে দেড়শ' লোকের একটা তালিকা তৈরী হয় এবং এ তালিকা অনুযায়ী ২৫শে আগস্ট পুঞ্চ রোড, মুবারক পার্কে অবস্থিত তর্জুমানুল কুরআন কার্যালয়ে তাঁদেরকে উপস্থিত হওয়ার জন্যে দাওয়াতনামা পাঠানো হয়। তদনুযায়ী সারা ভারত থেকে পঁচাত্তরজন মর্দে মুমিন লাহোর উপস্থিত হন। তাঁদের মধ্যে এমনও অনেক ছিলেন- যাঁরা নিজ নিজ স্থানে জামায়াতে ইসলামীর শাখা কায়েম করেছিলেন এবং কুরআন-হাদীস আলোচনার উদ্দেশ্যে সাপ্তাহিক বৈঠকও চালু করেছিলেন। এসব স্থান থেকে তাঁদের প্রতিনিধি লাহোর সম্মেলনে শরীক হন। বলতে গেলে মানসিক দিক দিয়ে জামায়াতে ইসলামী আগে থেকেই কায়েম ছিল এবং কোন সুস্পষ্ট কেন্দ্রীয় সংগঠন ব্যতিরেকেই তার শাখাগুলো স্থানে স্থানে কর্মতৎপর ছিল।

সম্মেলনের কাজ ২৬শে আগস্ট সকাল আটটায় শুরু হয়। মাওলানা মওদূদী সমবেত মেহমানদের সামনে যে উদ্বোধনী ভাষণ দেন, তার সারাংশ নিম্নে দেয়া হলো-

"এক সময় ছিল যখন আমি স্বয়ং গতানুগতিক ও বংশানুক্রমিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলাম ও তার উপর আমল করতাম। যখন জ্ঞান হলো, তখন মনে হলো- নিছক এ ধরনের

مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا

(যে কাজ বাপ-দাদাকে করতে দেখেছি) - অনুসরণ অর্থহীন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কেতাব ও রাসূলের সুন্নাতের প্রতি মনোনিবেশ করলাম। ইসলাম নতুন করে বুঝলাম এবং ঈমান আনলাম। তারপর ক্রমশ ইসলামের সামগ্রিক ও বিস্তারিত ব্যবস্থা জানার ও বুঝার চেষ্টা করলাম। তারপর যখন আল্লাহ তায়ালা আমার মনকে এদিক থেকে একেবারে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত করে দিলেন, তখন যে সত্যের উপর আমি স্বয়ং ঈমান আনলাম তার দাওয়াত অন্যের কাছে দেয়াও শুরু করলাম এবং এ উদ্দেশ্যে তর্জুমানুল কুরআন চালু করি।

www.pathagar.org

প্রথম কটি বছর মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করতে এবং দ্বীনের একটা সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করতেই কেটে গেল। তারপর দ্বীনকে একটা আন্দোলনের আকারে চালু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ ছিল 'দারুল ইসলাম' সংস্থার প্রতিষ্ঠা। এটা হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। তখন চারজন মাত্র আমার সহকর্মী ছিলেন। এ ছোট সূচনাটি তখন অত্যন্ত নগণ্য মনে করা হয়েছিল। কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ, আমরা হতাশ হয়ে পড়িনি। ইসলামী আন্দোলনের দিকে দাওয়াত দেয়ার এবং মনমস্তিষ্ক জাগ্রত করার কাজ ক্রমাগত করতে থাকি। দেশের বিভিন্ন অংশে সমমনা লোকের ছোট ছোট চক্র গড়তে থাকে। অতঃপর আন্দোলনের প্রভাব পর্যালোচনা করার পর মনে হলো যে, এখন জামায়াতে ইসলামী গঠন করার এবং ইসলামী আন্দোলন সংগঠিতভাবে শুরু করার জন্যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণের এ হচ্ছে উপযোগী সময়। তারই ভিত্তিতে এ সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে।"

জামায়াতে ইসলামীর কাজ

মাওলানা তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ইসলামী আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনের পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন ঃ

"মুসলমানদের মধ্যে সাধারণত যেসব আন্দোলন অতীতে চলেছে, সেসব থেকে ইসলামী আন্দোলনের মৌলিক পার্থক্য কি, তাই সর্বপ্রথমে আমাদের ভালো করে জেনে রাখা দরকার।

"প্রথমত, হয়তো ইসলামের কোন অংশবিশেষকে অথবা পার্থিব কোন উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে এসব আন্দোলন পরিচালিত হয়। কিন্তু আমাদের এ আন্দোলন চলবে পরিপূর্ণ ইসলামকে নিয়ে।

"দ্বিতীয়ত, এদের দলীয় সংগঠন অন্যান্য দলগুলোর পদ্ধতিতে করা হয়েছে। কিন্তু আমরা সেই দলীয় সংগঠন ব্যবস্থা অবলম্বন করছি, যা প্রথমে রসূলুল্লাহর (সঃ) প্রতিষ্ঠিত দলের ছিল।

"তৃতীয়ত, এসব দলে যখন কোন লোক ভর্তি করা হয়, তখন এ ধারণার বশবর্তী হয়ে করা হয় যে, সে অবশ্য প্রকৃত মুসলমানই হবে। এর ফল এই হয়েছে যে, দলের সভ্য ও কর্মী থেকে আরম্ভ করে নেতা পর্যন্ত এমন অনেক লোক এসব দলে অনুপ্রবেশ করেছে যে, চরিত্রের দিক দিয়ে তারা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় এবং কোন দায়িত্ব পালনের যোগ্যও নয়। কিন্তু আমরা আমাদের দল কাউকে এ ধারণায় গ্রহণ করি না বা করব না যে, সে 'প্রকৃত মুসলমানই' হবে। বরঞ্চ সে

www.pathagar.org

যখন কালেমায়ে তাইয়েবার অর্থ, মর্ম ও তাঁর দাবী জেনে-বুঝে তার উপর ঈমান আনার অঙ্গীকার করে তখনই তাকে দলে গ্রহণ করি। যোগদান করে দলের সদস্য হয়ে থাকার জন্যে শর্ত হচ্ছে এই যে, ঈমান যেসব সর্বনিম্ন দাবী করে তা তাকে পূরণ করতে হবে। এভাবে ইনশাআল্লাহ মুসলমান জাতির মধ্য থেকে শুধুমাত্র সৎ ব্যক্তিই ছাঁচাই হয়ে এ দলে যোগদান করবে।

"দুনিয়াতে জামায়াতে ইসলামীর জন্যে করার যে কাজ রয়েছে সে সম্পর্কে কোন সীমিত ধারণা মনের মধ্যে পোষণ করবেন না। .... তার কাজের পরিধির মধ্যে রয়েছে পূর্ণ প্রসারতাসহ গোটা মানবজীবন। ইসলাম সকল মানুষের জন্যে এবং যেসব বস্তুর সাথে মানুষের সম্পর্ক ইসলামের সাথেও সেসবের সম্পর্ক রয়েছে। অতএব ইসলামী আন্দোলন এক সর্বব্যাপী আন্দোলনের নাম।

"যারা জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করবে, তাদের প্রত্যেকের এ কথা ভালো করে বুঝে নেয়া দরকার যে, জামায়াতে ইসলামীর সামনে যে কাজ রয়েছে তা যেমন-তেমন কাজ নয়। দুনিয়ার গোটা ব্যবস্থা তাকে বদলিয়ে দিতে হবে। দুনিয়ার নীতি-নৈতিকতা, রাজনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি-প্রতিটি বস্তু পরিবর্তন করে দিতে হবে। খোদাদ্রোহিতার উপরে যে ব্যবস্থা দুনিয়ায় কায়েম রয়েছে, তা বদলিয়ে তা খোদার আনুগত্যের উপরে কায়েম করতে হবে। এ কাজে সকল শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম প্রতিটি পদক্ষেপের পূর্বে প্রত্যেককে ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, সে কোন কণ্টকময় পথে পা বাড়াচ্ছে।" ..... সর্বশেষে মাওলানা বলেন-

"আমি শুধুমাত্র একজন আহ্বায়ক ছিলাম। ভুলে যাওয়া সবক স্মরণ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিলাম এবং আমার সকল চেষ্টাচরিত্রের লক্ষ্য এই ছিল যে, একটা জামায়াতের ব্যবস্থাপনা হয়ে যাক। জামায়াত গঠিত হওয়ার পর আমি আপনাদেরই মতো একজন। ইসলামী জামায়াতের অধীনে আমি একজন। একটা অনৈসলামী জামায়াতের সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা থেকে অনেক বেশী গৌরবের মনে করি এ জামায়াতের খেদমত করা।"

জামায়াতের গঠনতন্ত্র অনুমোদন

উদ্বোধনী ভাষণের পর মাওলানা মওদূদী জামায়াতের গঠনতন্ত্রের খসড়া পাঠ করা শুরু করেন। গঠনতন্ত্রের ছাপানো কপি সকলকে পূর্বাহ্নেই পরিবেশন করা হয়। সম্মেলনে তার এক একটি শব্দ পড়া হয় এবং তার উপর আলোচনার সুযোগ দেয়া হয়। বিস্তারিত আলোচনার পর সন্ধ্যা নাগাদ কিছু সংশোধনীসহ গঠনতন্ত্র সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

www.pathagar.org

গঠনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পর মাওলানা মওদূদী সর্বপ্রথম দাঁড়িয়ে কালেমা শাহাদাত

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

পাঠ করে বলেন, "ভাইসব, আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি নতুন করে ঈমান আনছি এবং জামায়াতে ইসলামীতে শরীক হচ্ছি।"

তারপর সমবেত লোকদের মধ্যে সকলেই এক এক করে কালেমা পাঠ করে নতুন করে ঈমানের ঘোষণা করতে থাকেন। অধিকাংশ লোকের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল, অনেকে তো কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ছিলেন। কালেমা উচ্চারণ করার সময় দায়িত্বের অনুভূতিতে সকলের মধ্যে কম্পন দেখা যাচ্ছিল। সকলের কালেমা শাহাদাত পাঠের পর মাওলানা মওদূদী ঘোষণা করেন, এখন জামায়াত গঠিত হয়ে গেল। আসুন, আমরা সকলে রাব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়া করি তিনি যেন জামায়াতকে দৃঢ় ও অবিচল রাখেন এবং আমাদেরকে তাঁর কেতাব ও রসূলের সুন্নাত অনুযায়ী চলার তাওফীক দান করেন।

জামায়াতের নামকরণ করা হলো- "জামায়াতে ইসলামী হিন্দ"।

পরদিন অর্থাৎ তেস্‌রা শাবান-ইং ২৭শে আগস্ট, সকাল আটটায় পুনরায় সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। জামায়াত গঠিত হয়েছে কিন্তু তার সম্পর্কে সদস্যদের সামনে মাওলানা মওদূদী তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে বলেন-

"আমীর নির্বাচনের ব্যাপারে আপনাদেরকে একটা বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যে ব্যক্তি আমীর পদপ্রার্থী হবেন, তাঁকে কিছুতেই নির্বাচিত করা যাবে না। .... ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার সমর্থন ও প্রতিরক্ষার সকল প্রকার আবেগ-অনুভূতি মন থেকে মুছে ফেলে নিরপেক্ষ মন নিয়ে দেখুন যে, আপনার জামায়াতে কে এমন ব্যক্তি আছেন-যাঁর তাকওয়া, কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান, দ্বীনী দূরদর্শিতা, চিন্তাভাবনা ও কলাকৌশল এবং আল্লাহর পথে দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রভৃতির উপরে আপনি সবচেয়ে বেশী আস্থা স্থাপন করতে পারেন।"

এ কথা বলার পর আমীর নির্বাচন নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। আলোচনায় তিন প্রকারের অভিমত ব্যক্ত করা হয় ঃ

এক-কোন আমীর নির্বাচন না করে কয়েক ব্যক্তিকে নিয়ে একটা কমিটি করা হোক, যা ব্যবস্থাপনা ও পথ-নির্দেশনার কাজ করবে।

দুই-আপাতত কাউকে নির্দিষ্টকালের জন্যে অস্থায়ী আমীর নির্বাচিত করা হোক।

তিন-আমীর নির্বাচন এখনই করতে হবে অনির্দিষ্টকালের জন্যে।

www.pathagar.org

কোন একটি অভিমত সম্পর্কে একমত হতে না পেরে নিম্নের সাত ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কমিটি করা হলো ঃ

মাওলানা মন্যুর নোমানী, সাইয়েদ সিবগাতুল্লাহ, সাইয়েদ মুহাম্মদ জাফর ফুলওয়ারী, নাযীরুল হক মিরাঠী, মিস্ত্রী মুহাম্মদ সিদ্দীক, ডাঃ সাইয়েদ নাযীর আলী এবং মুহাম্মদ ইবনে আলী উলুভী।

কমিটি বিশদ আলাপ-আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে রুকনদের সামনে নিম্ন সুপারিশ পেশ করেন ঃ

বিনা আমীরে জামায়াত হতে পারে না। অতএব মিয়াদ নির্দিষ্ট না করেই আমীর নির্বাচন করা হোক।

এ সুপারিশের ভিত্তিতে মাওলানা মওদূদী সর্বসম্মতিক্রমে আমীর নির্বাচিত হন।

আমীর নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর প্রথম ভাষণে তিনি বলেন,

আমি আপনাদের মধ্যে অধিকতর ইলম ও তাকওয়ার অধিকারী নই। কিন্তু যখন এ বোঝা আমার উপর চাপানো হয়েছে, তখন আমি আল্লাহর তায়ালার কাছে দোয়া করব যেন তিনি আমাকে দায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেন। জামায়াতের শৃঙ্খলা ও তার আমানতের আমি হেফাজত করব। আশা করছি যে, যতোদিন আমি সঠিক পথে থাকবো আপনারা আমার সহযোগিতা করবেন এবং যদি আমি ভুল করি, তাহলে আমাকে সংশোধন করে দেবেন। সর্বদা আমি যোগ্যতর লোকের তালাশ করব। এমন লোক পেলে আমিই প্রথমে তাকে সামনে এগিয়ে দেব। আমার জীবন ও মৃত্যু এ উদ্দেশ্যেই এবং আমাকে এ পথেই চলতে হবে। আর কেউ চলুক বা না চলুক আমাকে এ পথেই চলতে হবে।

অবশ্য আমি এ জন্যে মোটেই প্রস্তুত নই যে, এ কাজ চালাবার জন্যে যদি অন্য কেউ এগিয়ে না আসে, তাহলে আমিও এগিয়ে আসব না। এ আন্দোলন তো আমার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এ কাজের দায়িত্ব আর কেউ না নিলে আমাকেই নিতে হবে। কেউ আমার সহযাত্রী না হলে আমি একাই এ পথে চলবো। গোটা দুনিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমার বিরোধিতা করলে আমি একাকী তার মুকাবিলা করতে দ্বিধাবোধ করব না।"

বক্তৃতার শেষে মাওলানা বলেন-

"ফিকাহ ও কালাম শাস্ত্র সম্পর্কে আমি যা কিছু লিখেছি এবং ভবিষ্যতে লিখব- তা আমীরে জামায়াতের সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে না। বরঞ্চ তা হবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আমি চাই না যে, এসব বিষয়ে আমার নিজের অভিমতকে অন্যান্যের উপর চাপিয়ে দেয়া হোক। আর না জামায়াতের পক্ষ থেকে এমন

www.pathagar.org

কোন বাধানিষেধ আমার উপর আরোপ করা হোক যে, কোন বিষয়ের উপর বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা এবং তা প্রকাশের আমার স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হবে।

"জামায়াতের রুকনদেরকে আমি খোদাকে সাক্ষী রেখে এ কথা বলছি যে, কেউ যেন ফেকাহ ও কালাম সম্পর্কিত আমার কোন উক্তি অন্যের কাছে চূড়ান্ত দলীল-প্রমাণ হিসেবে পেশ না করেন। যিনি কুরআন-সুন্নাহর ইলমের অধিকারী, তিনি তাঁর নিজের চিন্তা-গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের ভিত্তিতে আমল করবেন এবং যার এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই, তিনি যাঁর প্রতি আস্থা রাখেন তাঁর চিন্তা-গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের উপর আমল করবেন। এসব ব্যাপারে আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করার এবং স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার পূর্ণ অধিকার সকলের থাকবে।"

এ বক্তৃতার পর মাওলানা জামায়াতে ইসলামীর প্রথম মজলিসে শূরার নির্বাচন সম্পন্ন করেন। নিম্নের ব্যক্তিগণ শূরা সদস্য নির্বাচিত হন ঃ

০১। মাওলানা মনযুর নোমানী, বেরেলী।

০২। মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, সরাইমীর।

০৩। মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, লাক্ষ্ণৌ।

০৪। মাওলানা জাফর ফুলওয়ারী।

০৫। জনাব নাযীরুল হক- মিরাঠী।

০৬। মাওলানা মুহাম্মদ আলী কান্দালভী- শিয়ালকোট।

০৭। মাওলানা আবদুল আযীয শার্কী- জলন্ধর।

০৮। জনাব নসরুল্লাহ খান আযীয-লাহোর।

০৯। চৌধুরী মুহাম্মদ আকবর- শিয়ালকোট।

১০। ডাঃ সাইয়েদ নাযীর আলী- এলাহাবাদ।

১১। মিস্ত্রী মুহাম্মদ সিদ্দীক।

১২। মাওলানা আবদুল জাব্বার গাজী।

১৩। মাওলানা আতাউল্লাহ বোখারী-বাকেরগঞ্জ।

১৪। জনাব কামরুদ্দীন খান-লাহোর।

১৫। মুহাম্মদ বিন আলী উলুভী।

১৬। মুহাম্মদ ইউসুফ-ভূপাল।

ঐদিন অর্থাৎ ৪ঠা শাবান-ইং ২৮শে আগস্ট, মজলিসে শূরার নির্বাচনের পর নিম্নলিখিত বিভাগগুলো খোলা হয় ঃ

www.pathagar.org

শিক্ষা বিভাগ, কেন্দ্রীয় তরবিয়ত বিভাগ, প্রচার বিভাগ, সাংগঠনিক বিভাগ, বায়তুলমাল, দাওয়াত ও তাবলীগ বিভাগ।

৫ই শাবান মুতাবেক ২৯শে আগস্ট সম্মেলনের শেষ দিনে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

- জামায়াতের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্যে ও দাওয়াত প্রসারের জন্যে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতে হবে।
- জামায়াতের রুকন সম্মেলন প্রতিবছর হবে।
- জামায়াতের যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের একটি প্রতিনিধিদল বছরে অন্তত একবার দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আঞ্জুমান, দ্বীনী মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত জামায়াতের দাওয়াত পৌঁছাবার চেষ্টা করবে।
- একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে।

জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত

আল্লাহর প্রিয় নবীগণ তাঁদের জাতির সামনে এবং শেষ নবী সমগ্র মানব জাতির সামনে যে দাওয়াত পেশ করেছেন তার অনুসরণেই জামায়াতে ইসলামী সমগ্র মানব জাতিকে আহ্বান জানায়, তা নিম্নরূপ ঃ

মানবসমাজের নিকটে সাধারণভাবে এবং মুসলমানদের নিকটে বিশেষভাবে

- জীবনের সকল ক্ষেত্রে খোদার দাসত্ব-আনুগত্য ও শেষ নবীর নেতৃত্ব স্বীকার কর।
- বর্ণচোরা মনোভাব ও মুনাফেকী ত্যাগ কর এবং খোদার সাথে কাউকে শরীক কর না।
- খোদাবিমুখ, অসৎ ও চরিত্রহীন লোককে সমাজের সকল নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব থেকে সরিয়ে দাও এবং ঈমানদার, চরিত্রবান ও যোগ্য লোকদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত কর যেন জীবন ঠিক খোদার পথে চালিত হয়।

এ দাওয়াত সত্য বলে বিশ্বাস করলে আমাদের সাথে শামিল হন। খোদার নিকট এর পুরস্কার অবশ্যই পাবেন। যে ব্যক্তি এ কাজে বাধা দেবে, সে যেন খোদার নিকট জবাবদিহির জন্যে প্রস্তুত থাকে।

মোটকথা, আল্লাহর নবীগণ যে মিশন নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিলেন এবং যার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটেছিল শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফার (সঃ) দ্বারা, জামায়াতে

www.pathagar.org

ইসলামীও সে মিশন নিয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ মানবজীবনের প্রতিটি বিভাগে-শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্পকলা, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে, রাষ্ট্র পরিচালনায় ও যুদ্ধ-সন্ধিতে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অফিস-আদালতে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একমাত্র খোদারই আনুগত্য করতে হবে-এই হচ্ছে জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য। একেই বলা হয়েছে "ইকামতে দ্বীন" বা আল্লাহর দ্বীন ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা।

আমীরে জামায়াতের সাংগঠনিক ও দাওয়াতী সফর

অক্টোবর মাসে মাওলানা মওদূদী, আমীর জামায়াতে ইসলামী হিন্দ তাঁর প্রথম সংগঠন ও দাওয়াতী সফরে বের হন। উদ্দেশ্য ছিল জামায়াতের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণ, বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দান এবং জামায়াতের প্রচার ও প্রসারের জন্যে অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ। এ উদ্দেশ্যে তিনি দিল্লী, আলীগড়, এলাহাবাদ সরাইমীর, লাক্ষ্ণৌ ও বেরেলী সফর করেন। বহু লোকের সাথে তিনি মতবিনিময় করেন, বিভিন্ন সন্দেহাদি দূর করেন।

জামায়াতী জীবনের এক বছর অতীত হতে না হতেই বিরোধিতা শুরু হয়। চিন্তা করলে অবাক হতে হয় যে, যে মহলের পক্ষ থেকে সর্বাগ্রে এবং সবচেয়ে বেশী সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতার আশা ছিল, সে মহলটি ছিল উলামায়ে কেরামের, যাঁরা ইকামতে দ্বীনের সবচেয়ে বেশী দায়িত্বশীল। জামায়াতে ইসলামী দ্বীনের যে সার্বিক দাওয়াত নিয়ে ময়দানে নেমেছে, তার বিরোধিতা যদি নাস্তিক, কমিউনিস্ট, ধর্মহীন পাশ্চাত্য সভ্যতার পূজারীগণ করে, তাহলে তার কারণ তো সহজেই বুঝতে পারা যায়, কিন্তু তারা কেউ বিরোধিতা করলো না, বিরোধিতায় নামলো আলেম সমাজের একটা অংশ।

আমীরে জামায়াত তাদের সকল অভিযোগের জবাবে বলেন, দাওয়াত, লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচীতে কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে ভুল থাকলে তা যেন ধরিয়ে দেয়া হয়, সংশোধন করা হবে। আর যদি আমীরে জামায়াতের প্রতি কোন ব্যক্তিগত অসন্তোষ-আপত্তি থাকে, তাহলে তা জামায়াতের পাল্লায় না ফেলে তাঁর ব্যক্তির মধ্যেই সীমিত রাখা উচিত।

সিদ্ধান্ত ছিল যে, বিয়াল্লিশ সালের মার্চ মাসে রুকন সম্মেলন হবে। কিন্তু যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির জন্যে তা সম্ভব ছিল না বলে ফেব্রুয়ারী মাসে মজলিসে শূরার অধিবেশন আহ্বান করা হয়। ২৬, ২৭ ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী শূরার বৈঠক চলে এবং আলোচনার পর সদস্যগণ অনুভব করেন যে, জামায়াতে এমন কিছু লোক প্রবেশ করেছেন-যাঁরা জামায়াতকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি এবং জামায়াতের দাবী অনুযায়ী নিজেদেরকে বদলাতে পারেননি। রুকনের মানে এসব

www.pathagar.org

লোককে আনার জন্যে প্রয়োজন ছিল সাহিত্য অধ্যয়ন ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণের। খোদার সাথে কৃত ওয়াদা, তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার ছিল। উপরন্তু মুহাসাবায়ে নফস কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন এবং নামাযের বিশেষ ব্যবস্থাপনার জন্যে হেদায়েত দেয়ার প্রয়োজন ছিল। সে জন্য সিদ্ধান্ত হয় যে, স্থানীয় আমীরগণ প্রতিবছর অন্ততপক্ষে দু'এক মাসের জন্যে কেন্দ্রে এসে আমীরে জামায়াতের সাথে অবস্থান করবেন এবং তাঁদের সহকর্মীদের তানযীম ও তাযকিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় তরবিয়ত গ্রহণ করবেন।

এটাও সিদ্ধান্ত হয় যে, জামায়াতের মধ্যকার কিছু প্রতিভাসম্পন্ন লোক স্থায়ীভাবে কেন্দ্রে চলে আসবেন যাতে করে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ইসলামী বিপ্লবের জন্যে একটি টীম তৈরী হতে পারে। তাঁরা কেন্দ্রে অবস্থান করে ইসলামী আন্দোলনের তাত্ত্বিক ও বাস্তব নেতৃত্ব দানের তরবিয়তও গ্রহণ করবেন। সেই সাথে আন্দোলনের জন্যে জরুরী সাহিত্যও তৈরী করবেন।

জামায়াত দফতর স্থানান্তর

জামায়াতের জন্যে নতুন কেন্দ্রীয় অফিসের তালাশ করা হচ্ছিল। এ অবস্থায় চৌধুরী নিয়ায আলীর অনুরোধে পুনরায় পাঠানকোটে অফিস স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হয় এবং তদনুযায়ী ১৯৪২ সালের অক্টোবরে এ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

মাওলানার বিশেষ হেদায়েত

জামায়াতে ইসলামীর কর্মতৎপরতা শুরু হওয়ার পর মাওলানা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মীদের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ হেদায়েত দান করেন। তার দু'একটি নিম্নে দেয়া হলো-

'রুকনদের কাছে আমাদের দাবী এই যে, তাঁরা যে অবস্থায় এবং যে কাজেই থাকুক না কেন, আপাদমস্তক ইসলামের প্রতীক হবেন এবং তার শিক্ষার পূর্ণ অনুসরণ করবেন। তাঁরা ঘরে থাকুন, হাটে-বাজারে থাকুন অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রত্যেক স্থানে যেন অনুভূতি থাকে যে, তাঁরা মুসলমান এবং প্রত্যেকটি কাজ ও পদক্ষেপের জবাবদিহি খোদার কাছে করতে হবে।

যদি আপনাদেরকে সামনে অগ্রসর হয়ে জনগণের মধ্যে কাজ করতে হয় এবং আন্দোলনকে গ্রামে-গঞ্জে, কৃষক-শ্রমিক এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হয়, তাহলে জনগণের নিকটতর হবার চেষ্টা করুন। কাজ করার জন্যে তাদের মধ্যে থেকেই কর্মী তৈরী করুন.... আপন আপন বস্তি ও পল্লীর জনগণের সাথে সম্পর্ক বাড়ান, তাদের দৈনন্দিন জীবনের ও কাজ-কর্মের দরদ দিয়ে খোঁজখবর রাখুন.... তাদের সাথে আচরণ করুন ভালোবাসা ও সহানুভূতির সাথে

www.pathagar.org

এবং দেখুন সমান চোখে। তাদের বিপদ-আপদে পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং তাদের খাঁটি বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে যান।"

তাঁর এ উক্তিগুলো এ কথারই প্রমাণ করে যে, তিনি ছিলেন সত্যিকার মানবদরদী ও সমাজসংস্কারক এবং জামায়াত-কর্মীদের মধ্যে এসব গুণাবলী সৃষ্টির চেষ্টা করেন।

মাওলানার অসাধারণ কর্মব্যস্ত জীবন (১৯৩৯-৪২)

১৯৩৯ এর ফেব্রুয়ারীতে পাঠানকোট থেকে মাওলানার লাহোর স্থানান্তরিত হওয়ার পর, লাহোরের আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম কর্তৃপক্ষ মাওলানার লাহোর অবস্থানের কথা জানতে পেরে তাঁদের ইসলামিয়া কলেজে ইসলামিয়াতের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানান। মাওলানা তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করেন এবং সেপ্টেম্বর থেকে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। হপ্তায় তিন দিন মাওলানা ইসলামিয়াতের উপর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিতেন। হাবীবিয়া হলে লাউডস্পীকার লাগানো হতো এবং কলেজের সকল ছাত্র ও শিক্ষক তন্ময় হয়ে তাঁর ভাষণ শুনতেন। তার ফলে বহুসংখ্যক লোক ইসলামী জীবনযাপন অবলম্বন করেন। কুরআন-হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ এবং পাকিস্তানের শরিয়ত হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতি মালিক গোলাম আলী* ও খ্যাতনামা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক চৌধুরী গোলাম জীলানী পুরোপুরি মাওলানার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। মাওলানা এক বছর যাবৎ বিনা পারিশ্রমিকে ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপনার কাজ করেন। এ সময়টা ছিল তাঁর অসাধারণ কর্মব্যস্ততার সময়। একদিকে তিনি লাহোর, আলীগড়, লাক্ষ্ণৌ, নাদওয়া, আযমগড়, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে সফর করেন এবং লাহোরের বিভিন্ন দ্বীনী সংস্থার আমন্ত্রণে বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ ভাষণদান ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি পাঠ করেন। অপরদিকে অসম্ভব ধরনের লেখাপড়ার কাজ করেন। অবস্থা এমন ছিল যে, এশার নামাযের পর পড়া ও লেখার কাজ শুরু করতেন এবং ফজর পড়ে কিছু সময় বিশ্রাম করতেন। রমযান মাসে তারাবীহ পড়ে কলম হাতে নিয়েছেন, বেগম সাহেবা এসে বলেছেন, সেহরী তৈরী হয়েছে প্রথমে খেয়ে নিন। এ ধরনের কঠোর ও অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে তিনি তাঁর স্বাস্থ্য নষ্ট করেন এবং ভগ্নস্বাস্থ্য হয়েই তাঁকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত দ্বীন ও মিল্লাতের খেদমত আঞ্জাম দিতে হয়েছে।

---

* তিনি ইন্তেকাল করেছেন। মত্যুর আগে তিনি জামায়াতের গবেষণা কেন্দ্রে ইসলামী গবেষণার কাজে নিয়োজিত ছিলেন – গ্রন্থকার।

www.pathagar.org

সপ্তম অধ্যায়
সংগঠন ও তরবিয়ত

জামায়াত সংকটের সম্মুখীন

জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার সুষ্ঠু সংগঠন ও তরবিয়তের পরিবেশ সৃষ্টি হতে কিছু সময় লাগে। দুবছর কাল খানিকটা সংকটের ভেতর দিয়ে আন্দোলনের কাজ চালাতে হয়। একটি তাগুতী শাসন ব্যবস্থার অধীনে একটি বিকৃত ও অধঃপতিত সমাজে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার প্রচেষ্টা অতীব কঠিন কাজ সন্দেহ নেই। একটি পরিপূর্ণ কুফরী সমাজে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা যেমন কঠিন কাজ, তার চেয়ে অনেক কঠিন একটি বিকৃত মুসলিম সমাজে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ। যারা তাগুতের ছত্রছায়ায় ইসলামের কিছু প্রাণহীন অনুষ্ঠান পালনের ভেতর দিয়ে নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ডাক তাদের স্বার্থে আঘাত হানবে বলে স্বভাবতই তারা তার বিরোধিতা করবে। মদীনায় আহলে কিতাব, ইহুদীদের ইসলাম বিরোধিতা, একশ্রেণীর দুনিয়াপূজারী মুসলমানের পক্ষ থেকে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রঃ) ও শাহ ইসমাঈল (রঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধিতা তারই বড় প্রমাণ। অনুরূপভাবে জামায়াতে ইসলামীর ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতাও শুরু হয়।

আন্দোলনের বিরোধিতা

পরিতাপের বিষয় যে, যে মহল থেকে সাহায্য-সহযোগিতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও পথ-নির্দেশনা লাভের সবচেয়ে অধিক আশা করা হয়েছিল, সে মহলটি ছিল উলামায়ে কেরামের, যাঁরা ছিলেন একামতে দ্বীনের সবচেয়ে অধিক দায়িত্বশীল। এ ধরনের ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে নাস্তিক কমিউনিষ্ট, জাতীয়তাবাদী, ধর্মহীন ও ধর্মবিমুখ পাশ্চাত্য জাহেলিয়াতের পূজারীবৃন্দ এবং তাগুতী শাসনের কর্মকর্তাদের আঁতকে উঠা তো বুঝতে পারা যায়, কিন্তু আলেমদের বিরোধিতা কিছুতেই চিন্তা করা যায় না। কিন্তু বিরোধিতার সূচনা তাঁদের পক্ষ থেকেই হয়। আমীরে জামায়াত তাঁদের সকল অভিযোগ-আপত্তির জবাবে একটি নীতিগত কথা বলে নীরবতা অবলম্বন করেন। তাহলো এই যে, যদি জামায়াতের দাওয়াত, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচির মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের দৃষ্টিতে কোন ভুলত্রুটি থাকে, তাহলে সুস্পষ্ট করে বলে দিলে তা সংশোধন করা হবে। কিন্তু আমীরে জামায়াতের প্রতি যদি কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ বা অসন্তুষ্টি থাকে, তাহলে জামায়াতের ঘাড়ে না চাপিয়ে ব্যক্তির কাছেই সীমিত রাখা উচিত। কিন্তু তাঁর এ নীতিগত কথার প্রতি কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি।

www.pathagar.org

সংগঠন ও তরবিয়তের কাজই ছিল এ সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমমনা লোকদের সংগঠিত করা এবং তাদেরকে ইসলামী জামায়াত ও মূলনীতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দান করে ইসলামী বিপ্লবের জন্যে গড়ে তোলাই ছিল এ সময়ের কাজ। কিন্তু একচল্লিশের আগস্ট থেকে তেতাল্লিশ পর্যন্ত দেড়-দু'বছর জামায়াত সম্পর্কে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও অভিযোগ খণ্ডন করতেই অতিবাহিত হয়।

জামায়াত প্রতিষ্ঠার পর পরই ভারতের জনৈক বুযুর্গ আলেম মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে কিছু সন্দেহ-সংশয় ব্যক্ত করে মাওলানার নিকটে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন এবং তা প্রকাশ করতেও নিষেধ করেন। মাওলানা অভিযোগকারীর নাম উল্লেখ না করে তার জবাব দেন, যা ১৯৪১ সালের তর্জুমানুল কুরআনের তিন মাসের একত্রে প্রকাশিত সংখ্যায় বের হয়। (গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

মজলিসে শূরার জরুরী বৈঠক

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪২ সালের মার্চে জামায়াতের রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের উদ্বেগজনক অবস্থায় সম্মেলন সম্ভব নয় বলে মনে করা হয় এবং তার স্থলে মজলিসে শূরার জরুরী বৈঠক আহ্বান করা হয়। এ বৈঠকে নিম্নলিখিত সদস্যগণ যোগদান করেন ঃ

০১। মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নোঁমানী, বেরেলী।
০২। মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, সরাইমীর।
০৩। মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, লাক্ষ্ণৌ।
০৪। মাওলানা মুহাম্মদ জাফর ফুলওয়ারী, কাপুরথালা।
০৫। জনাব নাযীরুল হক মিরাঠী, ইউপি।
০৬। মাওলানা মুহাম্মদ আলী কান্ধলভী, শিয়ালকোট।
০৭। মাওলানা আবদুল আযীয শার্কী, জলন্ধর।
০৮। মালিক নসরুল্লাহ খান আযীয, লাহোর।
০৯। চৌধুরী মুহাম্মদ আকবর, লায়ালপুর।
১০। ডাঃ সাইয়েদ নাযীর আলী, এলাহাবাদ।
১১। মিস্ত্রী মুহাম্মদ সিদ্দীক, সুলতানপুর লুধি।
১২। মাওলানা আবদুল জাব্বার গাজী, দিল্লী।
১৩। জনাব আতাউল্লাহ বরিশাল, বাংলা।
১৪। জনাব কামারুদ্দীন খান।
১৫। জনাব মুহাম্মদ বিন আলী উলুভী।
১৬। জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ, ভূপাল।

www.pathagar.org

এ বৈঠক ২৬, ২৭ ও ২৮ শে ফেব্রুয়ারী তিনদিন অনুষ্ঠিত হয়। এতে জামায়াতের এলাকা ভিত্তিক কাজের পর্যালোচনা করা হয়। দ্বীনের দাওয়াতের প্রসার ও উন্নতির জন্যে বিভিন্ন সদস্যের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত প্রস্তাব পরামর্শের উপর আলোচনা করা হয়। অতঃপর আমীরে জামায়াত তাঁর বিশদ মন্তব্যে সংগঠনের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরেন। এসব সংশোধনের জন্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অনুভব করা হয় যে, জামায়াতের সংগঠনে এমন কিছু লোক প্রবেশ করেছেন, যাঁরা জামায়াতকে ভালভাবে বুঝতে পারেন নি এবং তার দাবী অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারেননি। এসব লোককে সদস্যের মানে উন্নীত করার জন্যে সাহিত্য পাঠ ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল। খোদার কাছে তাঁদের কৃত ওয়াদা স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত ছিল। উপরন্তু মুহাসাবায়ে নফল (আত্মসমালোচনা), কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন এবং নিয়মিত জামায়াতসহ নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া উচিত ছিল। অতএব এ সিদ্ধান্ত হয় যে, স্থানীয় জামায়াতের আমীরগণ প্রতিবছর অন্তত দু'এক মাসের জন্যে কেন্দ্রে আমীরে জামায়াতের সাথে অবস্থান করবেন এবং কর্মীগঠন ও তাযকিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় তরবিয়ত গ্রহণ করবেন। এটাও সিদ্ধান্ত হয় যে, সুস্থ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন উৎকৃষ্ট মানের কিছু লোক স্থায়ীভাবে কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হবেন যাতে করে ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টিকারী একটি টীম তৈরী হতে পারে। তাঁরা কেন্দ্রে অবস্থান করে ইসলামী আন্দোলনের তাত্ত্বিক ও বাস্তব নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন এবং সেই সাথে আন্দোলনের জন্যে প্রয়োজনীয় সাহিত্য প্রণয়নের কাজও করবেন।

এ শূরায় এ সিদ্ধান্তও হয় যে, আজ পর্যন্ত জামায়াতের গঠনতন্ত্রের উপর বিভিন্ন মহল থেকে যা কিছু আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে তার আলোকে সংশোধিত গঠনতন্ত্র তৈরী করে প্রকাশ করা হবে। শূরা এ মত ব্যক্ত করে যে, কর্মীদের তরবিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান কেন্দ্র (লাহোর) কোনক্রমেই উপযোগী স্থান নয়। কেন্দ্র এমন স্থানে হওয়া প্রয়োজন যেখানে কর্মীগণ এসে অবস্থান করতে পারবে এবং শান্ত পরিবেশে তরবিয়ত নিতে পারবে।

অপরদিকে চার পাশের এলাকা এমন হতে হবে যেন পরিশ্রম করে একটি আদর্শ জনপদ বানানো যায় এবং দাওয়াত ও তাবলীগের জন্যে কর্মীদের কর্মকেন্দ্র হয়ে পড়ে।

কেন্দ্রের জন্যে উপযুক্ত স্থান তালাশ করা এবং কেন্দ্রে একটি টীম তৈরীর জন্যে লোক সন্ধান করে বের করার দায়িত্ব আমীরে জামায়াতের উপর অর্পিত হয়।

অস্থায়ীভাবে দারুল ইসলামে কেন্দ্র স্থানান্তরিত

শূরার সিদ্ধান্তের আলোকে কেন্দ্রীয় জামায়াতের জন্যে উপযোগী স্থানের অনুসন্ধান কাজ চলতে থাকে। শিয়ালকোটে একটি স্থানের প্রস্তাবও আসে। কিন্তু কতগুলি কারণে এ প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এদিকে চৌধুরী নিয়ায আলী নতুন করে জামালপুর বস্তিতে তাঁর ট্রাস্ট্রের অধীন দারুল ইসলামের দালান-কোঠায় কেন্দ্রীয়

www.pathagar.org

জামায়াত স্থানান্তরের আহ্বান জানান। এভাবে ১৯৪২ সালের ১৫ই জুন নতুন করে ওয়াক্‌ফকৃত দারুল ইসলামের দালান-কোঠায় জামায়াতের কেন্দ্রীয় দফতর সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জামায়াতের রুকন সম্মেলনে স্থায়ী কেন্দ্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা হবে বলে স্থির হয়।

নতুন কেন্দ্রে নতুন পরিকল্পনা

নতুন স্থানে কেন্দ্রীয় দফতর স্থানান্তরিত হবার পর কাজের এক নতুন পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। তার মধ্যে ছিল তা'লিম ও তরবিয়ত, বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা, সাধারণ দাওয়াত এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা, নেতৃত্বের জন্যে উন্নতমানের প্রচুর পরিমাণে সাহিত্য রচনা করা। এর জন্যে প্রয়োজন ছিল বিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের ও একটি উৎকৃষ্ট লাইব্রেরীর। সাধারণ দাওয়াত বিভাগের মাধ্যমে জনসাধারণকে জামায়াতের সাথে পরিচিত করা ছিল উদ্দেশ্য। এ কাজ এমন ব্যাপকভাবে করা উচিত যাতে করে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে জামায়াতের দাওয়াত পৌঁছে যায় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ কোন না কোন প্রকারে প্রভাবিত হতে পারে। তাদের নৈতিক সমর্থন লাভ করা যেতে পারে এবং বহুসংখ্যক এমন সৎ ও ত্যাগী লোক আন্দোলনে যোগদান করতে পারে যারা উন্নত চরিত্রসহ এ মহান উদ্দেশ্যের জন্যে সকল প্রকার বিপদ-মুসিবত ও জীবনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকতে পারে। এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক স্থানীয় জামায়াত যদি দাওয়াত ও তাবলীগের প্রশিক্ষণের জন্যে দু'জন করে লোক কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে একটি শক্তিশালী টীম তৈরী হতে পারে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের লক্ষ্য এই ছিল যে, কোন ধনবান এবং কলাকুশল (Technician) ব্যক্তি কেন্দ্রে আগমন করে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করলে জামায়াতের আর্থিক সাহায্য হতে পারে এবং যারা ইসলামী বিপ্লবের জন্যে সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণরত তাদেরও সাহায্য করা যেতে পারে।

মতপার্থক্য ও তার সমাধান

উনিশ শ' বিয়াল্লিশের দ্বিতীয় সপ্তাহে মজলিসে শূরার এক জরুরী বৈঠক আহ্বান করা হয়। যেখানে এমন কিছু মতপার্থক্যের সমাধান লক্ষ্য ছিল যা জামায়াতের প্রাথমিক স্তরেই সূচিত হয়েছিল, যার ফলে জামায়াত ভাঙনের সম্মুখীন হয়েছিল। আমীরে জামায়াত একাকী এ সমস্যার সমাধান করতে পারেননি।

এ বৈঠক দিল্লীতে চারদিন পর্যন্ত চলে এবং তেরজন সদস্য যোগদান করেন। কতিপয় সদস্য আমীরে জামায়াত সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধা পোষণ করেন। প্রকাশ্যে শরীয়তের যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে বিরোধিতার পরিবর্তে গোপনে যুক্তিহীন ও অবান্তর অভিযোগ ছড়ানো হতে থাকে। মাওলানার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাকওয়া-পরহেযগারীর। মাওলানার লেবাস-পোশাক ও ঘরদোর হামেশা

www.pathagar.org

থাকতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তকতকে, ঝকঝকে। চিরাচরিত তাওকয়া-পরহেযগারীর একটি বিশিষ্ট মানসিকতাসম্পন্ন কিছু লোক এটাকে তাকওয়ার খেলাপ মনে করে অপপ্রচার শুরু করেন। প্রকাশ্যে বলারও সাহস ছিল না এবং তার পেছনে কোন যুক্তিও ছিল না। কিন্তু গোপন প্রচারণা মানুষের মনে বড় দাগ কাটে। তাই জামায়াত এক সংকটের সম্মুখীন হয়।

মাওলানা নিম্নের তিনটি বিকল্প প্রস্তাব শূরার সামনে রাখেন ঃ

এক-আমীরে জামায়াত পদত্যাগ করবেন এবং অন্য কাউকে আমীর নির্বাচিত করা হবে। অথবা

দুই- তিন চারজনের একটি প্রেসিডিয়াম গঠন করে কাজ চালানো হবে। অথবা

তিন- জামায়াত ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং প্রত্যেকে ব্যক্তিতভাবে কাজ করবে।

ইমারতের জন্য বিকল্প কোন যোগ্য লোক না থাকায় প্রথম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটিও এজন্যে বাতিল করা হয় যে, তা শরিয়তের দিক দিয়েও জায়েয নয়-

وَلَا جَمَاعَةَ اِلَّا بِاَمَارَةٍ

আমীর ব্যতীত জামায়াত হতে পারে না

এবং বাস্তবে তা সম্ভবও নয়।

মতভেদকারী অতি অল্প সংখ্যক লোক তৃতীয় প্রস্তাবের সপক্ষেই তাঁদের আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রায় সকলে বলেন, জামায়াত ভেঙ্গে দেয়ার পরিবর্তে তাঁদেরই জামায়াত পরিত্যাগ করা উচিত। কিছু লোক তাঁদের মতভেদ পরিহার করে জামায়াতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। চারজন মাত্র একমত হতে না পেরে জামায়াত পরিত্যাগ করেন। তাঁরা হলেন- (১) মাওলানা মনযুর নোমানী, সম্পাদক, আল-ফুরকান, (২) মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ ফুলওয়ারভী, কাপুরথালা, (৩) জনাব কামরুদ্দীন খান, লাহোর এবং (৪) জনাব আতাউল্লাহ খান, পটুয়াখালী, বরিশাল। তারপর কোন কোন মহল থেকে জামায়াতের বিরোধিতা থাকলেও যে আভ্যন্তরীণ বিপদের মেঘ জমে উঠেছিল তা কেটে যায়।

সাংগঠনিক কাজের পর্যালোচনা

সংকট কেটে যাওয়ার পর নতুন উৎসাহে কাজ চলতে থাকে এবং পরবর্তী কাজের ফলে ১৯৬৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত রুকন সংখ্যা সাতশ' পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পাঞ্জাব, ইউপি, বিহার, দাক্ষিণাত্য এবং মাদ্রাজে জামায়াতের দাওয়াত দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। অবশ্য সিন্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ, বাংলা, বোম্বাই এবং মধ্য প্রদেশে জামায়াতের দাওয়াত তেমন পৌঁছাতে পারেনি। দেড়-দুবছরের প্রচেষ্টার ফলে লক্ষাধিক লোকের কাছে জামায়াতের দাওয়াত পৌঁছানো সম্ভব হয়

www.pathagar.org

এবং শতকরা দশজন এ দাওয়াতের দ্বারা প্রভাবিত হয়। দাওয়াতের সাহিত্য ছিল উর্দু ভাষায়। সেজন্য তা শুধু উর্দুভাষীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। প্রাথমিকভাবে ইংরেজী ভাষায় ও স্থানীয় ভাষায় কিছু সাহিত্য রচনা করা হয়।

মহাযুদ্ধ আন্দোলনের বিরাট প্রতিবন্ধক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিবেশ অত্যন্ত সীমিত ও কষ্টসাধ্য করে দিয়েছিল। যানবাহন প্রায় সেনাবাহিনীর চলাচলের জন্যে ব্যবহৃত হতো বলে সফর করা অত্যন্ত কষ্টকর এবং অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন স্থানে সফর করে জামায়াতের সংগঠন ও দাওয়াত ছড়াবার কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে পড়েছিল। কর্মী সংখ্যাও ছিল অল্প। যাঁরা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন, তাগুতী শাসনের অর্থনৈতিক পলিসি তাদের জীনযাত্রা অতিষ্ঠ করেছিল।

সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকই এদিকে মনোযোগ দিতে পারতো। যাদের মধ্যে রাজনীতি করার অভিলাষ ছিল, তারা এ নিরস-বিরস দাওয়াতের দিকে মনোযোগ দেয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। কারণ আগ্রহ সৃষ্টির অন্যান্য বহু ক্ষেত্র ছিল। যাদের মধ্যে কিছু যোগ্যতা ছিল এবং যারা তাগুতী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে আল্লাহর আনুগত্যের পথে আসছিল, তাদের যোগ্যতাও পুরোপুরি বিকশিত ও সুবিন্যস্ত হওয়ার মুখাপেক্ষী ছিল। তারা এ প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও সুবিন্যাসের স্তর অতিক্রম করছিল।

এমন এক কঠিন সময়ে একটি প্রতিষ্ঠিত তাগুতী শাসন ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। তখন অবস্থা এমন হয়েছিল যে, সফরের জন্যে পথ খরচ, চিঠিপত্র প্রেরণের জন্যে প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট সংগ্রহ করা, মুদ্রণের জন্যে কাগজ এবং দ্বীন প্রচারের মৌলিক উপায়-উপকরণের এক দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছিল। এভাবে একচল্লিশের আগস্ট থেকে তেতাল্লিশের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক চরম সংকটকাল ছিল। এসময়ে মামুলি চিঠিপত্রের মাধ্যমে পথনির্দেশ দেয়া হতো।

একে তো প্রতিটি ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিককাল এমনই হয়ে থাকে বলে জামায়াতে ইসলামীরও হয়েছিল। তদুপুরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রতিটি বস্তুকে দুষ্প্রাপ্য করেছিল এবং উপায়-উপকরণের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। এজন্যে এমন কঠিন অবস্থায় আন্দোলনের পথে আসার জন্যে ঐসব লোক প্রস্তুত হতে পারতো না, যাদের লক্ষ্য ছিল জীবন-জীবিকার জন্যে নিজেদেরকে তৈরী করা (To build Career)। এজন্যে মর্দে মুমিনের দুষ্প্রাপ্যতা ছিল। এমন পরিস্থিতিতে আমীরে জামায়াত নিখিল ভারতের আমীর হওয়া সত্ত্বেও দশজনের কাজ একাকীই সম্পন্ন করতেন। তর্জুমানুল কুরআনের সম্পাদনা, প্রবন্ধাদি রচনা, চিঠিপত্র লেখা, বক্তৃতা-বিবৃতি দান, দারসে কুরআন, সংগঠন, দারুল ইসলামের তত্ত্বাবধান, মেহমানদারী-যাবতীয় কাজ তাঁকে একাকী এবং নিজ হাতে করতে হতো, যার ফলে তিনি অসময়েই স্বাস্থ্যহারা হয়ে পড়েন।

www.pathagar.org

সংগঠন ও প্রশিক্ষণের স্তর
(অক্টোবর, ১৯৪৩-১৯৪৬)

তিনটি আঞ্চলিক সম্মেলন

জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি আদর্শিক সংগঠন কায়েমের পশ্চাতে কোন স্বার্থান্ধ মহলের বাসনা-অভিলাষ ছিল না যে, তারা তাদের ধন-ঐশ্বর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদার মাধ্যমে তাকে শক্তিশালী করবে। আর না এর বুনিয়াদ কোন শ্রেণীভিত্তিক, আঞ্চলিক অথবা বংশীয় গোঁড়ামি তথা পক্ষপাতিত্বের উপর কায়েম করা হয়েছিল যে, সে গোঁড়ামি মানুষকে টেনে এনে তার চারধারে একত্র করে দেবে। জামায়াতে ইসলামী এমন কোন চিত্তাকর্ষক সংগঠন বা সংস্থা ছিল না যার সাথে লোকের অর্থনৈতিক উন্নতি ও পদমর্যাদা লাভের সোনালী স্বপ্ন জড়িত ছিল।

জামায়াতে ইসলামীর মূলে ছিল একটি মহান লক্ষ্যের প্রতি দাওয়াত, একটা সুস্পষ্ট সংবিধানের আনুগত্য, একটা নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যবস্থাপনা। তার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার জন্যে কর্মীদেরকে বিশেষ গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তার দাওয়াতের প্রসারের জন্যে অন্তঃসারশূন্য শ্লোগান, সুউচ্চ, মহৎ, মিথ্যা ওয়াদার কোন মনভুলানো কর্মসূচী ছিল না। পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনা, ত্যাগ ও কুরবানী ছিল তার বৈশিষ্ট্য। আপন উপায়-উপকরণ দ্বারা মানুষের কাছে দ্বীনে হকের দাওয়াত পৌঁছানো। অতঃপর তাদের পক্ষ থেকে তিক্ত ও অশালীন জবাব, গালি, সন্দেহ প্রকাশ প্রভৃতির পর ধৈর্যধারণ করেই তাদেরকে দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হতো।

এ সংগঠন পাকাপোক্ত করার জন্যে সফর অপরিহার্য, সম্মেলন অনুষ্ঠানেরও প্রয়োজন। কারণ এসব হচ্ছে মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর মাধ্যম। সম্মেলন আহ্বানের ঝুঁকি গ্রহণ এবং সফর–জামায়াতের দায়িত্বশীলগণ এ দুটি পন্থা অবলম্বন করেন দাওয়াত ছড়াবার উদ্দেশ্যে।

জামায়াত প্রতিষ্ঠার দিনেই এ সিদ্ধান্ত হয় যে, জামায়াতের রুকন সম্মেলন প্রতি বছর মার্চ মাসে হবে। কিন্তু মহাযুদ্ধ এ পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছিল। তা কিছুতেই সম্ভব ছিল না বলে সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে অঞ্চলভিত্তিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

মধ্যভারতের সম্মেলন

মধ্যভারত তথা ইউপি ও বিহারের রুকনদের সম্মেলন ২১ ও ২২শে অক্টোবর (১৯৪৩) দারভাংগায় অনুষ্ঠিত হয়। লোকালয় থেকে দু'মাইল দূরে শস্যশ্যামল

www.pathagar.org

মাঠে এক শান্ত পরিবেশে এ সম্মেলন চলে। মাওলানা মওদূদী দুজন সঙ্গীসহ এ সম্মেলনে যোগদান করেন।

এ সম্মেলনে একথা অনুভব করা হয় যে, বিগত দুবছরের চেষ্টাচরিত্রের ফলে মুসলমানদের অন্যান্য দলগুলোও ইসলামকে লক্ষ্য হিসেবে পেশ করা শুরু করেছে। এজন্যে এখন এ বিষয়ের উপর জোর দেয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয় যে, ইসলামী লক্ষ্যের জন্যে কাজ করতে হলে উন্নতমানের চরিত্র তার জন্যে অপরিহার্য শর্ত। এ ধরনের কথা যাঁরা বলছেন তাঁদেরকে নিষ্ঠার সাথে তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হবে-অথবা অনৈসলামী চরিত্র ও কর্মপন্থার সাথে ইসলামের শ্লোগান দিয়ে জনগণকে প্রতারণা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

একথাও সুস্পষ্ট করে বলে দেয়া হয় যে, জামায়াতের দাওয়াত হৈহল্লা-প্রিয় জনতার কাছে পেশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে–যতোক্ষণ না তাদের পথনির্দেশনার জন্যে একটি সুশৃংখল জামায়াত এবং আঞ্চলিকভাবে নেতৃত্বদানকারী একটি টীম তৈরী হয়েছে, যা তাদের চরিত্র, আচার-আচরণ ও খেদমতের মাধ্যমে জনগণকে তাদের আয়ত্তে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এ সম্মেলনে ইসলামী আন্দোলনের মেযাজ-প্রকৃতি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের মেযাজ-প্রকৃতি সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয় যাতে মানুষ উভয় প্রকারের আন্দোলনের মেযাজ-প্রকৃতি ও কাজকর্ম ভালো করে বুঝতে পারে। এমন কোন গণআন্দোলন করা জামায়াতের লক্ষ্য ছিল না যা নিয়ন্ত্রণ ও সঠিক দিকনির্ণয় করে দেয়ার জন্যে সৎ ও যোগ্য লোকের একটি টীম তৈরী করা হয়নি-যারা স্বাভাবিকভাবে গণনেতৃত্ব দানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। এটা ঠিক যে, একটি আন্দোলনের বিপ্লব সাধনের জন্যে নতুন ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত বক্তা ও নেতার প্রয়োজন হয়, যার মধ্যে খোদাভীতির তীব্র অনুভূতি অবশ্যই থাকবে। যতোদিন এ বাঞ্ছিত গুণাবলী অর্জিত না হয়েছে, ততোদিন নীরবে সংগঠন ও তরবিয়তের কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

একথা সত্য যে, যতোদিন না এ ধরনের একটি প্রভাবশালী দল তৈরী হয়েছে যারা এ দাওয়াত বুঝে-সুঝে কবুল করেছে, যারা দাসত্ব, আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যারা অন্যান্য সকল আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্যের সাথে শরীক করা পরিহার করেছে এবং যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহর আইনকে নিজের জীবন বিধান বানিয়ে নিয়েছে, ততোদিন পর্যন্ত কোন বাতিল ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে তাকে উৎখাত করার জন্যে কোন প্রকার গণকর্মসূচীর সূচনা করা চিন্তার বিভ্রান্তি এবং দ্বীন সম্পর্কে বিচার-বুদ্ধিহীনতা ছাড়া আর কিছু নয়।

www.pathagar.org

ইসলামী দাওয়াতের রিপোর্ট ও তার পর্যালোচনা

এসব কর্মী সম্মেলনে কাজের রিপোর্ট পেশ করা শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন স্থানীয় জামায়াত কর্মীগণ দাওয়াতে দ্বীনের যে কাজ করেছেন তার রিপোর্ট, কাজের নানান অসুবিধা এবং বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করতেন। তারপর এসব রিপোর্ট পর্যালোচনার পর তাদের কাজের ত্রুটি এবং দাওয়াত প্রসারের জন্যে পরামর্শ দেয়া হতো। এ যাবৎ পর্যন্ত লোকের সামনে দ্বীনের চূড়ান্ত দাবী পেশ করা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের হেদায়েত দেয়া হতো। কারণ তাবলীগ-তালকীন এবং চরিত্র সংশোধনের পর্যায়ে এমন দাবী বয়ান করলে অনেক সময় কাঁচা লোক ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাবলীগ শুধু বক্তৃতা-বিবৃতি অথবা আলোচনার মাধ্যমেই হয় না। বরঞ্চ প্রকৃত তাবলীগ হচ্ছে এই যে, দাওয়াত দানকারী তার গোটা জীবন দিয়ে মানুষের কাছে প্রতি মুহূর্তে পেশ করতে থাকবে। বাতিল বা ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থায় হকের দাওয়াত দানকারীর জীবন এমন যেন বরফের ঘরে কয়েকটি জ্বলন্ত কয়লা রাখা হয়েছে। তারপর কেউ যদি কোন আওয়াজও না তোলে তথাপি জ্বলন্ত কয়লা সেখানে থাকাটাই বরফের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ ঘোষণা।

দাওয়াতী হেদায়েতের মধ্যে আমীরে জামায়াত এ বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, বিভিন্ন দল থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা অনেক সময় পূর্ববর্তী দল ও রাজনৈতিক জীবনের প্রভাবও সাথে করে নিয়ে আসেন। আমাদের এখানে অনেক ভাইয়ের মধ্যে তাঁদের পূর্ববর্তী দলীয় গোঁড়ামি এখনও দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর সংশোধন করা প্রয়োজন।

জামায়াতের এ সম্মেলনে বিহার প্রদেশের জন্যে একজন স্থায়ী কাইয়েম (সেক্রেটারী) নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত হয়। উপরন্তু আরও বহু সাংগঠনিক ও প্রশিক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। স্থির হয় যে, স্থানীয় জামায়াতের জন্যে সাপ্তাহিক বৈঠক অপরিহার্য করা হবে। তাতে দারসে কুরআনের নিয়মিত ব্যবস্থা করা, বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা এবং দাওয়াতী কাজের আগামী সপ্তাহের কর্মসূচী তৈরী করার নির্দেশ দেয়া হয়। উপরন্তু খোদার নিকট কৃত ওয়াদা বার বার স্মরণ করার হেদায়েতও দেয়া হয়, যাতে প্রত্যেককে আল্লাহ তায়ালা যতোটুকু যোগ্যতা দান করেছেন তা দ্বীনের খেদমতে এবং বাতিল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে আত্মনিয়োগ করতে পারে। যাদের মধ্যে যে যোগ্যতা আছে সে যোগ্যতা অনুযায়ী তেমন মহলেই কাজ করবে। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকে তার আমলের সাথে সাথে যোগ্যতারও জবাবদিহি আখেরাতে করতে হবে।

www.pathagar.org

একটি অর্থনৈতিক স্কীম

জনৈক কর্মী জনাব ফজলুর রহমান খান এ সম্মেলনে একটি অর্থনৈতিক স্কীম পেশ করেন।[১] স্কীমটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলা হয় যে, বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের সমবায় ভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তুলতে পারলে তার দ্বারা একদিকে যেমন অর্থবিনিয়োগ ও শ্রমদানকারী প্রচুর মুনাফা লাভ করবেন, অপরদিকে জামায়াতের বায়তুলমালও শক্তিশালী হবে। এসম্পর্কে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী বলেন, ব্যক্তিগতভাবে কেউ এ স্কীম বাস্তবায়িত করলে তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু জামায়াতের পক্ষে দাওয়াতে দ্বীন ও হকের কালেমা বুলন্দ করার কর্মসূচি ব্যতীত কোন ব্যবসা-বাণিজ্যের পদক্ষেপ গ্রহণ উচিত হবে না। একটি বিপ্লবী দল যদি একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও হয়ে পড়ে, তাহলে তার বিপ্লবী প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং কিছু লোক জামায়াতের লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এ দলভুক্ত হবে। এ মন্তব্যের পর জনাব এফ, আর, খান তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

এ সময়ে মানুষের মধ্যে এ কানাঘুষা চলছিল যে, শেষ পর্যন্ত ইসলামী বিপ্লব কিভাবে হবে। আমীরে জামায়াত তার ব্যাখ্যা দান করতে গিয়ে বলেন, একটি সংস্কারমূলক দলের বড় সমস্যা হলো চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ ও চরিত্র গঠন। এ দু'টি যদি হয়ে যায়, তাহলে সাজ-সরঞ্জাম তো প্রতিদ্বন্দ্বীর মনমস্তিষ্ক জয় করেই লাভ করা যায়।

সকল কর্মসূচীর শেষে-একটি জনসভা ছিল যেখানে জামায়াতের দাওয়াত পেশ করা হয়। যদিও অন্যান্য দলগুলো জামায়াতের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত প্রচারণা চালাচ্ছিল, কিন্তু জনসভায় যখন জামায়াতের বুনিয়াদী দাওয়াত পেশ করা হয়, তখন মানুষ সাধারণত তা পছন্দ করে। খোদার কালেমা বুলন্দ করার কথা মুসলমান সমাজে বেশ প্রিয় আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ে।

---

১. জনাব ফজলুর রহমান খান এম এ, এল, এলবি, মুংগেরের একজন আইনজীবী ছিলেন। যিনি প্রাথমিক কালের একজন জামায়াত সদস্য। ভারত বিভাগের পর তিনি রাজশাহী শহরে এসে বসবাস করতে থাকেন এবং দাওয়াতী কাজের সূচনা করেন। তিনি পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক শূরার সদস্য ছিলেন। আন্দোলনের জন্যে তিনি অকাতরে দান করতেন। তিনি উর্দু ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সাথে বহুদিন একত্রে কাটাবার সুযোগ হয়েছিল। রাজশাহী শহরে তাঁর বিরাট ব্যবসা ছিল, যা এফ আর খান এন্ড কোং নামে পরিচিত ছিল। তাঁর একটি বাড়ী জামায়াতের জন্য বিনা ভাড়ায় দিয়ে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক এবং আন্দোলনের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তিনি পাকিস্তান আমলেই ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাঁকে মাগফেরাত ও রহমত দান করুন- গ্রন্থকার।

www.pathagar.org

সংগঠন, তরবিয়ত ও তাযকিয়া

জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা বলেন, সংগঠন সুদৃঢ় করার উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। আমার মতে মুসলমানদের অধিকাংশ দলের সংগঠন মজবুত নয় বলে তাদের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। সুসংগঠিত নয় এমন একটি দল কোন সংগঠিত দলের মুকাবিলা করতে পারে না। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোকের দল যদি সুসংগঠিত হয় এবং মেহনত ও চেষ্টা-সাধনা করে, তাহলে গোটা জাতিকে সামাল দিতে পারে। কোন দলে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় যদি হয় এবং তা যদি সংগঠিত না হয়, তাহলে তা কোন কাজই করতে পারে না। সংগঠনের মূলনীতি হচ্ছে দ্বীনের ফরযসমূহের নিয়মিত অনুসরণ, নিষিদ্ধ ও হারাম কাজগুলো থেকে দূরে অবস্থান এবং জামায়াতের শৃংখলা ও সংবিধান কঠোরভাবে অনুসরণ। কারণ জাতির প্রকৃত রোগ হচ্ছে আকীদাহ-বিশ্বাসের অনুভূতি না থাকা। এজন্যে দু'ধরনের লোকের স্থান এ জামায়াতে রয়েছে। এক, তরবিয়ত তদারকের আওতাধীন লোক, যাদেরকে শুভাকাঙ্ক্ষী অথবা সমর্থক (মুত্তাফিক) বলা হয়। দুই, তরবিয়তপ্রাপ্ত উৎসর্গকৃত (Dedicated) লোক, যাদেরকে রুকন বলা হয়। সমর্থকবৃন্দও তরবিয়তের আওতাধীন লোক হিসেবে জামায়াতের শক্তির ভাণ্ডার। কিন্তু রুকনগণই জামায়াতের মেরুদণ্ড। তারাই জামায়াতের যাবতীয় পলিসি নির্ধারণ করে, সকল পদে অধিষ্ঠিত থাকে, লোক নির্বাচিত করে এবং তারাই শূরা ও আমীরে জামায়াত নির্বাচিত করেন।

তিনি বলেন, কর্মীদের মধ্যে জামায়াতের শৃংখলা মেনে চলার অনুভূতি দ্বীনি অনুভূতির পরিমাণ অনুসারেই সৃষ্টি হয়। এজন্যে দ্বীনি অনুভূতি জাগ্রত হলেই জামায়াতের শৃঙ্খলা সুদৃঢ়করণ নিশ্চিত হয়।

তারপর স্থানীয় জামায়াত গঠনের নীতি ও নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়। স্থানীয় জামায়াত থেকে জেলা জামায়াত এবং অতঃপর কেন্দ্রীয় জামায়াত একটা পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা ও দ্বীনি কর্তব্যবোধের জালে আবদ্ধ থাকে। কেন্দ্রীয় জামায়াতের কাজ হচ্ছে তা গোটা জামায়াতকে চিন্তার নেতৃত্ব দান করা। তার মর্যাদা একজন অভিভাবক ও মুরব্বীর ন্যায়, জামায়াতের সামগ্রিক শৃঙ্খলা ও তরবিয়তের সে তদারকি করে। জামায়াতের সর্বস্তরে পরামর্শভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। সকল পদের মিয়াদ নির্ধারিত আছে এবং নির্ধারিত সময় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। নির্বাচনের পর নির্বাচিত ব্যক্তিগণ শপথ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কাজের রিপোর্ট পেশ, তার ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ, জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থাপনা এবং বাতিলের মুকাবিলার জন্যে চিন্তা ও কাজের দ্বারা বাস্তব জিহাদ জামায়াতী ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করে।

www.pathagar.org

কর্মীদের তরবিয়তের ব্যাপারে আমীরে জামায়াত অত্যন্ত সচেতন। তাঁর ধারণা যে মানসিক ও চারিত্রিক দিক দিয়ে দুর্বল কর্মী তাদের নেতাদের বদনামের কারণ হয়ে থাকে এবং তাদের সকল চেষ্টাচরিত্র ও পরিশ্রম ব্যর্থ করে দেয়। এজন্যে মজবুত চরিত্র গঠন অত্যন্ত প্রয়োজন। তাহলেই নির্ভরযোগ্য ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য এ ধরনের লোক যারা জামায়াতের শুভাকাঙ্ক্ষী কিন্তু শৃঙ্খলার কঠোরতা সইতে পারেন না, তাঁরা জামায়াতের সমর্থক-শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে জামায়াতের সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারেন।

জামায়াত প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাধারার লোককে একই দলীয় শৃঙ্খলার মধ্যে একত্র করে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে। তার সুফলও হয়েছে বিস্তর। সকল ফেকহী মতবাদের লোককে সংবিধানের আনুগত্যের মাধ্যমে জামায়াতে শামিল হওয়া সম্ভব করে তুলেছে। বস্তুত জামায়াতে ইসলামী কোন সংকীর্ণ ফের্কাবন্দী জামায়াত নয়। না এটা কোন দেওবন্দী অথবা বেরেলভী জামায়াত আর না আহলে হাদীস অথবা হানাফী জামায়াত। কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক অথবা ভৌগোলিক, আঞ্চলিক দলও এটা নয়। এ এক বিশ্বজনীন মহানতম আদর্শের ধারক ও বাহক জামায়াত, যার আহ্বান বিশ্ব মানবতার ঐক্যের দিকে, কল্যাণের দিকে আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ বন্দেগীর দিকে। সকল মুসলমানের জন্যে আল্লাহর কিতাব ও নবী পাকের সুন্নাতের ভিত্তিতে একটি সর্বসম্মত প্লাটফরম তৈরী করাই এ জামায়াতের উদ্দেশ্য। এ সম্মেলনগুলোতে একটিমাত্র উম্মাহর বহিঃপ্রকাশই যেন দেখতে পাওয়া যায়।

সমাজ স্বয়ং প্রশিক্ষণকেন্দ্র

জামায়াতে ইসলামী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো ছাড়াও তার কর্মীদের তরবিয়তের এ ব্যবস্থাও করেছে যে, কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সাহিত্য পাঠ করাবার পর দাওয়াতে দ্বীনের কাজের জন্যে বাস্তব ময়দানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। দ্বীনের কাজ যারা বাস্তব ক্ষেত্রে করে তখন মানুষ তন্ন তন্ন করে তার ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তারপর হয় তাকে কাজ থেকে বিরত হতে হয় অথবা ত্রুটি সংশোধনের জন্যে প্রস্তুত হয়। এ এমন এক তরবিয়ত যা প্রতিদিন প্রত্যেক দাওয়াত দানকারী লাভ করে। এভাবেই মানুষ তার নিজেকে মেজেঘষে একেবরে দ্বীনের চাহিদা অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে। জামায়াতে ইসলামী তরবিয়তের এ ব্যবস্থা রেখেছে যে, দ্বীনের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে যদি কোন ব্যক্তি বা মহল থেকে গালি খেতে হয়, তাহলে গালির জবাবে কখনো সে গালি দেবে না। মিথ্যা অভিযোগ করলে, তার জবাবে কারো প্রতি মিথ্যা অভিযোগ করবে না। কোন ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রলোভন এলে তা দমন করে সত্য পথে অটল থাকবে। ক্ষতির সম্মুখীন হলে তা হাসিমুখে বরদাশত করবে। কোন শক্তির রক্তচক্ষু তাকে

www.pathagar.org

ভীত-শঙ্কিত করবে না। মোট কথা, প্রথম দিন থেকেই জামায়াতে ইসলামী বাস্তব জীবন ক্ষেত্রে কর্মীদের তরবিয়তের জন্যে এ নীতিই নির্ধারিত করে দিয়েছে।[১]

উল্লেখ্য যে, জামায়াতে ইসলামীর অধীন কোন পদমর্যাদার জন্যে প্রার্থী হওয়া অথবা কারো পক্ষে প্রচারণা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে পদমর্যাদা লাভের অভিলাষ এখানে কখনো মাথাচাড়া দিতে পারে না। সম্মেলনে সমালোচনার স্থায়ী ব্যবস্থা আছে যার শরীয়তসম্মত নিয়ম-পদ্ধতিও নির্ধারিত আছে। এসব ব্যবস্থা একটি ইসলামী দলকে ভাঙনের মুখ থেকে রক্ষা করে।

তরবিয়তী ব্যবস্থা খানকাহী নয়- আন্দোলনমূলক

জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের তরবিয়তের জন্যে কিছু সংখ্যক দুরূদ পাঠ যিকির-আযকার, মুরাকাবা প্রভৃতির কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ইসলামী বিপ্লবের লোক তৈরী করাই জামায়াতে ইসলামীর তরবিয়তের উদ্দেশ্য। সে জন্যে জামায়াতের তরবিয়তী ব্যবস্থা এমন নয় যা খানকাগুলোতে অবলম্বন করা হয়, বরঞ্চ এ তরবিয়ত আন্দোলনমূলক। তরবিয়তের জন্যে জামায়াত কর্মীদেরকে কোন যিকিরের মজলিসে বসে কালক্ষেপণ করতে হয় না। বরঞ্চ অধঃপতিত সমাজের মধ্যে যতো প্রকারের বিকৃতি ও অধঃপতন এসেছে তার প্রতিটির বিরুদ্ধে বাস্তব সংগ্রাম করাই তরবিয়তের উদ্দেশ্য। তদুপরি তাদের প্রতিটি সংগ্রাম আইনানুগ ও নীতিনৈতিকতার অধীন এবং পরিপূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত। জনগণের সংস্কার-সংশোধনের জন্যে জনগণের মধ্যে জনগণকে সাথে নিয়েই কাজ করা যেতে পারে। গতানুগতিক ও বংশানুক্রমিক ইসলামী স্বীকৃতির পরিবর্তে বাস্তব ক্ষেত্রে জীবনের সর্বস্তরে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার চেতনা ও অনুভূতি মুসলমানদের মধ্যে জাগ্রত করার কাজই জামায়াত কর্মীদের করণীয়। এ জন্যে জামায়াত তার কর্মীদেরকে যাহের ও বাতেন (Exoteric & Esoteric) উভয় প্রকারের তরবিয়ত দান করে।

যাহের ও বাতেনের সংশোধনের কাজ

দাখেলী বা বাতেনী তরবিয়তের নিমিত্ত জামায়াত কর্মীদের জন্যে নফসের তরবিয়ত, নফসের শালীনতা, রুচি ও মননশীলতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করেছে। মানুষের অভ্যন্তরে যে পশু প্রবৃত্তি তার লালসা চরিতার্থ করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ

---

১. উল্লেখ্য যে, নবী করীম (সঃ) সাহাবায়ে কেরামের জন্যে তরবিয়তের এ নীতিই অবলম্বন করেছিলেন

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ

এ মূলনীতি অনুযায়ীই তাঁরা মহান চরিত্রের অধিকারী হয়েছেন। বাতিল শক্তির চরম বিরোধিতা ও বিনষ্পেষণ তাদেরকে সত্যের প্রতি অটল ও অবিচল থাকার প্রেরণা দান করে। নির্যাতন নিষ্পেষণের অগ্নিপরীক্ষা ব্যতীত সত্যিকার চরিত্র তৈরী কিছুতেই সম্ভব নয়- গ্রন্থকার।

www.pathagar.org

করে, তাকে হালাল-হারাম ও মারুফ-মুনকারের সীমারেখার মধ্যে দমিত ও সংযত রাখতে হবে। এর জন্য প্রথম কাজ কুরআন ও সুন্নাতের জ্ঞান লাভ যা ব্যতীত আত্মচেতনা ও আত্মানুভূতি সম্ভব নয়। এর মাধ্যমে খোদার ভয় ও মহব্বত এবং নিজেকে আল্লাহর রঙে রঞ্জিত করা (تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ)

একান্ত প্রয়োজন। তারপর নবীর পরিপূর্ণ অনুসরণ, এর দ্বারা নবীর প্রতি অগাধ ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। তারপর সীরাতে সাহাবার অধ্যয়ন, কারণ তারা ছিলেন নবীপ্রেমের মূর্তপ্রতীক। এভাবে নবীপাক (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ চরিত্রের ছাঁচে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে।

সমাজের অধঃপতন দূর করার জন্যে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার কাজকে জামায়াতে ইসলামী কর্মীদের জন্যে যাহেরী তরবিয়তের কার্যকর বাস্তব পন্থা হিসেবে অবলম্বন করেছে। অধঃপতন ও পথভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, প্রতিপক্ষের বিরোধিতা সহ্য করা, ভ্রান্ত ধারণা দূর করা, নির্যাতন-নিষ্পেষণ সহ্য করা, প্রতিবন্ধকতা দূর করা, অভিযোগ খণ্ডন করা প্রভৃতি কাজগুলো তরবিয়তের জন্যে অধিকতর উপযোগী ও কার্যকর পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

উত্তর ভারতীয় সম্মেলন

দারভাংগা সম্মেলনের পর উত্তর ভারতীয় রুকনদের সম্মেলন দারুল ইসলাম পাঠানকোটে ১৯৪৪ সালের ২৬শে ও ২৭শে মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, কাশ্মীর ও বেলুচিস্তানের রুকনগণ যোগদান করেন। অবশ্য ইউপি এবং বিহার থেকে যথাক্রমে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী এবং সাইয়েদ মুহাম্মদ হুসাইন যোগদান করেন।

২৬শে মার্চ সকাল ৭টায় সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। কর্মীগণ আমীরে জামায়াতের নিকটে তাদের এলাকার অবস্থা ও অসুবিধা বয়ান করেন এবং এ সম্পর্কে আমীরে জামায়াতের পরামর্শ ও হেদায়েত লাভ করেন। এ সম্মেলনে কিছু সংখ্যক সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষী যোগদান করেন।

আমীরে জামায়াত রুকনিয়াতের দায়িত্ব ও দাবী সম্মেলনে বয়ান করেন। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামীর কর্মপদ্ধতির উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, কর্মপদ্ধতি ভালো করে জানার পর যেন লোক জামায়াতে শামিল হয়। কর্মপদ্ধতি পুরোপুরি জানার পূর্বে জামায়াতে যোগদান করা উচিত নয়। জামায়াতের লক্ষ্য হকের কিয়দংশ প্রতিষ্ঠা নয়, পুরোপুরি হক প্রতিষ্ঠাই এর লক্ষ্য। তিনি বলেন, মুসলমানদের দলগুলো সাধারণত কঠোরতাসহ কাজ করে। তারা সাধারণত ভাবপ্রবণ, বিতর্কমূলক কলাকৌশল, কঠোর ভাষা প্রভৃতির মাধ্যমে কাজ করে। অন্যদিকে জামায়াতের পন্থা হচ্ছে ধৈর্য ও ভারসাম্যসহ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পেশ

www.pathagar.org

করা। জামায়াত একজন চিকিৎসকের মতো আপন মিল্লাতের রোগাক্রান্ত প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চিকিৎসা করে, তা কেটে ফেলে দেয় না। জনসাধারণের রোগ এই যে, তাদের মধ্যে মুশরেকী ধ্যান-ধারণা ও অনুষ্ঠানাদি ধর্মের পবিত্র দরজা দিয়েই প্রবেশ করেছে। তাদের সংস্কার-সংশোধনের কাজ রোগের চিকিৎসার মতোই শান্তমনে তাবলীগের পন্থায়ই হতে পারে।

সম্মেলনের উদ্দেশ্য

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে আমীরে জামায়াত সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপর আলোকপাত করে বলেন, আমাদের সম্মেলনগুলো তাদের স্বকীয়তার দিক দিয়ে পারিভাষিক সভা-সম্মেলন থেকে ভিন্ন ধরনের। আমাদের এখানে লম্বা লম্বা বক্তৃতা, মিছিল, শ্লোগানের পর শ্লোগান, হৈচৈ, গোলমাল প্রভৃতি নেই। জনগণের দৃষ্টিকোণ কৃত্রিম পন্থায় অথবা চাঞ্চল্য সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট করা এসব সম্মেলনের উদ্দেশ্য নয়। বরঞ্চ উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক পরিচিতি, ত্রুটিবিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ, সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারে পারস্পরিক মতবিনিময়। যারা দুনিয়ার সংস্কার-সংশোধনের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে, তাদের সর্বপ্রথম নিজেদের সংশোধনের ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে অধিক প্রয়োজনীয়। সম্মেলনে উপস্থিতির বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের সম্মেলনে যারা অনুপস্থিত তারা যেন জামায়াত ও তার দাওয়াত পুরোপুরি বুঝতে পারেন নি। তাদের জানা নেই যে, জামায়াতের আহ্বানে তাদের উপর কি অপরিহার্য হয়ে পড়ে এবং যে শপথ তাঁরা তাঁদের প্রভুর নিকটে করেছেন তার কি দায়িত্ব তাঁদের উপর রয়েছে।'

রুকনিয়াতের শপথ ও স্থবিরতা

আমীরে জামায়াত বলেন, রুকনিয়াতের শপথ গ্রহণের পর যাঁরা স্থবির হয়ে পড়েন, খোদার কাছে গোলামীর শপথ তাজা করার পর যাঁরা পূর্বের মতোই শীতল, প্রাণহীন, স্থবির ও নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে থাকেন, তাঁদের কাছে আরয এই যে, যদি আপনাদের এটাই করার ইচ্ছা ছিল, তাহলে এ হতভাগ্য জামায়াতটিকে খারাপ করার কি প্রয়োজন ছিল? এমনি জামায়াত থেকে বেরিয়ে যাওয়া লোকদের ব্যাপারও চিন্তার বিষয়। পরিতাপের বিষয় অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশই জামায়াত থেকে পৃথক হওয়ার সাথে সাথেই পশ্চাদগামী হয়ে পড়েছেন এবং দ্বীনদারীর ন্যূনতম দাবী পূরণ থেকেও দূরে সরে গেছেন, যার শপথ তাঁরা মুসলমান হিসেবে করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে এমনও আছেন যাঁরা সাধারণ নৈতিক দায়িত্ব থেকেও বেপরোয়া হয়েছেন। আমীরে জামায়াত তাঁদের এ আচরণে অত্যন্ত বেদনা বোধ করেন। তিনি বলেন, দুঃখের বিষয়, আমাদের মধ্যে যাঁরা ধর্মীয় প্রেরণা রাখেন, তাঁরাও দ্বীনদারী এবং ব্যবসাসুলভ দ্বীনদারীর পার্থক্য বুঝতে পারেন না।

www.pathagar.org

অনেকে হয়তো এ জামায়াতের রুকনিয়াতকে অন্যান্য দলের রুকনিয়াতের মতোই মনে করেছেন যে, লোক সামান্য একটু আকর্ষণেই শামিল হয়ে যায় এবং অপছন্দের সামান্য কারণ ঘটলেই বেরিয়ে যায়। যেন দ্বীন ও ঈমানের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। এখানে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামী বিপ্লবের জন্যে একত্র হওয়া, এ কাজে শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যে শামিল হওয়া এবং তারপর বিনা কারণে এ কাজ ছেড়ে দেয়া জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থেকে সরে পড়ার নামান্তর মাত্র। এ বড় কঠিন পরীক্ষার বিষয় যে, দাওয়াতে দ্বীনকে লোক সত্যও মনে করবে এবং তাকে অবহেলাও করবে। এতে করে খোদার গযব ডেকে আনা হয়।

কর্মীদের গুণাবলী

দাওয়াতে দ্বীনের কাজ যারা করে, তাদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা বলেন, সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে, প্রবৃত্তিকে খোদার কাজের জন্যে বশীভূত করা। এ হলো জিহাদ বিন্নাফসের (মনের সাথে জিহাদ) বড় কঠিন কাজ। এ মানুষের আভ্যন্তরীণ জিহাদ। তারপর আসে হিজরতের পর্যায়। যখন লোক খোদার নাফরমানী থেকে পলায়ন করে তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টিলাভের দিকে আসে, নবী (সঃ)-এর নির্দেশিত কাজকর্ম নিয়মিত করতে থাকে, প্রকাশ্য ও গোপনে খোদাকে ভয় করে, যে বঞ্চিত করে, তাকে দেয়, সর্বদা সুবিচারের কথা বলে, যে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, নীরবে চিন্তাভাবনা করে, কথাবার্তায় খোদাকে ইয়াদ করে এসবই হিজরতের তাৎপর্য। জামায়াতের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে আমীরে জামায়াত বলেন, এ জিহাদের অপরিহার্য পরিণাম ফল ত্যাগ ও কুরবানী, মনের নিবিষ্টতা, সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করার অভ্যাস। উপরন্তু ভবিষ্যত বংশধর, মহিলা সমাজ এবং জনসাধারণের মধ্যে দাওয়াত ছড়াবার কাজের প্রতিও দৃষ্টি রাখতে হবে।

মুবাল্লিগের সর্বোৎকৃষ্ট কাজ

সাতাশে মার্চ সকালে, দ্বিতীয় অধিবেশনে রিপোর্ট ও পর্যালোচনার কাজ করা হয়। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী কিছু মূল্যবান কথা বলেন। তিনি তাবলীগ করার অসুবিধা ও তার সমাধান পেশ করে বলেন, সাহিত্য পরিবেশন এবং বক্তৃতার চেয়ে অনেক সময় মুবাল্লিগের সত্যিকার আমল তাবলীগের ফলপ্রসূ কাজ করে। দাওয়াতের কাজে নিজেরাই যেন প্রতিবন্ধক না হই। সত্য পথে আছি এ গর্ব-অহঙ্কার যেন আমাদেরকে পেয়ে না বসে। গর্বের পরিবর্তে বিনয়, রাগের পরিবর্তে সহানুভূতি, হিংসার পরিবর্তে ভালোবাসা- এ সবের দ্বারাই সত্যলাভের অনুভূতি সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিপক্ষের বিরোধিতার উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাদের উপর আঘাত করার পরিবর্তে সহানুভূতি ও দরদ প্রকাশ করতে হবে। মতবিনিময়ে হার-জিতের কথা চিন্তা করা উচিত নয়। আম্বিয়া কেরামের দাওয়াতী

www.pathagar.org

কাজের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তাড়াহুড়া করার প্রবণতা পরিহার করতে হবে। এতে অনেক নেক কাজ নষ্ট হয়ে যায় এবং শয়তানের কাজের সহায়ক হয়। দাওয়াতের কাজে মৌলিক বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ছোটখাটো বা খুঁটিনাটি বিষয় উপেক্ষা করতে হবে। তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের প্রতিই অত্যধিক গুরুত্ব দিতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে এসবের ধারণাই বদ্ধমূল করবার চেষ্টা করতে হবে।

কাইয়েমে জামায়াত নিয়োগ

পরবর্তী অধিবেশনে কাইয়েমে জামায়াতের নিয়োগের প্রস্তাব পেশ করা হয়। মালিক নাসরুল্লাহ খান আযীমের প্রস্তাবক্রমে আমীরে জামায়াত ১৯৪৪ সালের ১৭ই এপ্রিল থেকে মিয়া তুফাইল মুহাম্মদকে পরীক্ষামূলকভাবে কাইয়েমে জামায়াত (জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল) নিয়োগ করেন।[১] অতঃপর নিম্নলিখিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

১। গবেষণা কাজের জন্যে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন।

২। কোন উপযুক্ত স্থানে কেন্দ্রীয় জামায়াত স্থানান্তর।

৩। শিশুদের জন্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

৪। বায়তুলমাল শক্তিশালীকরণ।

৫। মজুর ও কর্মচারীদের অধিকার নির্ণয়।

৬। আরবী ভাষায় কথোপকথনের অভ্যাস সৃষ্টি।

৭। মৌলিক শিক্ষার জন্যে পাঠ্যসূচি তৈরী।

---

১. মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ পাটিয়ালা রাজ্যের একজন উদীয়মান আইনজীবী ছিলেন। তিনি বিয়ের পর নতুন শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে জামায়াত গঠনের উদ্দেশ্যে লাহোরে আহূত সম্মেলনের কথা জানতে পারেন। অতঃপর তিনি ১৯৪১ সালের ২৬শে আগস্ট প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি আলোচনা শুনার পর জামায়াতে যোগদানের অভিলাষ ব্যক্ত করেন। তিনি কোটপেন্ট, নেকটাই ও হ্যাট পরিহিত অবস্থায় যোগদান করেন। আলেমগণ তাঁর মত একজন ফিরিঙ্গী পোশাক পরিহিত লোককে জামায়াতে গ্রহণ করতে প্রবল আপত্তি জানান। কিন্তু বিচক্ষণ ও দূরদর্শী মাওলানা তাঁর মধ্যে বিরাট প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও যোগ্যতার নিদর্শন দেখতে পান। তিনি বলেন, তাঁকে এ শর্তে নেয়া যেতে পারে যে, ছয় মাসের ভেতর তাঁর মধ্যে বাঞ্ছিত পরিবর্তন হতে হবে। এতে সকলেই সম্মত হন। তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই ওকালতি পেশা পরিত্যাগ করেন এবং তার মধ্যে বিপ্লবী পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি আন্দোলনের প্রথম সারির কর্মীতে পরিণত হন। কাইয়েমে জামায়াত নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে ১৯৭২ সালে আমীরে জামায়াতের অবসর গ্রহণ কাল পর্যন্ত তিনি দক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন এবং ছায়ার মতো আমীরে জামায়াতের অন্তরঙ্গ সাথী হিসেবে আন্দোলনের কাজ করেন। তিনি ১৯৭২ সালে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর নির্বাচিত হন। কয়েক বছর দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করার পর স্বাস্থ্যগত কারণে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় জামায়াতের গবেষণা কেন্দ্রের দায়িত্বে রয়েছেন।

www.pathagar.org

দিল্লী সম্মেলন

উত্তর ভারতের সম্মেলনের পর মধ্যভারতের সম্মেলন ১৯৪৪ সালের ২৩শে ও ২৪শে এপ্রিল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে দিল্লী, ইউপি, ভূপাল এবং মধ্যভারতের রুকনগণ যোগদান করেন। এ সম্মেলনের পরিচালক ছিলেন জনাব আবদুল জাব্বার গাজী। তিনি সে সময়ে অ্যাংলো, এরাবিক, দারিয়াগঞ্জ, দিল্লী-এর হেড মাস্টার ছিলেন। সকল রুকনের সম্মেলনে উপস্থিত অপরিহার্য ছিল। ১৫০ জন রুকন যোগদান করেন। বিহার থেকে মাওলানা মাসউদ আলম নদভী, হাজী মুহাম্মদ আলী মালাবারী এবং সাইয়েদ হুসাইন জামেয়ী। পাঞ্জাব থেকেও কয়েকজন যোগদান করেন। এ সম্মেলনে মোট তিনটি অধিবেশন হয়।

মাওলানা মওদূদী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ঐসব কথারই পুনরাবৃত্তি করেন যা দারুল ইসলাম সম্মেলনে বলেছিলেন। স্থানীয় জামায়াতের শৃঙ্খলার শিথিলতা, অবহেলা এবং বাঞ্ছিত মানে উত্তীর্ণ না হওয়ার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন যে, রুকনদের মধ্যে একাগ্রতার অভাব রয়েছে। একামাতে দ্বীনের জন্যে নিছক ব্যক্তিগত সংস্কারই যথেষ্ট নয়। তার জন্যে প্রয়োজন সৎলোকের একটি সুসংগঠিত দলের। তাযকিয়ায়ে নফ্স (আত্মশুদ্ধি), পারস্পকি মতানৈক্য দূরীকরণ, মুনাফেকী থেকে বাঁচার উপায়, ওয়াদা পূরণের গুরুত্বের উপর আমীরে জামায়াত বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে প্রস্তাব, পরামর্শ, কাজের কর্মসূচি গ্রহণ এবং কিছু হেদায়েত দানের পর সম্মেলন সমাপ্ত হয়। আমীরে জামায়াত সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ রওয়ানা হন।

হায়দরাবাদ সম্মেলন

আল্লাহ তায়ালার খাস রহমতে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে জামায়াতের অগ্রগতি সাধিত হতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে সম্মেলন, কাজের রিপোর্ট গ্রহণ ও তার পর্যালোচনা এবং কর্মীদের ব্যাপক তরবিয়ত ক্রমবর্ধমান আকারে চলতে থাকে।

তেতাল্লিশের শেষে জামায়াতের কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হয় যে, হায়দরাবাদ বিভাগের মজলিসে শূরার অনুরোধক্রমে হায়দরাবাদে তিনদিনব্যাপী এক আঞ্চলিক সম্মেলন হবে, যেখানে আমীরে জামায়াত অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ যোগদান করবেন। এ সম্মেলন ১০ই নভেম্বর থেকে শুরু হবে।

এ সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য এই যে, হায়দরাবাদের আওরংগবাদে মাওলানার জন্ম এবং এখানেই তিনি লালিত-পালিত ও বর্ধিত। উপরন্তু হায়দরাবাদ থেকেই তর্জুমানুল কুরআনের মাধ্যমে তিনি ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করেন এবং ১৯৩১ সালের

www.pathagar.org

মাঝামাঝি সময় থেকে প্রায় সাত বছর তিনি এখান থেকেই আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। এদিক দিয়ে হায়দরাবাদ ছিল ইসলামী আন্দোলনের লালনাগার। এ কারণে এ সম্মেলন ছিল বহু দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হায়দরাবাদে জামায়াত কর্মী ছাড়াও মাওলানার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং বহু গুণগ্রাহী ছিলেন যাঁদের হক আদায়ের জন্য এ সম্মেলন জরুরী ছিল।

এ সম্মেলন আসকনগরে, উজির সুলতান সাহেবের গৃহ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এবং বোম্বাই, আহমদাবাদ, কাথিয়াওয়ার, মালাবার, মাদ্রাজ, মহীসুর, কর্নাটক, তেলেংগানা প্রভৃতি অঞ্চলসমূহ থেকে রুকন, কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষী সম্মেলনে যোগদান করেন।

মাওলানার উদ্বোধনী ভাষণ

মাওলানা তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে মুসলমানদের অতীত ইতিহাসের উপর ধারাবাহিক আলোচনা করেন এবং কিভাবে ক্রমশ তারা বর্তমানের অধঃপতিত অবস্থায় পৌঁছে তার কারণ বিশ্লেষণ করেন। অতঃপর ইসলামী আন্দোলনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করার পর ইসলামী দল গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করেন।

উদ্বোধনী ভাষণের পর কাইয়েমে জামায়াত, কেন্দ্রীয় রিপোর্ট পেশ করেন। অতঃপর এক এক করে আঞ্চলিক রিপোর্ট পেশ করা হতে থাকে। রিপোর্টের পর্যালোচনা আমীরে জামায়াত নিজেও করেন এবং তাঁর নির্দেশে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীও করেন।

সম্মেলনে কেন্দ্র থেকে আমীরে জামায়াতের সাথে কাইয়েম মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ, মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, মালিক নাসরুল্লাহ খান আযীয (তৎকালীন 'মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক), জনাব আব্দুল জাব্বার গাজী, সাইয়েদ আব্দুল আযীয শার্কী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন।

এ সম্মেলনে আমীরে জামায়াত দু'দিন তাঁর হৃদয়গ্রাহী ভাষায় কুরআনের দারস পেশ করেন এবং দারসে হাদীস পেশ করেন মাওলানা সিবগাতুল্লাহ বখতিয়ারী ও শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল।

এখানে হায়দর গোড় ময়দানে রাতে এক জনসভায় মাওলানা বক্তৃতা করেন। প্রায় সাতশ লোক সভায় যোগদান করেন এবং গভীর তন্ময়তার সাথে মাওলানার ভাষণ শ্রবণ করেন। মাওলানা তাঁর ভাষণে বলেন, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে একটি অতি উত্তম উম্মতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন এবং তাদের কাজই হলো দুনিয়ার বুক থেকে সকল প্রকার অনাচার, অকল্যাণ নির্মূল করে সার্বিক কল্যাণ ও পরিপূর্ণ ইনসাফ কায়েম করা। এভাবেই মানব জীবনের

www.pathagar.org

সকল ক্ষেত্রে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে তিনি জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন।

হায়দরাবাদ শহরের জনসভা সকল দিক দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হয়। সম্মেলন শেষে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত মেহমানগণ বিদায় গ্রহণ করেন। কিন্তু মাওলানা কয়েক দিন হায়দরাবাদ অবস্থানের সিদ্ধান্ত করেন। তিনি কেন্দ্রীয় সঙ্গী-সাথীসহ নিযামিয়া হোটেলে উঠেন। তিনি তাঁর বড় ভাই সাইয়েদ আবুল খায়ের মওদূদীর সাথেও মিলিত হন। হায়দরাবাদের বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর সম্মানে ডিনার বা খাবার আয়োজন করেন। খানায় আমন্ত্রণকারীগণের মধ্যে জনাব গোলাম মুহাম্মদ, অর্থমন্ত্রী এবং নবাব বাহাদুর ইয়ারজং বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব আমন্ত্রণে শহরের প্রভাবশালী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীগণ এবং মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলেমীনের মজলিসে আমেলার (Working Committee) প্রায় সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

গোলাম মুহাম্মদ ছিলেন চরম মুসলিম জাতীয়তাবাদী। তিনি ইংরেজদের অধীন সরকারী চাকরীগুলোতে হিন্দুদের মুকাবিলায় মুসলমানদেরকে অগ্রাধিকার দান করতেন। মাওলানার সম্মানে তাঁর প্রদত্ত ডিনারে (ভোজ সভায়) তিনি মাওলানার প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন ও মতবিনিময় করেন। তিনি মাওলানাকে একটা টাইপ রাইটার উপহার দেন এবং শ্রীপুর কাগজের কারখানা থেকে তর্জুমানুল কুরআনের জন্য প্রচুর পরিমাণে কাগজের ব্যবস্থা করে দেন।

পরম পরিতাপের বিষয়, দশ বছর পর সেই গোলাম মুহাম্মদ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারী করে মাওলানার মৃত্যুদণ্ড দানের পথ সুগম করেন।

মাওলানাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে নবাব মাহমুদ ইয়ার জংও এক ডিনারের আয়োজন করেন। বেগম মাহমুদ ইয়ার জং জামায়াতের রুকন ছিলেন এবং ইসলামী আন্দোলনের জন্য তিনি প্রশংসনীয় কাজ করেন। এ ডিনারেও মাওলানার বহু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং বিশেষ করে উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ মীর আলাউদ্দীন উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.org

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামী সম্মেলন

পাঠানকোটে অনুষ্ঠিত উত্তর ভারতীয় অঞ্চলের সম্মেলনের পর সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে, এখন সমগ্র দেশের রুকনদের একটি সম্মেলন ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে দারুল ইসলাম পাঠানকোটে অনুষ্ঠিত হবে। তদনুযায়ী ১৯, ২০ ও ২১শে এপ্রিল, ১৯৪৫ সালে দারুল ইসলামে প্রথম নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলন হয়। এতে সারাদেশের রুকনদের উপস্থিতি অপরিহার্য ছিল। আটশ' জনেরও অধিক রুকন সম্মেলনে যোগদান করেন। এমন বিরাট সংখ্যক লোকের মসজিদে, জামায়াত অফিসে, অন্যান্য বাসগৃহে, ক্যাম্পে ও শামিয়ানার নিচে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। লাউড স্পীকার এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও করা হয়। যুদ্ধের সময় ছিল বলে আটা, চিনি, মওসুমের উপযোগী বিছানাপত্র এবং খাবারের থালা, বাটি, গ্লাস সাথে করে আনতে বলা হয়েছিল। অংশগ্রহণকারী রুকনগণ এ নির্দেশ পুরোপুরি পালন করেন।

উনিশে এপ্রিল বৃহস্পতিবার বাদ যোহর সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দারুল ইসলাম মসজিদে।

আমীরে জামায়াতের উদ্বোধনী ভাষণ

আমীরে জামায়াত তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, জামায়াত প্রতিষ্ঠার সময়ে প্রতি বছর রুকন সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও তা করা যায়নি এবং চার বছর পর করা হচ্ছে। তার জন্যে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সম্মেলন করতে না পারার সবচেয়ে বড়ো কারণ হলো মহাযুদ্ধ কালীন দেশে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। এখন জামায়াতের অবস্থার পর্যালোচনা করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে বলে এ সম্মেলন করতে হচ্ছে।

তাঁর ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

১। আমার ডাকে সাড়া দিয়ে আপনারা যেমন আমার শক্তি বৃদ্ধি করেছেন, তেমনি আপনাদের নিজেদের শক্তিও বৃদ্ধি করেছেন।

২। আপনাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি যতোটা আন্তরিক ভালোবাসা বাড়তে থাকবে এবং এ ভালোবাসার জন্যে যতোটা নিজেকে বিলিয়ে দেবেন ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যতোটা আনুগত্য করবেন, ততোবেশী আপনাদের কেন্দ্র শক্তিশালী হবে এবং তার সাথে জামায়াতের শক্তিও বেড়ে যাবে।

www.pathagar.org

৩। আমি খুবই আনন্দিত যে, আমাদের জামায়াতে ব্যক্তিপূজা ও মানসিক গোলামীর অস্তিত্ব নেই। বরঞ্চ প্রত্যেকের মধ্যে সমালোচনার প্রবল প্রবণতা রয়েছে এবং সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, আপনাদের সমালোচনার দৃষ্টি আমার প্রতিও নিবদ্ধ হয়ে আছে। তবে মনে রাখবেন, আপনাদের সমালোচনার দৃষ্টি যেমন আমার প্রতি রয়েছে আর তা রাখা যেমন আপনাদের ফরয, তেমনি আপনাদের উপরেও আমার সমালোচনার দৃষ্টি রয়েছে এবং তা রাখাও আমার ফরয।

৪। আনুগত্য দানে, নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার ব্যাপারে এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত খেদমত আঞ্জাম দেয়ার ব্যাপারে আপনাদের মধ্যে যতটা দুর্বলতা দেখা যায়, আমি ততোটা নিজকে অসহায় মনে করি। আমার মনে হয় যে, আমি এমন সব বন্দুক ব্যবহার করছি যার ঘোড়া টিপলেও গুলী বেরোয় না। পক্ষান্তরে যখন আমি দেখি যে, একটি ডাকেই আপনাদেরকে একত্র করা যায়, একটি ইশারায় আপনারা কাজ শুরু করেন এবং নিজেদের মনের আকর্ষণেই এ কাজ করতে থাকেন, যা আপনাদের উপর অর্পিত হয়েছে, তখন আমার মনে শক্তি সঞ্চারিত হয়, সাহস বাড়তে থাকে।

৫। যে কাজে আমরা হাত দিয়েছি, অর্থাৎ নৈতিক মূলনীতির ভিত্তিতে দুনিয়ার সংস্কার-সংশোধন করা এবং দুনিয়ার আইন-শৃঙ্খলার পরিবর্তন-সংশোধন করা, তার দাবী এই যে, নৈতিক দিক দিয়ে আমরা আমাদের নিজেদেরকে দুনিয়ার সবচেয়ে সৎ বলে প্রমাণ করে দেখাব। যদি দুনিয়ার মানুষ দেখে যে, আমাদের সম্মেলনে বিশৃঙ্খলা রয়েছে, আমাদের সমাবেশে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, আমাদের থাকার জায়গাগুলো রুচিহীনতা ও অভদ্রতার দৃশ্য পেশ করছে, যেখানেই আমরা খেতে বসি তা নোংরা ও বিশ্রী হয়ে যায়, যেখানে আমরা আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শের জন্য জমায়েত হই, সেখানেই হাসি-ঠাট্টা থেকে শুরু করে হৈহল্লা ও ঝগড়াঝাটি হয় এবং নীতি বিরুদ্ধ আচরণ প্রদর্শন করা হয়, তাহলে আমরা যে সংস্কার করতে চাই দুনিয়াবাসী তার থেকে খোদার আশ্রয় চাইবে। তারা অনুভব করবে যে, দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা যদি এ সব লোকের হাতে আসে, তাহলে তারা সারা দুনিয়াকে ঠিক তেমনিই করে ছাড়বে যেমনটি তারা রয়েছে।

৬। যেখানেই আপনারা একত্রে সমবেত হবেন, আপনাদের আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। কেউ যেন তার জিনিসপত্র ও লটবহর দেখাশুনার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন বোধ না করে। কারো কিছু কোথাও পড়ে গেলে যেন সেখানেই তা দেখতে পায়। কোথাও কোন দোকান বা স্টল থাকলে বিক্রেতা ছাড়াই যেন জিনিসপত্র ঠিকমতো বিক্রি হতে থাকে।

www.pathagar.org

৭। যখন জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আপনারা আমাকে আমীর নির্বাচিত করেন, তখন আমি ওয়াদা করেছিলাম যে, প্রত্যেক সম্মেলনে আমি ঘোষণা করব, আমার থেকে যোগ্যতর কোন লোক পাওয়া গেলে তাঁর জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে আমি প্রস্তুত থাকব। আপনারা তাঁকে আমীর নির্বাচিত করবেন। তারপর এই প্রথম রুকন সম্মেলন হচ্ছে এবং আমি আমার ওয়াদা অনুযায়ী ঘোষণা করছি যে, আপনারা যাঁকে খুশী আপনাদের আমীর নির্বাচিত করুন। আমিতো অবশ্যই চাই যে, অন্য কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করুক এবং আমি তাঁর আনুগত্য করে দেখিয়ে দিই, আমীরের আনুগত্য কিভাবে করা উচিত। কিন্তু আমার এ ঘোষণার এ অর্থ কেউ নেবেন না যে, আমি স্বয়ং পশ্চাদপসরণ করছি এবং এ দায়িত্ব এড়াতে চাচ্ছি। আমার ইচ্ছা শুধু এই যে, আমি না এ পদের জন্যে কোন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, না কোন যোগ্যতর ব্যক্তির এ পদলাভে প্রতিবন্ধক হই, আর না আমি আমার নিজেকে এ আন্দোলনের উন্নতি এবং জামায়াতের কল্যাণের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করতে চাই।

৮। বিগত তিন বছরের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে যদি কারো কোন অভিযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে, কারো হক আদায় অথবা কারো প্রতি ইনসাফ করার ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে, অথবা কেউ যদি আমার কাজে কোন ভুল পেয়ে থাকেন, তাহলে বিনা দ্বিধায় তা বলে ফেলুন, তা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছেও বলতে পারেন অথবা গোটা জামায়াতের সামনেও। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে কাউকে বাধাও দেব না এবং আমার ভুলত্রুটি স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত হবো না। আমার সংশোধনে অথবা ন্যায্য অভিযোগের পর তা সংশোধন করতে আমি তিল পরিমাণ ইতস্তত করব না। অবশ্য কোন অভিযোগ যদি ভুল বুঝাবুঝির ভিত্তিতে হয়, তাহলে তা পরিষ্কার করে দেব, যাতে করে এ কাজে আমার এবং জামায়াত কর্মীদের মধ্যে কোন তিক্ততা বাকী না থাকে।

আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদীর এ উদ্বোধনী ভাষণের পর কাইয়েমে জামায়াত (জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল) মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ সাহেব জামায়াত প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ সম্মেলন পর্যন্ত সময়ের বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন।

জামায়াতে ইসলামী ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত

রিপোর্টের সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

১। জামায়াত প্রতিষ্ঠার সময় রুকন সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৫ জন। মার্চ ১৯৪৫ পর্যন্ত রুকন সংখ্যা হয় সাড়ে সাত শত।

২। সুষ্ঠু সংগঠনের জন্যে ১৭ই এপ্রিল ১৯৪৪ সালে সাংগঠনিক বিভাগ খোলা হয় এবং মিয়া তুফাইল মুহাম্মদকে প্রথম কাইয়েমে জামায়াত নিযুক্ত করা হয়।

www.pathagar.org

৩। ১৯৪৪ পর্যন্ত ৩৭টি স্থানীয় জামায়াত গঠিত হয়। ৬টি কার্যত শেষ হয়ে যায় এবং সেগুলোকে তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়।

৪। রুকনদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিষ্ক্রিয় রুকনদেরকে জামায়াত বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয় এবং মোট সাড়ে তিনশ' জনের রুকনিয়াত অক্ষুণ্ন থাকে।

৫। রিপোর্ট প্রণয়ন পর্যন্ত স্থানীয় জামায়াতের মোট সংখ্যা হয় তিপ্পান্ন।

৬। অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জামায়াতে অংশগ্রহণের মান একটু উন্নততর করা হয় এবং পদপ্রার্থীর মুদ্দৎ দীর্ঘায়িত করা হয়।

৭। পাঞ্জাবের প্রায় সকল জেলায়, হায়দরাবাদ রাষ্ট্র ও মাদ্রাজের অধিকাংশ অঞ্চলে, ইউপি ও বিহারের বিভিন্ন জেলায়, কিছু পরিমাণে বোম্বে, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশে জামায়াতের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। বাংলায় শুধু কোলকাতা শহরে কিছুটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

৮। জামায়াতের প্রতি যাঁরা আকৃষ্ট হন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ইংরেজী শিক্ষিত। মাদ্রাসা শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম।

৯। অমুসলমানদের মধ্যে কিছু প্রভাব বিস্তার করে থাকলেও তা ছিল মামুলি ধরনের। কারণ এ ব্যাপারে মুসলমানদের আচার-আচরণই ছিল বড়ো বাধা। তার সাথে ছিল জাতীয় ও বংশীয় বিদ্বেষ।

১০। দ্বীনি ও রাজনৈতিক দলগুলো জামায়াতের প্রতি নারাজ হলেও ক্রমশ তাদেরকে জামায়াতের পরিভাষাগুলো ব্যবহার করতে বাধ্য হতে দেখা যাচ্ছে।

১১। জামায়াত সাহিত্যের চাহিদা অত্যন্ত বেড়ে যায়। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার জন্যে বইপুস্তক প্রকাশ করে পরিবেশন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে।

১২। দুঃখের বিষয় এই যে, আলেমদের পক্ষ থেকে বিরোধিতা করা হচ্ছে এবং তা অধিকাংশ বিনা যুক্তি-প্রমাণে।

১৩। কর্মঠ লোকের স্বল্পতা এবং শিক্ষা শিবির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বায়তুলমালে অর্থের অভাবই কাজের মন্থর গতির কারণ।

১৪। জামায়াতের কতিপয় রুকনকে ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যেমন-

(ক) কিছু সংখ্যক ছাত্রকে তাদের পিতা বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।

(খ) কিছু সংখ্যক পিতাকে তাদের ছেলেরা মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।

(গ) কতিপয় নারীকে তাদের স্বামী প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখেছে অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্ক মুলতবী রাখা হয়েছে।

www.pathagar.org

(ঘ) কতিপয় পুত্রের কাছে তাদের পিতা ঐসব অর্থ দাবী করছে যা তাদের লেখাপড়ায় ব্যয় করেছে।

(ঙ) কতিপয় লোককে তাদের সহোদর ভাই উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দিয়েছে এবং নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করেছে।

১৫। অন্যান্য ভাষাও জামায়াতের সাহিত্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শুধু উর্দু ভাষার উপর ভিত্তি করে এ বিশ্বব্যাপী আন্দোলন চালানো সঠিক হবে না। এ ব্যাপারে নিম্ন পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়েছে।

(ক) মাওলানা মাসউদ আলম নদভীর দায়িত্বে জলন্ধরে 'দারুল আরাবিয়া' প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়েছে। কিছু বইয়ের আরবী তরজমার সাথে সাথে কিছু উচ্চমানের আরবী সাহিত্য তৈরীর ইচ্ছা আছে। আরবী ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশেরও পরিকল্পনা আছে।

(খ) 'দারুল ইসলামে' বসবাসরত তুর্কী মুহাজির জনাব আযম হাশেমী দ্বীনিয়াত ও খুৎবাতের তুর্কী ভাষায় তরজমা সম্পন্ন করেছেন। কাজ আরও চলছে।

(গ) মালাবারের মালয়ালম ভাষায় হাজী বি পি মুহাম্মদ আলী সাহেব দ্বীনিয়াত, খুৎবাত ও অন্যান্য কিছু বইয়ের তরজমা শেষ করেছেন। সত্বর প্রকাশের সম্ভাবনা আছে।

ঘ) মাদ্রাজের কথ্য তামিল ভাষায় তরজমার জন্যে শায়খ আবদুল্লাহ সাহেবকে তৈরী করা হয়েছে।

ঙ) গুজরাটী ভাষায় তরজমার কাজ ইসমাঈল এখলাস সাহেব শুরু করেছেন। খুৎবাতের কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছে। খুৎবাতের অবশিষ্টাংশ এবং সিয়াসী কাশমকাশের তরজমা সম্পন্ন হয়েছে।

চ) সিন্ধী তরজমার দায়িত্ব এলাহাবাদ জামায়াত গ্রহণ করেছে। শন্তিপথ তরজমা হয়ে গেছে। সত্বর আরও কিছু তরজমা আশা করা যায়।

ছ) জামায়াতের অজ্ঞাতেই সিন্ধী ভাষায় দ্বীনিয়াতের তরজমা হয়েছে। এখন রীতিমতো তরজমার কাজ শুরু করার ইচ্ছা আছে।

জ) জনৈক রুকনে জামায়াত কুরআনের চার মৌলিক পরিভাষার ইংরেজী তরজমা শুরু করেছেন। ইংরেজী ভাষায় উচ্চাঙ্গের তরজমার জন্যে উপযুক্ত লোকের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে।

১৬। কেন্দ্রীয় প্রকাশনীর পক্ষ থেকে 'কুরআন কি চার বুনিয়াদী ইস্তিলাহেঁ, ইসলামী ইবাদত পর তাহকীকী নযর, 'হাকীকাতে তাওহীদ' এবং 'দাওয়াতে ইসলামী কা তরীকে কার' প্রকাশনার পথে (যন্ত্রস্থ)।

www.pathagar.org

১৭। প্রদেশগুলোতে পৃথক পৃথক কাইয়েম নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিহারে সাইয়েদ মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব এবং দক্ষিণ ভারতে সাইয়েদ সিবগাতুল্লাহ বখতিয়ারী সাহেবকে ঐ অঞ্চলের রুকনদের সাথে পরামর্শক্রমে কাইয়েম নিযুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলে এ ব্যবস্থাপনা নির্ভর করছে উপযুক্ত লোক ও উপায়-উপাদানের উপর।

১৮। কেন্দ্রে শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী ও আব্দুল জাব্বার গাজী সাহেব এসেছেন। আরও কিছু অসুবিধা আছে। তা দূর হলেই দারসগাহ বা শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ সাহেবের রিপোর্ট পাঠের পর মাওলানা মওদূদী আমীর জামায়াতে ইসলামী ভাষণ দান করেন। ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল দাওয়াতে ইসলামী ও তার কর্মপদ্ধতি। ভাষণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও নম্র ভাষায় দেয়া হয় এবং তার বিরাট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভাষণের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপ ঃ

মাওলানা বলেন-

১। বন্দেগানে খোদা দিন দিন অধিক সংখ্যায় আমাদের দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে দেখে আমাদের মন কৃতজ্ঞতার ভাবাবেগে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। তাঁদের এ আকর্ষণ অবশ্য হকের প্রতি। কারণ হক ব্যতীত আমাদের কাছে আকৃষ্ট করার আর কোন বস্তুই নেই।

২। আমাদের দাওয়াত সম্পর্কে সাধারণত এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, আমরা হুকুমতে এলাহিয়া প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাই। ..... এ ধারণা থেকে সতর্কতার সাথে এ অর্থ বের করা হয় যে, আমরা শুধু শাসন ক্ষমতা হস্তগত করতে চাই। অথচ যদি কেউ খোলা মনে আমাদের সাহিত্য পাঠ করে, তাহলে তার কাছে এ কথা সহজেই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আমাদের লক্ষ্য শুধুমাত্র একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই নয়, বরঞ্চ আমরা চাই যে, গোটা মানব জীবনে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনে এমন এক সর্বব্যাপী বিপ্লব সাধন হোক যা ইসলাম করতে চায় এবং যার জন্যে আল্লাহ তায়ালা নবীগণকে প্রেরণ করেছিলেন। যার দাওয়াত দেওয়ার এবং সংগ্রাম করার জন্যে নবীগণের নেতৃত্বে মুসলিম উম্মাহর নামে একটি দল সর্বদাই গঠিত হতে থাকে।

আমাদের দাওয়াত তিনটি দফায় দেয়া হয় ঃ

(ক) আমরা সাধারণত সকল বন্দেগানে খোদাকে এবং বিশেষ করে মুসলমানদেরকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম শাসন মেনে চলার দাওয়াত দিই।

www.pathagar.org

(খ) যে ব্যক্তি এ দাওয়াত কবুল করে, তার কাছে আমাদের দাবী এই যে, সে যেন তার জীবনে মুনাফেকী এবং কথা ও কাজের বৈষম্য দূর করে। আর যখন সে একজন মুসলমান অথবা মুসলমান হতে চায়, তখন তাকে সত্যিকারে মুসলমান হতে হবে এবং ইসলামের রঙে রঞ্জিত হয়ে সে একনিষ্ঠ হয়ে যাবে।

(গ) জীবন ব্যবস্থা বাতিলপন্থী, পাপাচারী ও খোদাদ্রোহীদের হাত থেকে নিয়ে আদর্শিক ও বাস্তব উভয় দিক দিয়ে মুমেনীন-সালেহীনের হাতে ন্যস্ত করতে হবে।

৩। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এ দাওয়াতের প্রতি নাসিকা কুঞ্চিতকারী, তাকে নিজের জন্যে আশঙ্কাজনক মনেকারী এবং তার প্রতিবন্ধকতায় অগ্রগামী হয়ে সংগ্রামকারী অমুসলমান নয়, বরঞ্চ মুসলমান।

৪। এমন অনেক অমুসলমানকে দেখেছি যাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে একথা বলেছেন, আহা যদি এই ইসলামই ভারতের বুকে পেশ করা হতো এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যারা বাইর থেকে এসেছিলেন এবং এখানে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা যদি চেষ্টা করতেন, তাহলে ভারতের চিত্র অন্য রকম হতো এবং এ দেশের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো।

৫। নবী (সঃ) একদিকে বাতিলের সংমিশ্রণ থেকে আলাদা করে, খাঁটি সত্যকে একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পেশ করেন এবং অপরদিকে তিনি এটাও চেয়েছিলেন, যে তাওহীদকে আমরা সত্য বলে মনে করি তার বিপরীত উপাদানগুলোকে আমরা আমাদের জীবন থেকে বের করে দিই। অতঃপর গোটা জীবন ব্যবস্থাকে সে তাওহীদের ভিত্তিতে গড়ে তুলি। উপরন্তু যে মূলনীতি ও নৈতিকতাকে আমরা কষ্টিপাথর বলে স্বীকার করি আমাদের গোটা জীবন ব্যবস্থাকে সে মূলনীতির উপর বাস্তবে কায়েম করি। ..... আমাদের এ দাওয়াতের ফলেই চারদিক থেকে বিরোধিতার ঝড় উত্থিত হয়।

৬। বিরোধিতার এটাই কারণ যে, যখন আমরা দ্বীনে হক ও তার দাবীকে নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে পেশ করাকে যথেষ্ট মনে করি না, বরঞ্চ এ দাওয়াতও দিই যে, ভ্রান্ত ব্যবস্থার সাথে ওসব বুঝাপড়াও শেষ করে দাও যা তোমরা করে রেখেছ এবং পূর্ণ একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও একরূপতাসহ (Uniformity) সত্যের আনুগত্য অবলম্বন কর। অতঃপর এ বাতিলের স্থানে হক প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জানমাল, সময় ও শ্রমের কুরবানী কর, যার উপর তোমরা ঈমান এনেছ। এ অপরাধ এমন নয় যা উপেক্ষা করা যায়। অতএব চারদিক থেকে বিরোধিতার ঝড় সৃষ্টি করা হচ্ছে।

www.pathagar.org

৭। আমাদের দাওয়াতের মতো আমাদের কর্মপদ্ধতিও কুরআন মজীদ এবং নবীগণের কর্মপদ্ধতি থেকে গৃহীত। যারা আমাদের দাওয়াত কবুল করেন, তাদের কাছে আমাদের প্রাথমিক দাবী এই যে, "আপনি আপনার নিজকে পুরোপুরি রবের বন্দেগীতে উৎসর্গ করুন। নিজের আমল দ্বারা আপনার আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠার প্রমাণ দিন। তারপর নিজের জীবনকে ঐসব কিছু থেকে পাকপবিত্র করুন যা আপনার ঈমানের বিপরীত।" এখান থেকেই তাঁর চরিত্র গঠন ও অগ্নিপরীক্ষার ধারাবাহিকতা শুরু হয়।

৮। এ মতবাদ ও পথ কার্যত অবলম্বন করার সাথে সাথেই সে ব্যক্তির অতি আপনজন দুশমন হয়ে যায়। তার আপন লালনক্ষেত্র তার জন্যে মৌমাছি, ভিমরুলের চাকে পরিণত হয়। এ হচ্ছে প্রাথমিক তরবিয়তগাহ (প্রশিক্ষণক্ষেত্র) যা সৎ, একনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য কর্মী সৃষ্টি করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্যে স্বয়ং পয়দা করে দিয়েছেন। এ প্রাথমিক অগ্নিপরীক্ষায় যারা ব্যর্থকাম হয়, তারা আপনা-আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর যারা এতে সফলকাম হয়, তারা প্রমাণ করে দেয় যে, তার মধ্যে সম্ভবত এতোখানি আন্তরিকতা, একনিষ্ঠা, ধৈর্য, সংকল্প হকের জন্যে এতোটুকু ভালোবাসা, এতোটুকু মজবুত চরিত্র অবশ্যই বিদ্যমান আছে, যা খোদার পথে কদম রাখার জন্যে এবং ঈমানের প্রথম স্তর সাফল্যের সাথে অতিক্রম করার জন্যে অপরিহার্য..... শুধু এ পদ্ধতিতেই তৈরী করা তাকওয়ার মধ্যে এ শক্তি হতে পারে যার দ্বারা দুনিয়া পরিচালনার গুরুদায়িত্ব বহন করা যেতে পারে।

৯। আমাদের রুকনদের জন্যে অপরিহার্য যে, তাঁরা যে হকের আলো পেয়েছেন, তার দ্বারা তাদের আপন পরিবেশ, আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী প্রভৃতিকে আলোকিত করার চেষ্টা করবেন এবং তাদেরকে এদিকে আসার দাওয়াত দেবেন। এ তবলীগ থেকে আবার এক অগ্নিপরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। .... মুবাল্লিগের স্বীয় জীবন সংশোধিত হয়.... কারণ অসংখ্য সূক্ষ্মদৃষ্টি তার দিকে নিবদ্ধ হয়। মুবাল্লিগের স্বীয় জীবনে যদি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন বস্তু তার ঈমান ও দাওয়াতের পরিপন্থী বিদ্যমান থাকে, তাহলে অবৈতনিক ছিদ্রান্বেষী সমালোচক তাকে সুস্পষ্ট করে মুবাল্লিগের সামনে তুলে ধরে। তারপর ভর্ৎসনা করে মুবাল্লিগকে তার জীবনকে ঐ সব দোষ থেকে পাক পবিত্র করতে বাধ্য করে। যদি মুবাল্লিগ প্রকৃতপক্ষে খাঁটি মনে ঈমান এনে থাকে, তাহলে সে এসব সমালোচনায় বিরক্ত হবে না এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তার ত্রুটি লুকোবার চেষ্টাও করবে না। বরঞ্চ তাদের এ সমালোচনার সুযোগ গ্রহণ করে নিজের সংশোধন করবে। এটা ঠিক যে কোন বাসন, বাটি যদি বিশ হাতে মাজা শুরু করে এবং মাজতেই থাকে, তাহলে তা যতো অপরিষ্কার হোক না কেন, ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে যায়।

www.pathagar.org

১০। মুবাল্লিগকে নানা রকমের হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার ভেতর দিয়ে চলতে হয় ..... যে কর্মী সাহস হারায় না, হক থেকে সরে যায় না, বাতিলপন্থীদের কাছে নতি স্বীকার করে না, উত্তেজিত হয়ে মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে না.... বরঞ্চ সত্যিকার সত্যপন্থীর ন্যায় সহানুভূতি ও শুভাকাঙ্ক্ষাসহ আপন পথ ও মতের উপর অটল থাকে এবং আপন পরিবেশ সংশোধন করার অব্যাহত চেষ্টা করে, তাদের মধ্যে মহান গুণাবলী সৃষ্টি হওয়া এবং তা বিকাশ লাভ করার এ নিশ্চয়তা দান করে যে, ভবিষ্যতে আমাদের সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে এ সব গুণাবলী বিশেষ কাজে লাগবে।

১১। আপনারা বিজ্ঞতার সাথে এবং উৎকৃষ্ট উপদেশমূলক পন্থায় আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দিতে থাকুন। ক্রমান্বয়ে এবং স্বাভাবিক ক্রমধারার প্রতি লক্ষ্য রেখে লোকের সামনে প্রাথমিক মূলনীতিগুলো এবং তারপর ক্রমান্বয়ে সে সবের দাবী ও অপরিহার্যতা পেশ করুন। কাউকে তার হজমশক্তির অতিরিক্ত খোরাক দেবার চেষ্টা করবেন না। খুঁটিনাটি বিষয়গুলোকে মৌল বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেবেন না। মৌলিক দোষত্রুটি দূর না করে বাহ্যিক দোষত্রুটি দূর করার এবং বাইরের শাখা-প্রশাখা কাটা-ছাঁটার কাজে নিজের সময় নষ্ট করবেন না।

যারা ঔদাসীন্য, অবহেলা এবং বিশ্বাসমূলক ও বাস্তব গুমরাহীতে লিপ্ত, তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করার পরিবর্তে একজন চিকিৎসকের ন্যায়, সহানুভূতি ও শুভাকাঙ্ক্ষাসহ তাদের রোগ নিবারণের চেষ্টা করবেন। গালি ও ঢিল খাওয়ার জবাবে মঙ্গল কামনা করে দোয়া করা শিখুন। অত্যাচার-নির্যাতনে ধৈর্য ধরুন। অজ্ঞ লোকদের সাথে তর্কবিতর্ক ও ঝগড়া-ঝাটিতে লিপ্ত হবেন না। বেহুদা ও অসংলগ্ন কথা শুনলে উদারচেতা ও ভদ্রলোকের মতো তা উপেক্ষা করুন। যারা হক থেকে বেপরোয়া হয়ে রয়েছে, তাদের পেছনে লেগে থাকার পরিবর্তে তাদের দিকে মনোযোগ দিন, যাদের মধ্যে সত্যানুসন্ধিৎসা দেখতে পাওয়া যায়। ..... এ পদ্ধতিতে দাওয়াতের কাজ করেই সমাজের মধ্য থেকে প্রতিভাবান লোকদের বের করে আন্দোলনে লাগিয়ে দেয়া যেতে পারে..... এ পদ্ধতিতেই সমাজের সৎ ও মহত্তম ব্যক্তি আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং আন্দোলনের জন্যে মজবুত কর্মী পাওয়া যায়।

১২। আমাদের কর্মপদ্ধতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই যে, আমরা আমাদের নিজেদেরকে বাতিল নিযামের আইনানুগ ও বিচার বিভাগীয় রক্ষণাবেক্ষণ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছি এবং প্রকাশ্যে দুনিয়াকে বলে দিয়েছি যে, আমরা আমাদের মানবিক অধিকার, জান, মাল, ইযযত-আববরু প্রভৃতির নিরাপত্তার

www.pathagar.org

জন্যে এ ব্যবস্থার কোন সাহায্য নিতে চাই না যাকে আমরা বাতিল ও ভ্রান্ত মনে করি।

১৩। যখন আমরা বলি যে, খোদা ব্যতীত মানব জীবনের আইন প্রণয়নের অধিকার আর কারো নেই, যখন আমাদের দাবী এই যে, সার্বভৌমত্বের অধিকার একমাত্র খোদার এবং তাঁর আনুগত্য ও তাঁর আইন মেনে চলা ব্যতীত যমীনের উপর হুকম, শাসন করার অধিকার আর কারো নেই, যখন আমাদের বিশ্বাস এই যে, যে ব্যক্তি বা দল খোদায়ী আইনের সনদ ব্যতীত মানবীয় কাজ-কারবারের ফায়সালা করে, সে কাফের, ফাসেক ও যালেম, তখন এ অপরিহার্য হড়ে পয়ে যে, আমরা আমাদের অধিকারের বুনিয়াদ মানব রচিত আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত করব না এবং সত্য-অসত্য নির্ধারণের অধিকার এমন কোন সরকারের উপর ছেড়ে দিয়ে রাখব না যাকে আমরা বাতিল মনে করি।

১৪। আপনারা যদি হক ও বাতিলের ফায়সালার দায়িত্ব খোদার কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের পরিবর্তে মানুষের উপর অর্পণ করতে চান, তাহলে আপনারে এ পূর্ণ এখতিয়ার আছে যে, আপনাদের ভবিষ্যত মানুষের উপরই সোপর্দ করুন এবং খোদার কাছে এই বলে জবাব দেবেন আমরা আমাদের দ্বীন তোমার কিতাব ও তোমার রসূলের সুন্নাতের পরিবর্তে অমুক ব্যক্তির উপর সোর্পদ করেছিলাম। এ জবাবদিহি যদি আপনাদেরকে খোদার ওখানে বাঁচাতে পারে, তাহলে তার উপর নিশ্চিত হয়ে কাজ করতে থাকুন।

১৫। শুধু ভারতেই নয়, সারা দুনিয়ায় যে রাজনৈতিক সমস্যা এখন বিদ্যমান তার সারকথা আমার মতে এই যে, মানুষের যে পজিশন দুনিয়ায় ছিল না তাকে অযথা নিজের পজিশন বানিয়ে নেবার জন্যে একগুঁয়েমি করলো এবং আপন চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির বুনিয়াদ খোদা থেকে স্বাধীন হয়ে আপন স্বেচ্ছাচারিতার উপর স্থাপন করলো, যার পরিণাম আজ বিরাট অশান্তি-অনাচার এবং পাপাচারের এক প্রচণ্ড ঝড়ের রূপ লাভ করছে।

১৬। ইসলাম থেকে যে সত্যটি আমি উপলব্ধি করেছি, আমার মতে তার ভিত্তিতে ভারতীয় মুসলমানদের, ভারতের সমগ্র অধিবাসীর এবং সারা মুসলিম ও অমুসলিম দুনিয়ার, রাজনীতির সমাধান শুধুমাত্র এই যে, আমরা সকলে খোদার দাসত্ব-আনুগত্য অবলম্বন করব, তাঁর আইনকে জীবনের আইন বলে মেনে নেব এবং দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার এখতিয়ার ফাসেক-ফাজেরের পরিবর্তে নেক বান্দাহদের হাতে তুলে দেব। আমাদের চেষ্টা-চরিত্র এর উপরই ব্যয়িত হতে থাকবে। দুনিয়ার লোক যদি আমাদের

www.pathagar.org

কথায় মনোযোগ দেয়, তাহলে মঙ্গল তাদেরই হবে। আর মনোযোগ না দিলে নিজেরই অমঙ্গল ডেকে আনবে।

১৭। প্রকৃতপক্ষে আমরা এমন একদল লোক তৈরী করতে চাই, যারা একদিকে তাকওয়া-পরহেযগারীতে পারিভাষিক মুত্তাকী পরহেযগারদের থেকে বেশী ভালো হবে এবং অন্যদিকে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করার যোগ্যতাও সাধারণ দুনিয়াদার থেকে বেশী রাখবে। আমাদের মতে দুনিয়ার সকল অনিষ্টের বড় কারণ এই যে, নেক লোক নেকীর সঠিক মর্ম না জানার জন্যেও কোথাও নির্জনে বসে পড়ে এবং দুনিয়ার সকল কাজ-কারবার অসৎ লোকের হাতে এসে যায়, যাদের মুখে নেক কাজের কথা শুনা গেলেও তা মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে। এ অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিকার শুধু এই হতে পারে যে, সৎ লোকের একটি দল সংগঠিত করতে হবে, যারা খোদাভীরুও হবে, সত্যনিষ্ঠ, সত্যবাদী এবং বিশ্বস্তও হবে, খোদার বাঞ্ছিত চরিত্র ও গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হবে। সেই সাথে দুনিয়ার কাজ-কারবার দুনিয়াদারদের থেকে ভালোভাবে উপলব্ধি করবে এবং স্বয়ং দুনিয়াদারীর ভেতর দিয়েই আপন কর্মনৈপুণ্য ও যোগ্যতার দ্বারা তাদেরকে পরাভূত করবে।

১৮। আমি একথা বলতে পারি না যে, এ বিপ্লব এভাবে হবে। তবে আগামী কালের সূর্যোদয়ের প্রতি যেমন আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে, তেমনি এ দৃঢ় বিশ্বাসও আমার আছে যে, এ বিপ্লব হবেই হবে। কিন্তু শর্ত এই যে, নেক লোকদের এমন একটি দল সংগঠিত করতে সাফল্য অর্জন যখন করা যাবে।

মাওলানার উপরোক্ত ভাষণ সমাপ্তির পর উপস্থিত শ্রোতাদের অনুমতিক্রমে জামায়াত-কর্মীদেরকে সম্বোধন করে মাওলানা নিম্নলিখিত কথাগুলো বলেন।

১। আপনারা আপনাদের সে দায়িত্ব অনুভব করুন, যা আপনারা জ্ঞাতসারে খোদার কাছে দৃঢ় শপথ করে নিজেদের উপর আরোপ করে নিয়েছেন। সে শপথের দাবী এই যে ঃ

(ক) আপনারা আল্লাহর আইন বেশী বেশী মেনে চলবেন। আপনাদের আকীদাহ-বিশ্বাস, কথা ও কাজে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য থাকতে হবে। আপনাদের জীবনের এমন কোন দিক থাকবে না, যেখানে আপনাদের চিন্তাধারা ও কাজ ঐ ইসলাম থেকে ভিন্নরূপ হবে, যার উপর আপনারা ঈমান এনেছেন।

(খ) যে ইসলামের উপর আপনারা ঈমান এনেছেন এবং যাকে আপনারা আপনাদের বাদশাহর দ্বীন মনে করেন, যাকে আপনারা গোটা মানব জাতির জন্যে সত্য বলে জানেন এবং কল্যাণের একমাত্র উপায় মনে করেন, তাকে অন্যান্য সকল দ্বীন, দেশ ও ব্যবস্থার উপর বিজয়ী ও সমুন্নত করার জন্যে

www.pathagar.org

আপনাদের মধ্যে এতোটুকু অস্থিরতা থাকা উচিত যতোটা অস্থিরতা আজ বাতিল ব্যবস্থার অনুসারীগণ তাদের ভ্রান্ত ব্যবস্থা ও লুটেরাদের সমর্থন ও সমুন্নতির জন্যে দেখাচ্ছে ..... তাদের ধৈর্য, শ্রম ও ত্যাগ, তাদের বিপদ-আপদ হাসিমুখে বরণ করা এবং আপন উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসা-এসবকে আপনারা আপনাদের কাজের দ্বারা পরিমাপ করে দেখুন এবং অনুভব করুন যে, এ ব্যাপারে তাদের সাথে আপনাদের তুলনা কতখানি হতে পারে।

২। যে অল্পবিস্তর দৃষ্টিশক্তি ও দূরদর্শিতা আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দিয়েছেন তার আলোকে আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি যে, বর্তমান সময়ের আন্দোলন ও তার নেতৃত্বের কোন একটির মধ্যেও মুসলমানদের রোগের কোন প্রতিকার নেই এবং ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্যও তার দ্বারা পূরণ হবার নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ ধরনের আন্দোলন যদি শত শত বছর ধরে পূর্ণ সাফল্য ও হৈহল্লাসহ চলতে থাকে, তথাপি জীবন ব্যবস্থার মধ্যে সত্যিকার কোন বিপ্লব সাধিত হবে না।

সত্যিকার বিপ্লব যদি কোন আন্দোলনের দ্বারা হয় তাহলে তা শুধু আমাদের এ আন্দোলন। তার জন্যে এই একটিই স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতি রয়েছে, যা আমরা খুব চিন্তাভাবনা করে এবং এ দ্বীনের মেজাজ, প্রকৃতি ও তার ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনার পর অবলম্বন করেছি।

৩। আমাদের কর্মীবাহিনীর মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক এমন পাওয়া যায় যারা তবলীগ ও ইসলাহের (সংস্কার-সংশোধন) কাজে কঠোর পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এমন মনে হয় যে, পথভ্রষ্ট লোকদের সংশোধনের জন্যে তাদের অস্থিরতা ততোটা নেই যতোটা আছে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে নিক্ষেপ করার। দ্বীনের উৎসাহ-উদ্যম তাঁদের মধ্যে সহানুভূতি-শুভাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা ততোটা সঞ্চার করতে পারেনি, যতোটা করেছে ঘৃণা ও রাগের প্রেরণা। আমাদের এমন মনে হয় যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহে এবং নিজের সৌভাগ্যক্রমে সত্য লাভ করেছেন, তাঁদের এ সত্যপ্রাপ্তি কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে গর্ব-অহঙ্কারের মানসিকতা সৃষ্টি করেছে।

৪। ব্যাপার এই যে, একটি অধঃপতিত সমাজে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ও সৎকর্মশীল লোকের দৃষ্টান্ত মহামারীতে আক্রান্ত জনপদে কতিপয় সুস্থ লোকের মতো, যারা চিকিৎসাবিদ্যায়ও অভিজ্ঞ এবং যাদের কাছে কিছু ঔষধপত্রও রয়েছে। আমাকে বলুন যে, এ মহামারী আক্রান্ত জনপদে এ মুষ্টিমেয় লোকের সত্যিকার গুরুদায়িত্ব কি? এরা কি এসব রোগী এবং তাদের রোগজনিত দূষিত অপরিষ্কার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে ঘৃণা করবে?

www.pathagar.org

তাদেরকে কি দূরে তাড়িয়ে দেবে, ফেলে পালিয়ে যাবে, না নিজেকে বিপন্ন করে তার চিকিৎসার ও সেবা-শুশ্রুষার চেষ্টা করবে?

মাওলানার বক্তৃতার পর মাগরেব পর্যন্ত বিরতি ঘোষণা করা হয়। মাগরেবের পর রিপোর্টের সমালোচনা ও পর্যালোচনা হয়।

পরদিন জুমার নামাযের পূর্ব পর্যন্ত রিপোর্ট পর্যালোচনাই হয়। মাওলানা মওদূদী জুমার খুৎবা দেন এবং প্রথম খুৎবায় উর্দুতে ভাষণ দেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ ২০শে এপ্রিল এশার পর মজলিসে শূরার বৈঠক হয়। পর দিন ২১শে এপ্রিল অবশিষ্ট রিপোর্টগুলোর পর্যালোচনা ও তার সমালোচনা হয়। এই দিন বাদ মাগরেব আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদী সম্মেলনের সমাপ্তি ভাষণ পেশ করেন। তাঁর সমাপ্তি ভাষণে যা কিছু বলেণ তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

১। আমাদের সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য নেতৃত্বের বিপ্লব। অর্থাৎ দুনিয়ায় আমরা যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে চাই তাহলো এই যে, ফাসেক-ফাজেরদের নেতৃত্বের অবসানের পর সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। একাজ অবহেলা করার পর এমন কোন আমল আর হতে পারে না যার দ্বারা মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে।

২। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব বহন করে। যে ব্যক্তি দ্বীনের উপর ঈমান এনেছে তার কাজ এতোটুকুতেই শেষ হয়ে যায় না যে, সে তার গোটা জীবনকে যথাসম্ভব ইসলামের ছাঁচে ঢেলে গড়বে। বরঞ্চ তার ঈমানেরই দাবী এই যে, সে তার চেষ্টাচরিত্র একটি উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করবে যে নেতৃত্ব ফাসেক ও ফাজেরদের হাত থেকে সৎ লোকের হাতে আসবে এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যবস্থা কায়েম হবে যা আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী দুনিয়ার ব্যবস্থাপনাকে সংশোধিত করবে ও রাখবে।

৩। যেহেতু এ মহান উদ্দেশ্য সামাজিক চেষ্টাচরিত্র ব্যতীত হাসিল হতে পারে না, সেজন্যে এর জন্যে এমন একটি সত্যনিষ্ঠ দলের আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন যা স্বয়ং নীতিবান হবে এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যবস্থা কায়েম করা, কায়েম রাখা ও সঠিকভাবে তা পরিচালনা করা ব্যতীত দুনিয়ায় আর কোন উদ্দেশ্য তার থাকবে না।

৪। আল্লাহ আমাকে দ্বীন সম্পর্কে অল্পবিস্তর যে জ্ঞানদান করেছেন এবং কুরআন-সুন্নাহ অধ্যয়নের পর যে অন্তর্দৃষ্টি আমি লাভ করেছি তার থেকে দ্বীনের দাবী এই বলে আমি মনে করি। আমার এই দৃষ্টিতে কিতাবে ইলাহীর দাবীই এই।

www.pathagar.org

এই হচ্ছে নবীগণের সুন্নাত এবং এ অভিমত থেকে সরে দাঁড়াতে পারি না যতোক্ষণ পর্যন্ত না কেউ খোদার কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাত থেকে এ কথা প্রমাণ করেছে যে, দ্বীনের দাবী এটা নয়।

৫। যে বিশ্বজগতে আমরা বাস করি তাকে আল্লাহ তায়ালা এক আইনের অধীন করে বানিয়েছেন এবং তার প্রতিটি বস্তু এক অপরিহার্য আইনের অধীনে চলছে। এখানে কোন প্রচেষ্টা নিছক পবিত্র বাসনা ও নেক নিয়তের ভিত্তিতে সফল হতে পারে না। বরঞ্চ তার জন্যে উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণ হওয়া জরুরী যা আল্লাহর আইন অনুযায়ী নির্ধারিত।

৬। যে নেতৃত্বের বিপ্লব আপনারা চান তা নিছক দোয়া এবং মহৎ কামনার দ্বারা আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। তার জন্যে এটা অপরিহার্য যে, আপনারা যে আল্লাহর আইন উপলব্ধি করবেন এবং ঐসব শর্ত পূরণ করবেন- যার মাধ্যমে দুনিয়ায় সৎ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে।

৭। মানুষের সাফল্য-অসাফল্য এবং উন্নতি-অবনতি বৈষয়িক ও নৈতিক উভয় শক্তির উপরই নির্ভরশীল। না তা বৈষয়িক শক্তির মুখাপেক্ষীহীন হতে পারে, আর না নৈতিক শক্তির। কিন্তু প্রকৃত সিদ্ধান্তকর গুরুত্ব নৈতিক শক্তিরই- বৈষয়িক শক্তির নয়।

৮। যখন আমরা নৈতিক পর্যালোচনা করি, তখন নীতিগতভাবে তাকে আমরা দুটি ভাগে বিভক্ত দেখতে পাই। মৌলিক মানবীয় নৈতিকতা ও ইসলামী নৈতিকতা।

৯। মৌলিক মানবীয় নৈতিকতার মধ্যে ঐসব গুণাবলী শামিল, যা দুনিয়ার মানবীয় সাফল্যের জন্যে অপরিহার্য শর্ত- তা সে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে কাজ করুক অথবা হীন উদ্দেশ্যে।

(ক) মুমিন হোক অথবা কাফের, সংস্কারক হোক অথবা ফেতনা সৃষ্টিকারী, সে এ অবস্থায় একজন করিতকর্মা মানুষ হতে পারে যদি তার মধ্যে থাকে ইচ্ছাশক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি, সাহস ও সংকল্প, ধৈর্য ও অবিচলতা, সহনশীলতা, বীরত্ব, কর্মতৎপরতা ও কর্মঠতা, সতর্কতা ও বিচক্ষণতা। তার মধ্যে থাকতে হবে শৃঙ্খলার সাথে কাজ করার রুচি, মানসিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা, দায়িত্বানুভূতি, পরিস্থিতি উপলব্ধি করার এবং তদনুযায়ী নিজেকে তৈরী করার ও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের যোগ্যতা। তার মধ্যে আরও থাকতে হবে ভাবাবেগ, কামনা-বাসনা ও উত্তেজনা দমনের শক্তি এবং অন্যান্যকে আকৃষ্ট করার, তাদের মনে স্থান করে নেয়ার এবং তাদের দ্বারা কাজ গ্রহণ করার যোগ্যতা।

www.pathagar.org

(খ) তারপর এটাও অপরিহার্য যে, তার মধ্যে কিছু না কিছু ভদ্রতামূলক গুণাবলী পাওয়া যাবে, যা প্রকৃতপক্ষে মানবতার নির্যাস এবং যার বদৌলতে মানুষের মর্যাদা ও বিশ্বস্ততা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন আত্মমর্যাদা-বোধ, উদারতা, সহানভূতি, অনুগ্রহ, অনুকম্পা, সুবিচার, মনের প্রশস্ততা, সত্যবাদিতা, আমানতদারী ও সত্যনিষ্ঠা, প্রতিশ্রুতি পূরণ, যৌক্তিকতা, ভারসাম্য, ভদ্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং আত্মসংযম।

(গ) কিন্তু এসব কিছুর একত্র সমাবেশেও কার্যত একটি সুদৃঢ় ও কার্যকর সামষ্টিক শক্তিতে পরিণত হতে পারে না, যতোক্ষণ না কিছু অন্যান্য নৈতিক গুণাবলী তার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। যেমন সকলের অথবা অধিকাংশ লোকের কোন এক সামগ্রিক লক্ষ্যে একমত হওয়া। তারপর তারা যে লক্ষ্যকে আপন ব্যক্তিগত স্বার্থ এমনকি জানমাল ও সন্তানাদি অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয় মনে করবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সহানুভূতি থাকবে। সম্মিলিতভাবে কাজকর্ম করবে। ভালোমন্দ নেতৃত্বের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। নেতাদের মধ্যে আন্তরিকতা, সঠিক নীতি অবলম্বন এবং অন্যান্য গুণাবলী থাকবে। জাতি অথবা দল ও আপন নেতাদের আনুগত্য করা জানবে। তাদের উপর আস্থা রাখবে এবং নিজেদের সকল উপায়-উপাদান তাদের অধীন করে দিতে প্রস্তুত হবে। উপরন্তু গোটা জাতির মধ্যে এমন জীবন্ত জাগ্রত জনমত পাওয়া যাবে যা এমন কোন কিছু নিজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হতে দেবে না, যা সামগ্রিক সামাজিক কল্যাণের জন্যে ক্ষতিকর হয়।

এ কথাই নবী (স.) নিম্নের হাদীসে বয়ান করেছেন-

خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَةِ خِيَارُكُمْ فِى الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا

– তোমাদের মধ্যে যারা জাহেলিয়াতের যুগে ভালো ছিল, তারা ইসলামী সমাজেও ভালো প্রমাণিত হবে।

www.pathagar.org

১০। ইসলামী নৈতিকতা

তারপর মাওলানা মওদূদী বলেন ঃ

এখন নৈতিকতার সে বিভাগটি ধরুন, যাকে ইসলামী নৈতিকতা নামে অভিহিত করি। এ ইসলামী নৈতিকতা মৌলিক মানবীয় নৈতিকতা থেকে পৃথক কোন বস্তু নয়, বরঞ্চ তার পরিশুদ্ধ ও পরিসমাপ্তি।

(ক) ইসলামের প্রথম কাজ এই যে, মৌলিক মানবীয় নৈতিকতাকে একটা সঠিক কেন্দ্র ও অক্ষশক্তি সরবরাহ করে যার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে সে একটা পূর্ণাঙ্গ কল্যাণে পরিণত হয়। তাওহীদের দাওয়াতের অপরিহার্য দাবী এই যে, দুনিয়ার জীবনে মানুষের সকল চেষ্টাচরিত্র, শ্রম ও সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি।

(খ) দ্বিতীয় কাজ যা নৈতিকতার ব্যাপারে ইসলাম করে তা এই যে, তা মৌলিক মানবীয় নৈতিকতাকে সুদৃঢ়ও করে এবং অত্যন্ত ব্যাপকও। যেমন, ধৈর্যের কথাই ধরুন। তাওহীদের মূল থেকে যে ধৈর্য খাদ্য গ্রহণ করে তা সহনশীলতা ও সাহসিকতার এক অফুরন্ত ধনসম্পদ, যা দুনিয়ার সকল বাধাবিঘ্ন একত্র হয়েও নিঃশেষ করতে পারে না। অপরদিকে অমুসলমনাদের ধৈর্য হয় অত্যন্ত সীমিত। গোলামীর অবিরল বর্ষণেও যে ধৈর্য অবিচল ছিল, তা যদি যৌন অভিলাষ চরিতার্থ করার সুযোগ পায়, তাহলে নফসে আম্মারার সামান্য ধাক্কাতেও তা টিকে থাকতে পারে না।

(ঘ) তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই যে, সে মৌলিক মানবীয় নৈতিকতার নীচতলার উপর মহান নৈতিকতার এক সুন্দর দোতালা নির্মাণ করে। তার বদৌলতে মানুষ সম্মানের উচ্চশিখরে আরোহণ করে এবং আপন মনকে স্বার্থপরতা, প্রবৃত্তিপূজা, অত্যাচার, নির্লজ্জতা এবং লাগামহীনতা থেকে পবিত্র করে। তাকে আত্মসংযমে অভ্যস্ত করে, সকল সৃষ্টির জন্যে উদার, দয়ালু, সহানুভূতিশীল, বিশ্বস্ত, নিঃস্বার্থ শুভাকাঙ্ক্ষী, সুবিচারক এবং সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ বানিয়ে দেয়। সে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ মিশন ও তার উপর সোপর্দ করে যাতে সে দুনিয়ায় কল্যাণ ছড়াতে এবং অনিষ্ট বন্ধ করতে পারে...।

১১। আল্লাহর সুন্নাত এই যে, যদি দুনিয়ায় এমন কোন সংগঠিত মানুষের দল না থাকে যা ইসলামী নৈতিকতা ও মৌলিক মানবীয় নৈতিকতার দ্বারা ভূষিত এবং তারপর বস্তুগত উপায়-উপাদান ব্যবহার করতে পারে, তাহলে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও পরিচালনার ভার এমন এক দলের উপর অর্পিত হয়, যা মৌলিক মানবীয় নৈতিকতা ও বৈষয়িক উপায়-উপাদানের দিক দিয়ে অন্যান্যের তুলনায় অগ্রসর। কিন্তু কোন সংগঠিত দল যদি এমন থাকে যা ইসলামী নৈতিকতা

www.pathagar.org

এবং মৌলিক মানবীয় নৈতিকতা উভয় দিক দিয়ে অবশিষ্ট দুনিয়ার মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে এবং সেই সাথে বৈষয়িক উপায়-উপাদান ব্যবহারেও ত্রুটি করে না তা হলে এ কিছুতেই সম্ভব নয় যে, তার মুকাবেলায় অন্য কোন দল দুনিয়ার নেতৃত্বের অধিকারী হয়ে থাকতে পারবে। এমন হওয়া প্রকৃতিরও পরিপন্থী, আল্লাহর সুন্নাতের পরিপন্থী এবং ঐসব ওয়াদারও খেলাপ যা আল্লাহ তায়ালা মুমেনীন-সালেহীনের জন্যে করে রেখেছেন। এ ধরনের সুসংগঠিত দলের বিশ্বজনীনতার মুকাবেলা করা দুনিয়ার কোন শক্তির সাধ্য নেই।

১২। অবশ্য এর সুফল তখনই প্রকাশিত হতে পারে যখন একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ দল এ সব গুণাবলীসহ বিদ্যমান হবে। তারপর নিছক এরূপ একটি দল হলেই নেতৃত্বের পরিবর্তন হবে না, এভাবে যে এক দিকে এরূপ একটি দল হবে, ওদিকে আসমান থেকে কিছু ফেরেশতা নেমে আসবেন ফাসেক-ফাজেরদেরকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে সৎ দলটিকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবেন। বরঞ্চ ঐ দলটিকে কুফর ও পাপাচারের শক্তির সাথে জীবনভর প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রত্যেক কদমে সংগ্রাম করতে হবে এবং সত্য প্রতিষ্ঠার পথে সকল প্রকার কুরবানী দিয়ে সত্যের প্রতি নিজেদের ভালোবাসা ও নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। এ এমন শর্ত যার থেকে নবীগণকেও ব্যতিক্রম করা হয়নি আর আজকাল এর ব্যতিক্রম কেউ হবে এ তো আশাই করা যায় না।

১৩। নৈতিক শক্তির সাথে ইসলামী ও মৌলিক উভয় প্রকারের নৈতিকতার একত্রে সমাবেশ হলে তা বৈষয়িক উপায়-উপকরণের স্বল্পতা সত্ত্বেও ঐসব শক্তির উপর বিজয়ী হয় যা শুধুমাত্র মৌলিক নৈতিকতা ও বৈষয়িক উপায়-উপাদানের ভিত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।

১৪। এমন একটি দল যা ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত ও জাতীয় স্বার্থের উর্ধে থাকে তার চেষ্টাচরিত্রের উদ্দেশ্য এ ছাড়া কিছু হয় না যে, সে মানবতার কল্যাণ কিছু মূলনীতি মেনে চলার মধ্যেই দেখতে পায় এবং মানবজীবনের ব্যবস্থা তার উপর কায়েম করতে চায়। তারপর এ সব মূলনীতির ভিত্তিতে যে সমাজ সে গঠন করে তার মধ্যে জাতীয়, জন্মভূমি সুলভ অথবা ভৌগোলিক, শ্রেণীগত এবং বংশীয় পার্থক্য মোটেই থাকে না। সকল মানুষ তার মধ্যে সম-অধিকারের ভিত্তিতে শামিল হতে পারে। এতে পথপ্রদর্শক ও নেতৃত্ব করার পদমর্যাদা প্রত্যেক সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অর্জন করতে পারে যারা এসব মূলনীতি পালনে সর্বাগ্রে থাকে। ফলে উচ্চতর মানবতা নিম্নমানের বৈষয়িক উপায়-উপাদান সত্ত্বেও বিরোধীদের প্রচণ্ড পাশবিকতাকে অবশেষে পরাভূত করে। মহান চরিত্রের হাতিয়ার তোপ ও মিজাইল থেকে অধিক দূরপাল্লার বলে প্রমাণিত হবে। ঠিক যুদ্ধের অবস্থায় দুশমন বন্ধুতে পরিণত হবে।

www.pathagar.org

আঘাতের পূর্বেই তাদের মন জয় করা যাবে। এক এক করে জনপদগুলো যুদ্ধ না করেই বিজিত হবে। এ সৎ ও সত্যনিষ্ঠ দল যখন মুষ্টিমেয় লোকজন ও যৎ সামান্য সাজসরঞ্জাম নিয়ে কাজ শুরু করে দেবে, তখন ক্রমশ বিরোধী শিবির থেকে তারা জেনারেল, সিপাই, বিশেষজ্ঞ, অস্ত্রশস্ত্র, রসদ, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সব কিছুই পেতে থাকবে।"

ভাষণের এ পর্যায়ে মাওলানা মওদূদী বলেন-

"ইসলামী নৈতিকতার বুনিয়াদগুলোকে সুস্পষ্ট ভাষায় বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া আমি জরুরী মনে করছি।"

"এ বুনিয়াদগুলো কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে চারটি স্তরে বিভক্ত- যথা ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া এবং ইহসান। এ গোটা প্রাসাদের মধ্যে ঈমান বুনিয়াদ স্বরূপ। এ বুনিয়াদের উপরে ইসলামের প্রাসাদ নির্মিত হয়। অতঃপর তার উপর তাকওয়া এবং সকলের উপর ইহসানের তলা (Floor) তৈরী হয়। ঈমান নাহলে ইসলাম, তাকওয়া অথবা ইহসানের কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

এসবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাওলানা যা বলেন তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

(ক) একটি পূর্ণাঙ্গ মানবজীবন গঠনের জন্যে এটা অপরিহার্য যে, ঈমানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হতে হবে ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং গভীরতার দিক দিয়ে হতে হবে অত্যন্ত সুদৃঢ়। তার বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে যে বিভাগ বা বিষয়টি বাদ পড়ে যাবে, ইসলামী জীবনের সে বিভাগটি নির্মিত হওয়া থেকে বাদ পড়ে যাবে এবং তার গভীরতায় যেখানেই ত্রুটি থাকবে ইসলামী জীবন প্রাসাদের সে স্থানটি কাঁচা থাকবে।

(খ) ইসলাম প্রকৃতপক্ষে ঈমানের বাস্তব বহিঃপ্রকাশের দ্বিতীয় নাম। ঈমান ও ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক তেমন, যেমন বীজ ও গাছের মধ্যে সম্পর্ক হয়ে থাকে। বীজের মধ্যে যা কিছুই এবং যেমন কিছুই থাকে তাই গাছের আকারে প্রকাশ পায়। গাছ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা যেতে পারে যে বীজের মধ্যে কি ছিল এবং কি ছিল না।

আমি যতোটা কুরআন, হাদীস বুঝতে পেরেছি, তাতে এ কিছুতেই সম্ভব নয় যে, অন্তরে ঈমান রয়েছে এবং বাস্তব কাজকর্মে ইসলাম নেই।

একজন কুশ্রী অথচ জীবন্ত মানুষ একটি সুশ্রী ও প্রাণহীন মৃতদেহ থেকে অবশ্যই করিতকর্মা হয়ে থাকে। প্রকাশ্য প্রবঞ্চক থেকে আপনারা আপনাদের মনকে তো নিশ্চয় ধোঁকা দিতে পারেন। কিন্তু তা ঘটনাবহুল দুনিয়ায় কোন প্রভাব ফেলতে পারে না, আর না খোদার মীযানেও ওজন লাভ করতে পারে।

www.pathagar.org

আমার এ কথা ভালোভাবে মনে বদ্ধমূল করে নিন যে, উপরের অবশিষ্ট দুটি তলা (Floor) কখনোই উঠতে পারে না যতোক্ষণ ঈমানের বুনিয়াদ মজবুত না হয়েছে। আর তার দৃঢ়তার প্রমাণ বাস্তব ইসলাম অর্থাৎ কার্যত আনুগত্য ও খোদা এবং রসূলের হুকুম মেনে চলার দ্বারাই পাওয়া যেতে পারে।

(গ) তাকওয়া প্রকৃতপক্ষে মনের সেই অবস্থার নাম, যা খোদাভীতি ও দায়িত্বানুভূতির দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে তা প্রকাশ করে। তাক্ওয়ার বাস্তবতা যার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে তার গোটা জীবন সংগতিশীলতা ও একরূপতার (Uniformity) সাথে ইসলামী জীবনে পরিণত হবে। অতঃপর ইসলাম পূর্ণ ব্যাপকতা সহকারে তার চিন্তাধারায় তার ভাবাবেগ ও প্রেরণার মধ্যে, তার রুচি ও মননশীলতায়, তার সময় বণ্টনে, তার শক্তি প্রয়োগে, তার চেষ্টাসাধনার পথে, তার জীবনধারা ও সামাজিকতায়, তার উপার্জন ও ব্যয়ে মোটকথা তার দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে ক্রমশ সুস্পষ্ট হতে থাকবে। এ জিনিস সময় সাপেক্ষ এবং অসীম ধৈর্যের দাবী রাখে। এ ক্রমশ বিকাশ লাভ করে এবং একটা সময়কালের পর ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়। বীজ থেকে বৃক্ষের উৎপাদন এবং অতঃপর তার ফলবতী হওয়াতে বিলম্ব অবশ্যই হবে। পক্ষান্তরে একটি কাঠে ফুল-ফল বেঁধে দিয়ে তাকে বৃক্ষের রূপদান সহজেই করা যায়।

(ঘ) এখন ইহসানের কথা ধরা যাক, যা হলো সর্বোচ্চ মনযিল বা তলা। ইহসান প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর দ্বীনের সাথে সেই আন্তরিক সম্পর্ক, সে গভীর প্রেম ও ভালবাসা, সে সত্যিকার আনুগত্যশীলতা, আত্মোৎসর্গ ও জীবন বিলিয়ে দেওয়ার নাম, যা মুসলমানকে ফানা ফিল ইসলাম (ইসলামের জন্যে উৎসর্গিত) করে দেয়। তাকওয়ার মৌলিক ধারণা খোদার ভয়, যা মানুষকে তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে উদ্বুদ্ধ করে আর ইহসানের মৌলিক ধারণা হলো খোদার মহব্বত, যা মানুষকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে প্রেরণা দান করে।

এ দুটির পার্থক্য একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা এভাবে বুঝুন যে, সরকারের কর্মচারীদের মধ্যে কিছু লোক তো তারা, যারা অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণতা ও দ্রুততার সাথে ঐসব খেদমত আঞ্জাম দেয়, যা তাদের উপর অর্পণ করা হয়, সকল নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নিয়মনীতি পুরোপুরি মেনে চলে এবং সরকারের আপত্তিকর কোন কাজই করে না। দ্বিতীয়-একটি শ্রেণী এমন সব আনুগত্যশীল ও নিবেদিত-প্রাণদের থাকে, যারা মনেপ্রাণে সরকারের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়। তারা শুধু সেসব কাজই করে না যা তাদের করতে দেয়া হয়। বরঞ্চ তাদের মনে সর্বদা এ চিন্তা থাকে যে, কিভাবে বেশী বেশী সরকারের স্বার্থ উন্নত করা যায়। এজন্যে তারা তাদের উপর অর্পিত

www.pathagar.org

দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে অতিরিক্ত কাজ করে। সরকার কোন বিপদ অথবা অসুবিধার সম্মুখীন হলে তারা জান-মাল সন্তানাদি সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে। কোথাও আইন লঙ্ঘিত হলে তারা মনে পীড়া অনুভব করে। কোথাও বিদ্রোহ দেখা দিলে তারা অধীর হয়ে পড়ে এবং তা দূর করার জন্যে জীবন বিলিয়ে দেয়। তাদের আন্তরিক বাসনা এই হয় যে, দুনিয়াতে তাদের সরকারেরই সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ুক এবং এমন কোন স্থান না থাকে, যেখানে তাদের পতাকা উড্ডীন না হয়।

এ উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লোক সরকারের মুত্তাকী এবং দ্বিতীয় শ্রেণী মুহ-সিন্। এ দৃষ্টান্ত থেকে ইসলামের মুত্তাকীন ও মুহসেনীনের অনুমান করুন। যদিও মুত্তাকী সম্মানের যোগ্য ও বিশ্বাসভাজন, কিন্তু ইসলামের মূল শক্তি মুহসিনের দল। দুনিয়ায় তারা যে প্রকৃত কাজ করতে চায়, তা তাদের দ্বারাই হতে পারে।

নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্য ঃ নবী মুস্তাফার (সঃ) সে উদ্দেশ্য পূরণের পদ্ধতি

আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদী ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি চিহ্নিত করে ও তার গুরুত্ব উল্লেখ করে ভাষণ দানের পর নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্য এবং কোন পদ্ধতিতে নবী মুহাম্মদ (সঃ) সে উদ্দেশ্য পূরণ করেন, তার প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে বলেন ঃ

আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামকে এ জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল যে, তাঁরা মানুষের মধ্যে খোদার বন্দেগী ও আনুগত্য এবং তার সামনে জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি করবেন। উন্নতমানের চরিত্রের বিকাশ সাধন করবেন এবং মানুষের দাসত্ব-আনুগত্য ব্যবস্থাকে এমন সব মূলনীতির উপর কায়েম করবেন যার থেকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বর্ধিত হবে এবং অমঙ্গল ও অনাচার দমিত হবে। এই একটি উদ্দেশ্য সকল নবীরই ছিল এবং অবশেষে এ উদ্দেশ্যেই নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে পাঠানো হয়েছিল। এখন দেখুন হুজুর (স.) কোন্ পদ্ধতিতে কাজ করেছিলেন।

সর্বপ্রথম তিনি ঈমানের দাওয়াত দেন। অতঃপর ঐসব নিষ্ঠাবান মুসলমানের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রাচীন জাহেলিয়াতের ভ্রান্ত ব্যবস্থা উৎখাত করে তার জায়গায় খোদার আইনের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূলনীতির উপর একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবস্থা কায়েম করা শুরু করেন। এভাবে এ সব লোক যখন মনমস্তিষ্ক, ধ্যান-ধারণা, আমল-আখলাক মোটকথা সকল দিক দিয়ে সত্যিকার অর্থে মুসলিম, মুত্তাকী ও মুহসিন হয়ে গেলেন এবং ঐসব কাজে আত্মনিয়োগ করলেন যা আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যশীলগণের করা উচিত ছিল, তখন নবী (সঃ) তাঁদেরকে বলা শুরু করলেন লেবাস-পোশাক, খানাপিনা, আচার-আচরণ,

www.pathagar.org

উঠাবসা এবং অন্যান্য প্রকাশ্য জীবন যাপন প্রণালীতে সুসভ্য, পরিমার্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন শিষ্টাচার শেখা মুত্তাকীদের জন্যে শোভা পায়। যেন কাঁচামালকে স্বর্ণ বানানো হলো। তারপর তাকে স্বর্ণ মোহরের ছাঁচে ঢালা হলো। প্রথমে সিপাহী তৈরী করা হলো। তারপর তাকে উর্দি পরানো হলো।

আমার এ কথার এ অর্থ করবেন না যে, আমি বাহ্যিক গুণাবলীকে অস্বীকার করতে চাচ্ছি। অথবা ঐসব হুকুম পালনকে অপ্রয়োজনীয় মনে করছি, যা জীবনের বাহ্যিক দিকের সংস্কার-সংশোধনের জন্যে দেয়া হয়েছে.... যে জিনিস আমি আপনাদের মনে বদ্ধমূল করতে চাই তা এই যে, অগ্রাধিকারযোগ্য জিনিস বাতেন, যাহের নয়। প্রথমত, বাতেন বা ভেতরের দিকটার বাস্তবতার স্ফুরণ করুন এবং তারপর সে বাস্তবতার আলোকে বাহ্যিক দিককে ঢেলে সাজান। সবচেয়ে বেশী এবং সর্বপ্রথম আপনাদের ঐ সব গুণাবলীর প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত, যা আল্লাহর নিকটে প্রকৃত মর্যাদার যোগ্য এবং সেসবের বিকাশ সাধন করাই নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল।

এ সমগ্র ভাষণ শ্রোতাগণ এমন তন্ময় হয়ে শুনছিলেন যে, কত সময় অতিবাহিত হলো তা কেউ অনুভব করতে পারেননি, একটুখানি থেমে মাওলানা পুনরায় বল্লেন-

"বন্ধুগণ! আমি আমার অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও এ দীর্ঘ বক্তৃতা করলাম শুধু এজন্যে যে, প্রকৃত সত্য আপনাদের সামনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরি এবং খোদার কাছেও আমি দায়িত্বমুক্ত হই। জীবনের কোন ভরসা নেই। কেউ জানে না যে, কখন কার জীবন অবকাশ শেষ হয়ে যাবে। এজন্য যে দায়িত্ব আমার উপর আরোপিত ছিল সত্যকে পৌঁছিয়ে দেয়ার, সে দায়িত্ব পালন করে তার থেকে মুক্ত হতে চাই। কোন কিছু অস্পষ্ট মনে হলে তা জিজ্ঞেস করুন। কোন কথা সত্যের খেলাফ বলে থাকলে তার প্রতিবাদ করুন। আর যদি আমি যথাযথভাবে সত্যকে আপনাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকি, তাহলে তার সাক্ষ্য দিন।"

একথা বলতেই যেন মাওলানা ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন। সম্মেলনের শ্রোতাগণ একই কণ্ঠে সমস্বরে বলে উঠলেন- "আমরা সাক্ষী রইলাম।

মাওলানার কণ্ঠ আবার শুনা গেল-

"আপনারাও সাক্ষী এবং খোদাও সাক্ষী। দোয়া করি যে আল্লাহ আমাকে এবং আপনাদের সকলকে দ্বীনের তত্ত্বজ্ঞান দান করুন এবং তদনুযায়ী দ্বীনের সকল দাবী পূরণের তাওফীক দিন, আমীন।"

মাওলানা ভাষণের পর কাইয়েমে জামায়াত মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

www.pathagar.org

নবম অধ্যায়

সম্প্রসারণ ও উন্নতির যুগ
(এপ্রিল ১৯৪৬-মে ১৯৪৭ সাল)

দেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জামায়াতে ইসলামীর জন্যে সুসংহত হওয়া, আপন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী লোক নির্ধারণ করে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া এবং তাদের মধ্যে সঠিক ইসলামী চরিত্র গঠন করার অবকাশ খুব কমই ছিল। সে জন্যে তার কাজের গতি দ্রুততর করা হয়। বিগত বছরের তুলনায় আগত বছরে তাকে অধিকতর তৎপরতা দেখাতে হবে। জামায়াত অনুভব করছিল, তার প্রস্তুতি গ্রহণের সময় আসন্ন এবং সে সময় অতি অল্প। এখন বিদেশী শাসকদের জন্যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণ অব্যাহত রাখা আর সম্ভব নয়। মহাযুদ্ধের পর উপমহাদেশের মধ্যে এক নতুন পট পরিবর্তন হয়েছে এবং নবতর দাবী শাসন-শোষণের অবস্থা একেবারে পাল্টে দিয়েছে। এখন কোন জাতির পক্ষে সরাসরি অন্য কোন দুর্বল জাতিকে গোলাম বানিয়ে রাখা আর সম্ভব নয়। এ জন্যে একথা একেবারে নিশ্চিত যে, বিদেশী শাসকগণ তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে বিদায় হওয়ার জন্যে প্রস্তুত।

এমন অবস্থায় যে আদর্শিক দলটি নৈতিক সংস্কারের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাসহ কাজ করছে এবং যার লক্ষ্য একটি সত্যনিষ্ঠ সুসংহত দল গঠন করার, যে বাতিল অবস্থাকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করবে, তার জন্যে এখন নির্বিঘ্নে ও নীরবে কাজ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। জামায়াতে ইসলামীর বাঞ্ছিত ইসলামী বিপ্লব এক দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষাদীক্ষা ও সংগ্রামের দাবী রাখে। কিন্তু ভারতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ফসল পেকে গেছে এবং তা কাটার জন্যে বিভিন্ন দল তৈরী হচ্ছে। হিন্দু জাতি তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মাধ্যমে তার স্থায়ী শাসন ক্ষমতা লাভের জন্যে উন্মুখ হয়ে পড়েছে। ইংরেজ ভারতের কন্টকমুকুট অবিলম্বে তাদের মস্তক থেকে নামিয়ে মান-সম্মান নিয়ে বিদায় হতে চায়। মুসলিম লীগ দুই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মধ্যে ভারসাম্যের পথ বের করার চেষ্টা করছিল, যাতে করে সকল কুল রক্ষা করে কোন না কোন রকমের পাকিস্তান লাভ করতে পারে। অবশ্য হিন্দু ও ইংরেজ উভয়েই পাকিস্তান বিরোধী ছিল। তথাপি যে কোন একটা সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় অতি আসন্ন। মাওলানা মওদূদী জামায়াত প্রতিষ্ঠা এ উদ্দেশ্যে করেছিলেন যে, ভারতের মুসলিম মিল্লাতের কোন কঠিন বিপদে যেন

www.pathagar.org

এ জামায়াত কাজে লাগে। এ জন্যে এ দলটিকে তিনি কোন নির্বাচনমুখী দলে পরিণত হতে দেননি। বরঞ্চ এটাকে শিক্ষা ও তরবিয়ত এবং ইসলামী দাওয়াত প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে গঠন করেছিলেন। এ দল তার সীমিত পরিমণ্ডলে একদিকে দ্বীনের তবলীগের কাজ করছিল ও দ্বীনের শিক্ষাকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছিল এবং অপরদিকে এমন মর্দে মুজাহিদ তৈরীর কাজে ব্যস্ত ছিল যে, সময় এলে তারা তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা ও সংগঠনের অনুপম শৃঙ্খলার দ্বারা মিল্লাতের আদর্শিক এবং ইসলামী খেদমত আঞ্জাম দিতে পারবে।

পরিস্থিতি অধিকতর সংকটময় দেখে জামায়াতে ইসলামী কর্মীদের তালীম ও তরবিয়ত, সংগঠন ও কর্মতৎপরতাকে দ্রুততর ও শক্তিশালী করে। তার স্বাভাবিক দাবী অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন স্থানে সম্মেলন আহ্বান করে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক ও সজাগ করার কাজ শুরু করা হয়।

দ্বিতীয় নিখিল ভারত জামায়াতে ইসলামী রুকন সম্মেলন

জামায়াতে ইসলামীর দ্বিতীয় দেশভিত্তিক রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এলাহাবাদ শহরের হরওয়ারা নামক বস্তিতে। এ সম্মেলন ১৯৪৬ সালের ৫ই এপ্রিল থেকে ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত চলে এবং এতেও প্রত্যেক রুকনের অংশগ্রহণ অপরিহার্য ছিল। কতিপয় পর্যবেক্ষক ও বিশেষ কর্মীগণকেও সম্মেলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। দু'হাজারেরও বেশী লোক অংশগ্রহণ করে। রাস্তার পাশে খাটানো তাঁবুতে থাকার জায়গা করা হয়। ৪ তারিখ রাতেই সকলে পৌঁছে যান। সম্মেলনের স্থানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুবন্দোবস্ত, শৃঙ্খলা, শালীনতা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ ছিল অনুপম। স্টেশন থেকে সম্মেলনের স্থান পর্যন্ত অংশগ্রহণকারীদেরকে বাস ও বিভিন্ন যানবাহনে করে নিয়ে যাওয়া হয়। মহিলাদের জন্যে পর্দার ব্যবস্থা করা হয় এবং বিরাট সংখ্যক স্থানীয় মহিলা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

পরদিন ৫ই এপ্রিল সকাল নটায় কাইয়েমে জামায়াত মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ সম্মেলনের স্থানে বিভাগওয়ারী আসন গ্রহণ করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। কয়েক মিনিটের মধ্যে শৃঙ্খলার সাথে সকলে যথাস্থানে আসন গ্রহণ করে আমীরে জামায়াতের উপস্থিতির প্রতীক্ষায় থাকেন। আমীরে জামায়াত কানের অসহ্য বেদনার কারণে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীকে তাঁর কায়েম মকাম বা স্থলাভিষিক্ত করে বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে সভাস্থল ত্যাগ করেন।

www.pathagar.org

মাওলানা ইসলাহী মাওলানার অসুস্থতার জন্যে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন ঃ

আমি সর্বপ্রথমে সমেবত সকলকে যিকরে এলাহীর জন্যে তাকীদ করছি। শুধু শাব্দিক যিকর তো মুখের কাজেই সীমিত থাকে যদি তার সাথে তার মনটাও না থাকে।

তারপর তিনি জামায়াতের নিয়ম-শৃঙ্খলার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যার মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব রয়েছে, সে শুধু নৈতিক মহত্ত্ব থেকেই বঞ্চিত নয়, বরঞ্চ তার দ্বীনদারীর মধ্যেও দুর্বলতা দেখা দেয়। তিনি জামায়াতের সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করার পর শুভাকাঙ্ক্ষীদের সামনে অগ্রসর হয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলার দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানান।

তাঁর বক্তৃতার পর কাইয়েমে জামায়াত ১৯৪৫-৪৬ সালের জামায়াতের রিপোর্ট পেশ করেন। তারপর প্রশ্নোত্তর শুরু হয়।

রিপোর্ট অনুযায়ী তৎকালীন জামায়াতের সাংগঠনিক অবস্থা নিম্নরূপ ছিল-

প্রদেশ	রুকন সংখ্যা	রুকন প্রার্থী
পাঞ্জাব	২৯১	১১০
ইউপি	৬০	৫৬
মাদ্রাজ	৩১	০১
দিল্লী	১৪	০৪
হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য)	৩৬	০৬
সীমান্ত প্রদেশ	১০	০৭
বোম্বাই	০৯	০৯
সিন্ধু	০৮	১৩
বিহার	০৭	০২
মধ্যভারত	১২	১৩
মহিশূর	০৬	০
বাংলা	০২	০
বেলুচিস্তান	০	০৩
	৪৮৬	২২৪

রিপোর্টে কাইয়েমে জামায়াত (সেক্রেটারী জেনারেল) বলেন,
দেশের অভ্যন্তরে জামায়াতের প্রভাব যথেষ্ট বেড়েছে এবং যেসব এলাকায় জামায়াতের আওয়াজ পৌঁছে ছিল না সেসব এলাকায়ও পৌঁছে গেছে। যথা আসাম, রাজপুতনা, মধ্যপ্রদেশ ও বেলুচিস্তান।

www.pathagar.org

ভারতের বাইরে আমেরিকা, আফ্রিকা, আরব, ইরান ও ইংল্যান্ডেও আমাদের আওয়াজ পৌছেছে এবং আমাদের সাহিত্যের দাবী উঠছে যা আমরা পূরণ করতে পারছি না। ইন্দেনেশিয়ায় আমাদের এক বন্ধু তাঁদের স্থানীয় ভাষায় আমাদের দাওয়াত ছড়াবার ইচ্ছা পোষণ করেন। মহিলাদের মধ্যে কাজ শুরু হয়েছে এবং যাদের কোলে নতুন বংশধরের লালন-পালন হয়, তাদের মধ্যে আরও বেশী কাজ হওয়া দরকার। দু'শ চব্বিশ জন রুকনিয়াত (সদস্যপদ) প্রার্থী। তাদের মধ্যে ষাটজনের অধিক মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্র। আনন্দের বিষয় আরবী শিক্ষাঙ্গনেও আমাদের সাহিত্য প্রবেশাধিকার লাভ করেছে।

আধুনিক শিক্ষিত সমাজে আমাদের সাহিত্যের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। তাদের মধ্যে পরিবর্তনও দেখা যাচ্ছে। আশা করা যায় যে, তাঁদের মধ্য থেকে এমন লোক পাওয়া যাবে যাঁরা কেন্দ্রে নেতৃত্ব দিতে পারবেন। আমীরে জামায়াত স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার কারণে গত বছর শুধু লাহোর ও দিল্লী কয়েকবার সফর করেছেন। কাগজের স্বল্পতা ও ছাপাখানার অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্র থেকে গত বছর পঞ্চাশ হাজার ছোট-বড় গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে এবং ছড়ানো হয়েছে। স্থানীয়ভাবেও অনেক স্থান থেকে আন্দোলনের সাহিত্য তৈরী হয়েছে। এ যাবৎ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে ১,১৪,২০০ গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় বাধা কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা। এ শুধু যুদ্ধের কারণে।

আরবী ভাষায় তরজমার জন্যে দারুল আরুবা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এ বিভাগে কাজ শুরু করেছেন মাওলানা মাসউদ আলম নদভী ও মাওলানা জলীল আহসান নদভী।

তুর্কী ভাষায় জামায়াত সাহিত্যের তরজমা শুরু করছেন আযম হাশমী, ইংরেজী ভাষায় দীনিয়াত, রাজনৈতিক মতবাদ, ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী জাতীয়তার তরজমা হয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যা, নৈতিক দৃষ্টিকোণ, শান্তিপথ, আল্লাহর পথে জিহাদ, এ ক'টির ইংরেজী তরজমা হয়েছে এবং মাওলানা এসব দেখছেন। শিগগির এগুলো ছাপানো হবে। ইংল্যান্ডে আমাদের দুজন বন্ধু ইংরেজী সাহিত্য তৈরীর অনুমতি চাইলে তা দেয়া হয়। সিন্ধী ভাষায় চারখানা বই তরজমা হয়েছে। অনুরূপভাবে গুজরাটী ভাষায়ও তরজমা হয়েছে। মালাবারের ভাষা মালায়ালামে প্রকাশনা বিভাগ খোলা হয়েছে। তামিল ভাষায়ও প্রকাশনা শুরু হয়েছে। কর্নাটকের স্থানীয় ভাষায় কয়েকটি পুস্তকের তরজমা হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও দুটি জিনিসের তরজমা হয়েছে। পুশতু ভাষায় দুটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দী ভাষায় এখনও কাজ শুরু হয়নি।

www.pathagar.org

আমাদের জামায়াতের সাথে পরামর্শক্রমে মজলিসে শূরা নিম্নলিখিত বিভাগগুলো খোলার সিদ্ধান্ত করে এবং প্রত্যেক বিভাগের একজন করে দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয় ঃ

বিভাগ	দায়িত্বশীল
১। আরবী তরজমা ও সাহিত্য রচনা	মাওলানা মাসউদ আলম নদভী, জলন্ধর।
২। কুরআনের আলোকে ইসলামী দাওয়াত সম্পর্কে প্রবন্ধাদি-	মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান, মালির কোটশা, পাঞ্জাব।
৩। সমালোচনামূলক সাহিত্য-	মাওলানা আবদুস সালাম নঈম সিদ্দীকী, দারুল ইসলাম, পাঠানকোট।
৪। গণ সাহিত্য-	মাওলানা নাযিরুল হক মিরাঠী।
৫। সাংবাদিকতা-	মালিক নসরুল্লাহ খান আযীয, লাহোর।
৬। রাজনীতি-	জনাব আব্দুল বশীর আযরী, অধ্যাপক, ইসলামিয়া কলেজ, লাহোর।
৭। অর্থনীতি-	সাইয়েদ নকী আলী, প্রধান শিক্ষক ওয়াস্তানিয়া হাইস্কুল, কুটলা, দাক্ষিণাত্য।
৮। ইতিহাস-	জনাব খাজা মুহাম্মদ সিদ্দীক, অ্যাংলো-এরাবিক সেকেন্ডারী হাইস্কুল, দিল্লী।
৯। দর্শন-	জনাব মমতাজ হুসাইন- (ঐ)
১০। আইন-	জনাব আব্দুল আযীম খান, মুন্সেফ, টুং।
১১। ইংরেজী সাহিত্য-	অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াকুব, এম, এ সরকারী কলেজ, রহতক।
১২। ইংরেজী তরজমা-	জনাব এ, আর, সূফী, শিমলা।
১৩। হিন্দী তরজমা-	হাফেয মুহাম্মদ ইমামুদ্দীন, রাসনগর, বেনারস।
১৪। সিন্ধী তরজমা-	জনাব হাফেয মাওলানা আবদুর রাযযাক সিন্ধ মাদরাসাতুল ইসলাম, করাচী।
১৫। গুজরাটী তরজমা-	জনাব ইসমাঈল ওসমান এখলাস, বোম্বাই।
১৬। বাংলা তরজমা	জনাব সাইয়েদ মুহাম্মদ হুসনাইন, বাকীপুর, পাটনা।
১৭। মালিয়াঁলাম তরজমা-	হাজী মুহাম্মদ আলী, ইসলামিক পাবলিশিং হাউস, মালীবার।

www.pathagar.org

১৮। তামিল তরজমা-	শায়খ আবদুল্লাহ
১৯। পশ্‌তু তরজমা-	কাজী আব্দুর রাযযাক, পেশাওর।
২০। ফারসী তরজমা-	জনাব মাহমুদ ফারুকী, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য)
২১। পাঠ্য পুস্তক	জনাব আব্দুল জাব্বার গাজী, দারুল ইসলাম, পাঠানকোট।
২২। সরল সাহিত্য (শিশুদের জন্য)-	মুহাম্মদ শফী গাযিয়াবাদী, দিল্লী।
২৩। রস সাহিত্য-	জনাব মমতাজ হোসেন, শিক্ষক, অ্যাংলো-এরাবিক স্কুল, দিল্লী।
২৪। কবি মহলে কাজের জন্যে-	জনাব নঈম সিদ্দীকী।
২৫। ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির- সংগে কাজের জন্যে-	জনাব শায়খ সুলতান আহমদ, ফেয়ার প্রাইস্ শপ্ লালবাগ সার্কাস/লাক্ষ্ণৌ।

www.pathagar.org

জামায়াতে ইসলামীর

শূরায়ী নিযামের (পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থার) ক্রমোন্নতি

জামায়াতে ইসলামী একটি সাংবিধানিক পরামর্শ ভিত্তিক সংগঠন। সকল প্রকার সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী পরামর্শের ভিত্তিতেই করা হয়। জামায়াতে ইসলামীর প্রথম গঠনতন্ত্র (Constitution) রুকনদের প্রথম প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে অনুমোদিত হয়। জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী করা হয়েছে- ইসলামের পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে। এতে আমীরে জামায়াতকে এ এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল যে, তিনি রুকনদের মধ্য থেকে সঠিক অভিমত ব্যক্ত করতে সক্ষম এমন কিছু লোককে বেছে নেবেন এবং তাঁদের পরামর্শক্রমে জামায়াতের কাজকর্ম পরিচালনা করবেন। প্রথমেই এ কথা স্থিরীকৃত করা হয়েছিল যে, পারস্পরিক পরামর্শই দলীয় জীবনের প্রাণশক্তি। এটাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা যাবে না। যার উপর কোন কাজের দায়িত্ব থাকে, তার জন্যে অপরিহার্য যে, সে অন্যান্য সহকর্মীর পরামর্শে কাজ করবে। যার নিকট থেকে পরামর্শ নেয়া হবে, তার জন্য ফরয এই যে, সে নেক নিয়তসহ তার সঠিক অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করবে। কারণ, যে ব্যক্তি পরামর্শ বৈঠকে আপন বিবেচনা অনুযায়ী অভিমত পেশ করা থেকে বিরত থাকে, সে জামায়াতের উপর যুলুম করে। আর যে ব্যক্তি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে আপন বিবেক-বিচেনার পরিপন্থী কোন অভিমত প্রকাশ করে, সে জামায়াতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। যে পরামর্শকালে আপন মতামত গোপন করে এবং পরে যখন তার মতের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত হয়, তখন সে জামায়াতের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টির চেষ্টা করে, সে চরম খেয়ানতের অপরাধ করে বসে। এসব ধারণাকে সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামী তার ব্যবস্থা পরামর্শ গ্রহণের সাংবিধানিক রীতিনীতি কায়েম করেছে।

জামায়াতে ইসলামী পরামর্শের একটা সীমাও নির্ধারণ করে দিয়েছে। জামায়াতের ঐতিহ্য অনুযায়ী কারো আপন অভিমতের উপর এতটা জিদ ধরা উচিত নয় যে, তার অভিমত মানতেই হবে নচেৎ সে জামায়াতের কাজে সহযোগিতা করবে না। অথবা জামায়াতের পরিপন্থী কাজ করবে। কতিপয় অজ্ঞ ব্যক্তি তাদের অজ্ঞতার কারণে এ ধরনের আচরণকে সঠিক মনে করে। অথচ এ ধরনের আচরণ ইসলামী নির্দেশ ও সাহাবায়ে কেরামের সর্বসম্মত কর্মপদ্ধতির একেবারে পরিপন্থী। তাঁদের কর্মপদ্ধতি এই ছিল যে, যতোক্ষণ কোন বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকতো, তাঁদের প্রত্যেকে আপন জ্ঞান ও বিবেচনা অনুযায়ী ততোক্ষণ সুস্পষ্টরূপে তাঁর

www.pathagar.org

অভিমত ব্যক্ত করতেন এবং অভিমতের সপক্ষে যুক্তিও পেশ করতেন। কিন্তু যখন কারো মতের বিপরীত সিদ্ধান্ত হতো, তখন তিনি হয় তার মত প্রত্যাহার করতেন অথবা অভিমত সঠিক মনে করা সত্ত্বেও উদারতাসহ জামায়াতের সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন। জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে পরামর্শের এ পন্থা প্রথম দিন থেকেই প্রচলিত আছে।

এ পন্থা অনুযায়ী মজলিসে শূরা (পরামর্শ সভা) গঠিত হয়। প্রথম মসলিসে শূরার পর দ্বিতীয় বার ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১৬ জনকে নিয়ে মজলিসে শূরা গঠিত হয়।

অবশ্য ১৯৪৬ সালের এলাহাবাদ রুকন সম্মেলনে স্থিরীকৃত হয় যে, মজলিসে শূরার নির্বাচনে গোটা জামায়াতের অভিমত গ্রহণ করা হবে। পন্থা এই ঠিক করা হলো যে, আমীরে জামায়াত গোটা জামায়াতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার মধ্য থেকে কয়েক জন সবচেয়ে উপযুক্ত লোক বেছে নিবেন। তারপর প্রত্যেক রুকনের মতামত গ্রহণ করা হবে। তাদের মতামতের ভিত্তিতে আমীরে জামায়াত তাঁর শূরা নির্ধারিত করবেন। তাই করা হলো এবং এটাই ছিল জামায়াতে ইসলামীর রুকনগণ কর্তৃক প্রথম নির্বাচিত মজলিসে শূরা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ শূরার সদস্য নির্বাচিত হন ঃ

০১। মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
০২। মাওলানা মাসউদ আলম নদভী
০৩। মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল, মাদ্রাজ
০৪। মাওলানা আব্দুল জাব্বার গাজী
০৫। মাওলানা আব্দুল গাফ্ফার হাসান
০৬। মালিক নাসরুল্লাহ খান আযীয
০৭। খান সরদার আলী খান, সীমান্ত প্রদেশ
০৮। জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দীকী, টুং
০৯। সরদার মুহাম্মদ আকবর খান, ক্যাম্বেলপুর
১০। কাজী হামীদুল্লাহ- শিয়ালকোট
১১। সাইয়েদ আব্দুল আযীয শার্কী
১২। চৌধুরী শফী আহমদ, ইউ, পি

মিয়া মুহাম্মদ তুফাইল কাইয়েম পদাধিকার বলে শূরার সদস্য ছিলেন।

এ শূরা এক বছর স্থায়ী থাকে। অবশেষে সাতচল্লিশের মে মাসে দারুল ইসলামে যে রুকন সম্মেলন হয়, তাতে নতুন করে শূরা নির্বাচিত হয়। এবার আমীরে

www.pathagar.org

জামায়াত রুকনদের গোপন ব্যালট ভোটে শূরা সদস্য নির্বাচিত করেন। নির্বাচিত শূরা সদস্যগণ ছিলেন নিম্নরূপ ঃ

০১। মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
০২। মাওলানা মাসউদ আলম নদভী
০৩। মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল (মাদ্রাজ)
০৪। মাওলানা আব্দুল হক (চাচড়ান শরীফ)
০৫। জনাব গাজী আব্দুল জাব্বার
০৬। মালিক নাসরুল্লাহ খান আযীয
০৭। খান সরদার আলী খান
০৮। মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দীকী
০৯। কাজী হামীদুল্লাহ (শিয়ালকোট)
১০। চৌধুরী শফী আহমদ
১১। মৌলভী মুহাম্মদ ইউনুস (হায়দরাবাদ)
১২। চৌধুরী আলী আহমদ খান।

রুকনদের ভোটে নির্বাচিত মজলিসে শূরায় পূর্বের শূরার তুলনায় তিনজন নতুন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। মাওলানা আব্দুল গাফ্ফার হাসান, মাওলানা আব্দুল আযীয শার্কী এবং সরদার মুহাম্মদ আকবরের স্থলে মাওলানা আব্দুল হক, মৌলভী মুহাম্মদ ইউনুস এবং চৌধুরী আলী আহমদ খান নির্বাচিত হন।

এ মজলিসে শূরার প্রথম বৈঠক সাতচল্লিশের ৯ই জুলাই দারুল ইসলামে অনুষ্ঠিত হয়। দেশের পরিস্থিতিকে সামনে রেখে জামায়াতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

জামায়াতে সমালোচনার নিয়মিত ব্যবস্থা

প্রথম দিন থেকেই জামায়াতে ইসলামী তার মধ্যে সমালোচনার প্রাণশক্তি জীবন্ত ও জাগ্রত রাখার ব্যবস্থা করেছে। তার সাহায্যে জামায়াতের প্রতিটি ত্রুটিবিচ্যুতি যথাসময়ে চিহ্নিত হয়েছে এবং আভ্যন্তরীণ সংস্কার-সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে। জামায়াতের নিকটে নৈতিক দিক দিয়ে সমালোচনার মর্যাদা ঠিক সেইরূপ, বস্তুগত দিক দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মর্যাদা যেমন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও আবিলতামলিনতার অনুভূতি দূরীভূত হলে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ বন্ধ হয়ে গেলে জনপদের গোটা পরিবেশ দূষিত হয়ে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়। তেমনি সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখা চক্ষু যদি বন্ধ হয়ে যায়, সমালোচনাকারীর মুখ ও শ্রোতার কান যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সমাজ-জীবন অনিষ্ট-অনাচারের লীলাভূমি হয়ে পড়ে।

www.pathagar.org

এ কারণেই জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে সমালোচনার পরিবেশ উন্মুক্ত ও উপযোগী রাখা হয় এবং স্বাধীনভাবে সমালোচনার জন্যে উৎসাহ দান করা হয় যাতে করে যথাসময়ে ত্রুটিবিচ্যুতি চিহ্নিত করা যায়। জামায়াতে সমালোচনার শুধু অধিকারই নেই বরঞ্চ তা অপরিহার্য ফরয। জামায়াত সদস্যদের দায়িত্বের মধ্যে এ বিষয়ও শমিল যে, যখনই কেউ জামায়াত, তার কাজর্ম এবং তার নেতাদের মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পাবে, তৎক্ষণাৎ সে বিনাদ্বিধায় তা বলে দেবে এবং সংশোধনের আহ্বান জানাবে। যার সমালোচনা করা হয়, তাকেও অভ্যস্ত করা হয় যে, সমালোচনা সে হাসিমুখে সহ্য করবে, শান্ত মনে সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবে। যে বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে তা সংশোধন করবে অথবা কোন ভুল ধারণাপ্রসূত হয়ে থাকে, তাহলে তা দূর করবে।

এ কর্মপন্থার দ্বারা কখনো কিছুটা খারাপ প্রতিক্রিয়া হলেও তার মধ্যে অনেক বেশী পরিমাণে মঙ্গলকারিতা রয়েছে। জামায়াতকে ভাঙন থেকে এ পন্থাই রক্ষা করে এবং কর্মীদের মধ্যে অনাবিল ভ্রাতৃত্বভাব, একাত্মতা, পারস্পরিক আন্তরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে।

সমাজের মধ্যে জামায়াতের প্রভাব বিস্তার

একটা আদর্শিক আন্দোলন হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর নিকট সমাজের সর্বত্র তার প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার জন্যে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল যে, সর্বপ্রথম শিক্ষিত মহলকে জামায়াতের দাওয়াত সম্পর্কে অবহিত করা হবে। কারণ, শিক্ষিত মহলই গোটা সমাজকে পরিচালিত করে থাকে। এ ব্যাপারে জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা জামায়াত প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পূর্বেই সমাজের মধ্যে তাঁর আদর্শ, মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির বীজ বপন করতে থাকেন। বারো বছর যাবৎ তিনি তাঁর চিন্তার চাষ করেন এবং অবশেষে জামায়াতে ইসলামীর চারা রোপণ করেন। এ প্রাথমিক শ্রমের ফলে যখন তিনি জামায়াত গঠনের উদ্দেশ্যে তাঁর চিন্তাধারায় প্রভাবিত লোকদেরকে একত্রে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান, তখন দেখা গেল যে, তার পূর্বেই বিভিন্ন স্থানে তাঁর চিন্তার ফসল স্বরূপ দাওয়াতী কাজের সূচনা হয়েছে।

জামায়াত প্রতিষ্ঠার পর দাওয়াতী কাজ সুশৃঙ্খল ও সংগঠিত করার লক্ষ্যে রীতিমত দাওয়াত ও তবলীগ নামে একটি বিভাগ খোলা হয়। এ বিভাগ সম্পর্কে জামায়াতের প্রথম বৈঠকেই স্থিরীকৃত হয় যে, প্রত্যেক রুকন এ বিভাগের একজন সদস্য হবেন। তাঁকে সর্বদাই একজন মুবাল্লিগের জীবন যাপন করতে হবে। তাঁর জন্যে এটা অপহির্য হবে যে, যেখানে যে মহলেই তাঁর প্রবেশের সুযোগ হবে, সেখানেই তিনি জামায়াতে দাওয়াত পেশ করবেন এবং জামায়াতের নিয়ম-নীতির

www.pathagar.org

বিস্তারিত আলোচনা করবেন। সে জন্যে প্রথম বৈঠকেই সমাজের মধ্যে দাওয়াত ছড়িয়ে জামায়াতের প্রভাব বিস্তারের জন্যে আটটি বিভাগ কায়েম করা হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সামাজিক মর্যাদাকে সামনে রেখে এ বিভাগগুলো কর্মীদের মধ্যে বন্টন করা হয়। বিভাগগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। কলেজ ও আধুনিক শিক্ষিত লোকদের বিভাগ
২। উলামা ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের বিভাগ
৩। পীর ও মাশায়েখদের বিভাগ
৪। রাজনৈতিক দলের বিভাগ
৫। শহরবাসীদের বিভাগ
৬। পল্লীবাসীদের বিভাগ
৭। মহিলা বিভাগ
৮। অমুসলিমদের বিভাগ

সেই সাথে এ সিদ্ধান্তও করা হয় যে, প্রত্যেক রুকন তার নিজের ব্যাপারে এ চিন্তাভাবনা করে দেখবে যে, তার যোগ্যতা ও আগ্রহ অনুযায়ী কোন্ শ্রেণীর মধ্যে দাওয়াতী কাজ করার জন্যে সে সর্বাধিক যোগ্য। তারপর যে শ্রেণীর মধ্যে কাজ করার জন্যে সে তার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিজেকে যোগ্য মনে করবে সে শ্রেণীর মধ্যেই সে কাজ করবে এবং অন্য কোন শ্রেণীতে কাজ করা থেকে বিরত থাকবে। অন্যথায় দাওয়াতে আকৃষ্ট করার পরিবর্তে লোককে দূরে ঠেলে দেয়াও হতে পারে।

একদিকে ছিল এ কর্মবন্টন এবং অপরদিকে জামায়াতে প্রবেশ করার জন্যে কিছু শর্তও আরোপ করা হয়। এসব শর্ত পূরণ ব্যতিরেকে কেউ জামায়াতের রুকন বা সদস্য হতে পারে না। একে তো মুসলিম সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিরই এ শর্তগুলি পূরণ করা উচিত। শর্তগুলো হচ্ছে ইসলাম যেসব জিনিস ফরয করেছে তা অবশ্যই পালন করতে হবে এবং যা হারাম করেছে তা থেকে দূরে থাকতে হবে। এ এমন কোন কঠিন শর্ত নয়। একজন মুসলমানকে কার্যত মুসলমান হওয়ারই তাকীদ করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমান জাতির অধঃপতন যুগে অতি অল্প লোকেই মুসলমানিত্বের এ নিম্নতম দাবীগুলো পূরণ করে। হালাল-হারাম, ফরয-ওয়াজেব প্রভৃতির পরোয়া যদি কোন মুসলমান না করে, তাহলে কার্যত একজন অমুসলমান ও তার মধ্যে পার্থক্য রইলো কোথায়? তার দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের কোন কল্যাণের আশা করা যায় কি? দুঃখের বিষয়, মুসলমানদের এতোটা অধঃপতন হয়েছে যে, শরিয়ত যে বাধা-নিষেধ আরোপ করেছে তা গ্রহণ করা তাদের জন্যে বড়ো কঠিন হয়ে পড়েছে। এসব থেকে মুক্ত, স্বাধীন ও বেপরোয়া হয়ে থাকাটাই

www.pathagar.org

সাধারণ অভ্যাস ও নীতিতে পরিণত হয়ে পড়েছে এবং এটাই তাদেরকে ইসলামের মঙ্গল থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

এ সমস্যাটি ছিল জামায়াতে ইসলামীর এক অতি বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা একদিকে তার লক্ষ্য ছিল জাতির বিশেষ করে মুসলমানদের সার্বিক সংস্কার এবং তার জন্যে প্রয়োজন এমন সব লোকের যারা কুরআন ও সুন্নাহর নিম্নতম দাবীপূরণে সক্ষম এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের সংখ্যা হবে অতি অল্প। অপরদিকে জামায়াত একটি গণতান্ত্রিক ও ইসলামের প্রচারমূলক দল হিসেবে ইসলামী বিপ্লবের জন্যে অধিক সংখ্যক লোককে তার সাথে সংশ্লিষ্ট করতে চায়। এ উভয় অবস্থার টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই তাকে ইসলামী বিপ্লবের পথ বের করে নিতে হয়। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জন্যে অধিক সংখ্যক লোকের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন হয় এবং একটি আদর্শিক দলে আদর্শ ও মতবাদের পূর্ণ উপলব্ধি, তদনুযায়ী চরিত্র গঠন এবং সে রঙে জীবনকে গড়ে তোলা বিরাট অগ্নিপরীক্ষার বিষয়। আর এ অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে সকলে চায় না। যদি দু'চার আনার চাঁদা গ্রহণ করে সকল শ্রেণীর সাধারণ মানুষের জন্যে দলে ভর্তি হওয়ার দ্বারা উন্মুক্ত ও অবারিত রাখা হয়, তা হলে আদর্শিক লক্ষ্য বিনষ্ট হয়ে যায়। আবার যদি আদর্শিক মানদণ্ডে কঠোরতার সাথে যাচাই-বাছাই করে লোক নেবার ব্যবস্থা করা হয়, তা হলে অতি অল্প লোকই এ মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারে। আর এর দ্বারা গণতান্ত্রিক দাবীও পূরণ হতে পারে না।

যা হোক, এ বড়ো কঠিন কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম, একটানা সংগ্রাম, অপরাজেয় মনোবল এবং আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও নির্ভরশীলতা দুর্গম পথকে সুগম করে দিতে পারে বলে প্রকৃত মুমিনের দৃঢ় প্রত্যয় থাকে। আর এ ভাবেই জামায়াতে ইসলামীর অগ্রযাত্রা সম্ভব হতে পারে। অথএব জামায়াত তার আদর্শিক দাওয়াত ও বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডারের সাহায্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে তার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। বলতে গেলে তার উৎসর্গীকৃত (Dedicated) কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কাজের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়।

উলামায়ে কেরামের মধ্যে দাওয়াতের প্রভাব

মুসলিম সমাজে আলেমদের একটা বিশেষ স্থান রয়েছে এবং তাঁরা যদি কোন দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হন, তা হলে সমাজে সে দাওয়াতের পথ সুগম হয়ে যায়। জামায়াতে ইসলামী অবশ্য উলামায়ে কেরামের একটি প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও উদারচেতা শ্রেণীকে প্রভাবিত করেছিল, যাঁরা ছিলেন মানব দরদী ও চিন্তাশীল। তাঁরা ছিলেন সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থেরও উর্ধে। ইসলামের পতন যুগে চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে যে স্থবিরতা বিরাজ করছিল এবং আদর্শের স্থান অধিকার করেছিল ব্যক্তিত্ব- যেখান

www.pathagar.org

থেকে এ মন্ত্র ফুৎকারিত হচ্ছিল-

خطائی بزرگان گرفتن خطا أست

এ সবের উর্ধেও তাঁরা অবস্থান করছিলেন। তাঁরা খালেস হককে হক বলে স্বীকার ও ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি- তাঁদের অনেকেই জামায়াত প্রতিষ্ঠাকালেই তার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নোমানী- সম্পাদক মুদীরুল কুরআন, লাখনো।

মাওলানা সিবগাতুল্লাহ বখতিয়ারী ফাজেলে দেওবন্দ, দারুল ইরশাদ, মাদ্রাজ।

মাওলানা মুহাম্মদ জাফর ফুলওয়ারভী, খতীব জামে মসজিদ, কাপুরথালা।

মাওলানা নাযীরুল হক মিরাঠী।

মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ।

মাওলানা সাইয়েদ আব্দুল আযীয শার্কী।

মাওলানা মুহাম্মদ আলী কান্ধলভী, শিয়ালকোট।

মাওলানা মৌলভী আব্দুল কাদের আজেয, কাসুরী

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ রুড়ী, হিসার।

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, মাদ্রাজ।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস নদভী গুন্দলভী।

মাওলানা ইলাহী বখশ ডেরাজাড়া সারগোধী।

উপরোক্ত উলামায়ে কেরাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জামায়াতের প্রথম প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে এতোজন উলামার উপস্থিতি এ কথারই প্রমাণ যে উলামায়ে কেরামের মতে আকীদাহ ও আখলাকের দিক দিয়ে জামায়াতে ইসলামী ছিল একেবারে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বীনের দৃষ্টিতে কারো কোন আপত্তির কারণ ছিল না। কোন আলেমের পক্ষ থেকেও কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। এ তাঁদের মনেরই আওয়াজ ছিল। তারপর উলামায়ে কেরাম জামায়াতে ইসলামীর হকের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সপক্ষে বহু প্রবন্ধাদিও লিখেছেন। এর প্রচারও করেছেন, তার বিরোধিতার মুকাবিলাও করেছেন। কোন কোন দ্বীনী মাদ্রাসা তো এর দাওয়াতের কেন্দ্র হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে সরাইমীরের মাদ্রাসাতুল ইসলাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বয়ং দারুল উলুম দেওবন্দ এবং মাযাহেরুল উলুম সাহরানপুরের উস্তাদ ও ছাত্রগণ জামায়াতের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে সেসব স্থানে দাওয়াতের ইউনিট পর্যন্ত কায়েম করেছেন। তাঁরা জামায়াতের সাহিত্যও পড়াশুনা করতেন। জামায়াতে ইসলামী কোন ফেক্হী মাসলাকের উর্ধে থেকে শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতেই কথা বলতো।

www.pathagar.org

জামায়াতে ইসলামী প্রাথমিক পর্যায়ে দেশকে ৫টি ভাগে বিভক্ত করে দাওয়াতী কাজের সূচনা করে এবং এক একটি বিভাগের দায়িত্বশীল হিসেবে নায়েবে আমীর নিযুক্ত করেন। তারা ছিলেন মাওলানা মনযুর নোমানী, মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, মাওলানা সাইয়েদ সেবগাতুল্লাহ এবং মাওলানা মুহাম্মদ জাফর ফুলওয়ারভী। এভাবে দেশের সংগঠনের জন্যে প্রথম নায়েবে আমীরের পদ অলঙ্কৃত করেন দেশের প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম। এভাবে প্রথম মজলিসে শূরায় যে ষোলজন সদস্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে আটজনই প্রখ্যাত আলেম ছিলেন।

অবশ্য পরবর্তীকালে জামায়াতের যে বিরোধিতা শুরু হয় তার কারণ এই যে, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তাঁর প্রবন্ধাদিতে জাতীয়তাবাদী আলেমদের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁদের ভৌগোলিক জাতীয়তার তীব্র সমালোচনা করে মাওলানা তা খণ্ডন করেন। দুর্ভাগ্যবশত আলেমদের একটি বড়ো দল মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর প্রভাবে অমুসলিমদের সাথে একজাতীয়তার পতাকাবাহী হয়ে পড়েছিলেন।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মরহুম একজন শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন ও সুপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বাস্তব জীবন ছিল তাঁর প্রাথমিক চিন্তাধারার পরিপন্থী। তিনি এককালে ইসলামী জাতীয়তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত আল-হেলাল পত্রিকায় তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, "হিন্দু আওর মুসলমানোঁ কো আপস্ মে মেলা কর এক কাওমিয়াত কি তা'মীর কিয়া চীজ হ্যায়? কিয়া ইনমে সে এক পানি আওর দুসরা তেল নিহি"-এ তাঁর ১৯২৮ সালের বক্তব্য। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর মনোভাব কেন পরিবর্তন করেন তিনি তা নিজেই জানতেন। হয়তো খেলাফত আন্দোলনের চরম ব্যর্থতা তাঁকে পুরোপুরি নৈরাশ্যবাদী করে ফেলেছিল এবং মুসলিম মিল্লাতের জন্যে সঠিক পথ খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হন। নৈরাশ্যের অন্ধকার তাঁকে হয়তো সত্য সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেনি। এ আমার নিজস্ব ধারণা।

যা হোক, জাতীয়তার যে গোলকধাঁধা হিন্দু কংগ্রেস সৃষ্টি করেছিল এবং যার সপক্ষে দেশব্যাপী (Muslim Mass Contact Movement) শুরু হয়েছিল, তাতে অনেক আলেম বিভ্রান্ত হলেও আলেমগণের একটা বিশিষ্ট মহল মাওলানা মওদূদীর ইসলামী দাওয়াতকে তাঁদের প্রাণে স্পন্দন সৃষ্টিকারী মনে করে সাড়া দিয়েছিলেন এবং সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিলেন। মাওলানা মওদূদীর দাওয়াতে যাঁরা লাব্বায়েক বলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, মাওলানা জলীল আহসান নদভী, মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান, মাওলানা আখতার আহসান নদভী, মাওলানা আবুল্লাইস নদভী, মাওলানা

www.pathagar.org

আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা মাসউদ আলম নদভী প্রমুখ প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম।

মাওলানা মাসউদ আল নদভী মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারায় প্রভাবিত হওয়ার পর মাওলানা মওদূদীকে লিখে জানান যে, তিনি জামায়াতে ইসলামীর রুকন হতে চান। কিন্তু হাঁপানির চিররোগী হওয়ার কারণে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতে অক্ষম। মাওলানা তার জবাবে বলেন, রোগী ব্যক্তি কি মুসলমান হতে পারে না? অথবা মুসলমান কি কখনো রোগী হতে পারে না? এ যুক্তির পর মাওলানা মাসউদ আলম নদভী জামায়াতের রুকন হন। রুকন হওয়ার পর তিনি জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্য আরবী ভাষায় তরজমা করেন। জামায়াতে ইসলামীকে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে পরিচিত করেন এবং এর বিশ্বজনীন বুনিয়াদ স্থাপন করেন। তার জন্যেই আজ গোটা ইসলামী দুনিয়ায় মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী দুটি অতি সুপরিচিত ও অতি প্রিয় নাম।

মাওলানা মাসউদ আলম নদভী মরহুম ছিলেন আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ও স্কলার। আরব দেশগুলোর পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধাদি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে এবং তিনি ছিলেন আরবী ভাষায় খ্যাতিমান সাহিত্যিক। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় দারুল আরোবার প্রতিষ্ঠা করে তিনি বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হন। তাঁর জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানে ফলে নদওয়াতুল উলামার চিন্তাধারার অঙ্গন থেকে বহু যোগ্য ব্যক্তি জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন।

মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর জামায়াতে যোগদান যেমন বিস্ময়কর তেমনি প্রেরণামূলক। তিনি ছিলেন মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহীর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাতুল ইসলাহ সরাইমীর-এর গদীনশীল আল ইসলাহ পত্রিকার সম্পাদক, কংগ্রেস সমর্থক জাতীয়তাবাদী আলেমগণের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত তাঁকে এতোখানি অনুপ্রাণিত করে যে, ইমাম ফারাহীর গদি ও আল ইসলাহ পত্রিকার সম্পাদনা পরিত্যাগ করে সামান্য বিছানা-কম্বল বগলে দাবিয়ে আপন জন্মস্থানকে চির বিদায় দিয়ে দেওয়ানা মস্তানের বেশে দারুল ইসলামের ন্যায় একটি গ্রাম্য বস্তিতে গিয়ে হাজির হন। সামান্য লটবহর নিয়ে শর্না রেলস্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে দারুল ইসলামের সীমানায় পা দিতেই মাওলানা মওদূদী তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে আনন্দের আতিশয্যে অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি।

মাওলানা ইসলাহীর জামায়াতে যোগদানের পর পরই বহু উলামায়ে কেরামও যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা হাকীম আব্দুর রহীম আশরাফ, মাওলানা মুহাম্মদ চেরাগ,

www.pathagar.org

মাওলানা মুফতী সাইয়াহুদ্দীন কাকাখেল, মাওলানা ওসী মাযহার নদভী, মাওলানা ফতেহ মুহাম্মদ প্রমুখ।

এভাবে উলামায়ে কেরামের আন্দোলনে যোগদানের অনুপাত এতোটা বেড়ে যায় যে, ১৯৪৫ সালে জামায়াতের রুকনিয়াতের জন্যে যে ২২৪ জন আবেদন করেন, তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত উলামার সংখ্যা ছিল ষাট। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্র এবং মাদ্রাসার সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ। মাওলানা মওদূদীর দাওয়াতের যে বিশেষ দিকটি সর্বত্র গৃহীত হয় এবং আলাপ-আলোচনায়, সভা-সমিতিতে, দ্বীনী মাহফিলসমূহে তা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, তা হচ্ছে-হাকেমিয়াত তথা সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) একমাত্র আল্লাহ তায়ালার।

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

হুকুম শাসন করার, আইন রচনা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার।

আধুনিক শিক্ষিত লোকের মধ্যে জামায়াতের প্রভাব

আধুনিক শিক্ষিত লোকদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর প্রভাব দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। তার কারণ জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার প্রতিটি কথা ও বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত, হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী। কুরআনের বক্তব্যকে তিনি এক খোদাপ্রদত্ত প্রকাশ ভঙ্গিমায় শ্রোতার সামনে তুলে ধরতেন, যা সহজেই মানুষের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতো। শিক্ষিত সমাজ অবাস্তব ও অমূলক গল্প-কাহিনীর পরিবর্তে যুক্তি-প্রমাণের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এজন্যে আধুনিক শিক্ষিত লোকের মধ্যে যাঁরা দ্বীনের চেতনা ও প্রেরণা রাখেন, জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত তাদের মনেরই প্রতিধ্বনি করে এবং দ্রুতগতিতে তাঁরা জামায়াতের দিকে ধাবিত হন।

আধুনিক শিক্ষিত লোকের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জীবন দর্শনের প্রভাব-চিন্তার বিভ্রান্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গির বিকৃতি বিদ্যমান ছিল। আধুনিক যুগের জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি আধুনিক চিন্তাধারার কারণে অলৌকিকত্ব ও অমূলক গল্প-কাহিনীর তুলনায় যুক্তিবাদিতা তাঁদের মনে আবেদন সৃষ্টি করে। মাওলানা মওদূদী তাঁর শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণাদির দ্বারা তাদের বিভ্রান্তি দূর করতে সক্ষম হন এবং তারা অল্প সময়ের মধ্যেই মাওলানার চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা-সম্মেলনে (২৬শে আগস্ট, ১৯৪১) এমন বহু আধুনিক শিক্ষিত যুবক যোগদান করেন যাঁরা সবে মাত্র জীবন সংগ্রামে পদক্ষেপ করছিলেন। কিন্তু মাওলানার বিপ্লবাত্মক আহ্বান তাঁদের জীবনের মোড় একেবারে পরিবর্তন করে দেয় এবং তাঁরা তাঁদের যথাসর্বস্ব ইসলামের জন্যে উৎসর্গ করেন।

www.pathagar.org

যাঁরা জামায়াতের প্রথম সম্মেলনে যোগদান করার পর জামায়াতে অন্তর্ভুক্ত হন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ

০১। জনাব কামারুদ্দীন খান- লাহোর

০২। জনাব মিস্ত্রী মুহাম্মদ সিদ্দীক- মাওলানা আবুল কালাম আযাদের ঘনিষ্ঠ সহচর।

০৩। ডাঃ সাইয়েদ নাযীর আলী যায়দী-

০৪। মালিক নাসরুল্লাহ খান আযীয- প্রখ্যাত সাংবাদিক

০৫। চৌধুরী মুহাম্মদ আকবর, এম, এ, বি, এড

০৬। জনাব আব্দুল জাব্বার গাজী, এমএ, বি, এড, প্রিন্সিপাল, অ্যাংলো এরাবিক কলেজ, দিল্লী

০৭। ডাঃ হাবীবুল্লাহ- বি,এ

০৮। সাইয়েদ মুহাম্মদ হুসাইন জামেয়ী বি এ

০৯। মালিক গোলাম আলী বি এ (পাকিস্তান শরিয়ত কোর্টের সাবেক বিচারপতি।)

১০। মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ, তৎকালীন উদীয়মান আইনজীবী

১১। মুহাম্মদ বিন আলী অলুভী

১২। চৌধুরী আব্দুর রহমান

১৩। জনাব ফজলুর রহমান নঈম সিদ্দীকী

১৪। সাইয়েদ মুহাম্মদ শাহ এম, এ

১৫। চৌধুরী নুসরাত হুসাইন বি, এ বি,টি

১৬। চৌধুরী গোলাম জিলানী বি,এ

এ সব লোকের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন যুবক এবং সবেমাত্র কলেজ শিক্ষা সমাপ্ত করে বেরিয়েছেন। কিছু শিক্ষার্থীও ছিলেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার মনোভাব নিয়েই এসেছিলেন।

মাওলানা মওদূদীর সহজ সরল অথচ মর্মস্পর্শী ও হৃদগ্রাহী প্রকাশভঙ্গি চুম্বকের মতো নওজোয়ানদেরকে আন্দোলনে টেনে এনেছিল। চৌধুরী আলী আহমদ খান (চাকুরীরত পুলিশ অফিসার), সাইয়েদ সিদ্দীকুল হাসান গিলানী বি, এ, জনাব বাকের খান বি, এ, জনাব এ আর সুর্ফী, চৌধুরী নাসীর আহমদ খান, বি,এ, সাইয়েদ নাসির আহমদ বি এ, খাযা মুহাম্মদ সিদ্দীক, এম, এ হাকীম ইকবাল হুসেন এম, এ, ডাঃ মুহাম্মদ সালাম সিদ্দীকী, জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দীকী, জনাব আব্দুল হাই বি, এস-সি, শাসস পীরজাদা, নযর মুহাম্মদ খালেদ, খালেদ

www.pathagar.org

সিদ্দীকী, হাকীম মুশতাক আহমদ প্রমুখ- যুবকদল জামায়াতে যোগদান করে তাঁদের অশেষ ত্যাগ ও কুরবানীর প্রমাণ দিয়েছেন।

যে কোন বিপ্লবী আন্দোলনে যুবকদের প্রয়োজন হয় বেশী এবং তারাই অধিকতর যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারে। আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে, বিশেষ করে ফেরাউনের বিরুদ্ধে হযরত মুসার (আঃ) আন্দোলনে যুবকবৃন্দই ছিলেন অগ্রগামী এবং নবী মুস্তাফার (সঃ) আন্দোলনের প্রাথমিক যুগে ষোল বছর থেকে আটত্রিশ বছরের যুবকগণই ছিলেন তাঁর সঙ্গী-সাথী। মাওলানা মওদূদীর ইসলামী আন্দোলনের ডাকে তাই যুবকরাই এসেছেন দলে দলে। তাঁরা জীবনের বাজী রেখে আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছেন।

১৯৪৫-৪৬ সালের বার্ষিক রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশ করা হয় যে, আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের আন্দোলনে যোগদানের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। যে বিষয়গুলো শিক্ষিত নওজোয়ানদেরকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল তা হলো বিপ্লবী মনোভাব, তাগুতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জিহাদী প্রেরণা, এক খোদার সার্বভৌমত্ব ব্যতীত অন্যান্য সকল সার্বভৌমত্ব প্রত্যাখ্যান, নবী মুহাম্মদের (সঃ) নেতৃত্বে অনুসরণ, আখেরাতে সকল কৃতকর্মের জবাবদিহির তীব্র অনুভূতি। এ সব চিন্তাধারা যুবকদেরকে সর্বাধিক আকৃষ্ট করে এবং এ সবের জন্যে তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত হয়। জামায়াতে প্রবেশের শর্তগুলো যদিও তাদের জন্যে ছিল অত্যন্ত কঠোর, তথাপি তারা চরম কুরবানীর পরিচয় দিয়ে শর্তগুলো পূরণ করেছে। যেমন ধরুন ঃ

১। জামায়াতে প্রবেশকারীকে ফরয ও ওয়াজেবসমূহ পুরোপুরি পালন করতে হবে, প্রতিটি হারাম কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

২। কোন নাজায়েয পন্থায় জীবিকা অর্জন করতে পারবে না।

৩। কারো কোন হক নষ্ট করে থাকলে হকদারকে তা ফেরত দিতে হবে।

আলেম সমাজের জন্যে এ সব শর্ত পালন তেমন কঠিন না হলেও, যারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়র ধর্মহীন ও নোংরা পরিবেশ থেকে এসেছে, তাদের এ সব শর্ত মেনে চলা চরম অগ্নিপরীক্ষার বিষয় বটে। কিন্তু যেহেতু ঈমানের অর্থই হচ্ছে কিছু গ্রহণ ও কিছু বর্জন এবং তার দাবী কুরবানীও–তাই এ কুরবানীর জন্যে যুবকদল অকাতরে এগিয়ে এসেছে।

জামায়াতে ইসলামী ও তাগুতী শাসন

জামায়াতে ইসলামী তথা শরিয়তের দৃষ্টিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ছিল অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী জালেম ও স্বৈরাচারী শক্তি। এ শক্তির সাথে

www.pathagar.org

সহযোগিতা করা কোন মুসলমানেরই শোভা পায় না। এ ছিল একটি ইসলামী বিরোধী তাগুতী শাসন। তার আদালতে বিচারপ্রার্থী হওয়া ছিল ঈমানের পরিপন্থী।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط (سورة النساء: الاية ٦٠)

- হে নবী (সঃ) তুমি কি দেখনি তাদেরকে যারা দাবী তো করে যে, তারা ঈমান এনেছে ঐ কিতাবের উপর যা তোমার উপর নাযিল করা হয়েছে এবং ঐসব কিতাবের উপরও যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে, অথচ তারা তাদের বিষয়াদির ফায়সালার জন্যে তাগুতের (আদালতে) শরণাপন্ন হয়, যদিও তাদেরকে (তাগুতকে) অস্বীকার করার আদেশ করা হয়েছে- (সূরা নিসাঃ ৬০)

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ س এভাবে তাদের অধীনে চাকুরী-বাকুরী করা

এর অন্তর্ভুক্ত- যা আল্লাহ সুস্পষ্টরূপে নিষেধ করেছেন। যারা ইংরেজের অধীনে কোন চাকুরী করে, তাদের আদালতে ওকালতী করে, তারা জামায়াতের প্রথম সারির কর্মী হতে পারে না কিছুতেই।

আশ্চর্যের বিষয়, এ ধরনের চিন্তা তৎকালীন অনেক বুযুর্গানে দ্বীনের মাথায়ও আসেনি। তাদের অনেকেই বড়ো বড়ো সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাওলানার এ চিন্তাধারা যে পরিপূর্ণ শরিয়ত ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন তা যাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন তাঁরা তাগুতী সরকারের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

শিক্ষিত যুবকদলের সরকারের অধীনে চাকুরী অথবা ওকালতি করে জীবিকা অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ ছিল। অপর দিকে ইসলামের সত্যিকার ধারণা তাদেরকে তাগুতের সাথে অসহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছিল। তাঁরা এ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও অগ্নিপরীক্ষায় ইসলামের সপক্ষেই অটল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করন। অনেকেই লোভনীয় সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করেন। ওকালতি পেশা পরিহার করে হাসিমুখে দারিদ্য বরণ করেন। অনেকে পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরাগভাজন হন, ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতির সম্মুখীন হন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করে দুনিয়ার কোন মানুষকে সন্তুষ্ট করার প্রবণতা পরিহার করেন।

মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ কাপুরথালার উদীয়মান আইন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং জামায়াতে প্রবেশ করার পূর্বে তাঁর টিপ্ টপ সাহেবী পোষাক ও জীবনযাপন

www.pathagar.org

প্রণালী দেখে মনে হতো তিনি দৈনিক প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। কিন্তু জামায়াতে প্রবেশ করার দুমাসের মধ্যে তিনি তাঁর মধ্যে এক বিপ্লবী পরিবর্তন এনেছিলেন। ওকালতী পরিত্যাগ করে কোন প্রকারে দুমুঠো আহার সংগ্রহ করতেন।

ঠিক তেমনি চৌধুরী আলী আহম্মদ খান একজন উচ্চশিক্ষিত জাঁদরেল পুলিশ অফিসার ছিলেন। মোটা আয়ের চাকুরী ছাড়ার পর জীবিকার জন্যে তিনি স্বয়ং একটি হোটেল করেন। নিজে রান্না করতেন, খদ্দেরদেরকে খানা পরিবেশন করতেন। এমনকি নিজ হাতে সব কিছু সাজিয়ে খদ্দেরদেরকে খেতে দিয়ে তাদের সাথে আন্তরিকতা সহকারে গল্পগুজবে লিপ্ত হতেন। ফাঁকে ফাঁকে তাদের সাথে ইসলামী দাওয়াত পেশ করতেন এবং সাহিত্যও পরিবেশন করতেন। আল্লাহর পথে এর চেয়ে বড়ো কুরবানী আর কি হতে পারে?

আওরংগযিব আলমগীর বাদশাহ গাজী বিরাট বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের একমাত্র অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর কোষাগারে কোটি কোটি টাকার সম্পদ থাকা সত্ত্বেও নিজহাতে কুরআন লিখে ও টুপি সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। রাজ কোষাগার থেকে একটি কপর্দকও গ্রহণ করতেন না। এইত ইসলামের শাশ্বত আদর্শ ও সোনালী চিত্র।

মাওলানা মওদূদীর ইসলামী আন্দোলন এ আদর্শের প্রতিটি মানুষকে আকৃষ্ট করেছে।

অন্যান্য মহলে জামায়াতের প্রভাব

পরম পরিতাপের বিষয় হলেও বলতে হয় যে আমাদের শ্রদ্ধেয় সুফীয়ানে কেরাম ও মাশায়েখে তরীকত নিজেদের পৃথক পৃথক হালকা বানিয়ে রেখেছেন। প্রত্যেক হালকা একটি অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ইউনিট হিসেবে বিদ্যমান। তাঁরা বহির্জগত থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও কাজকর্ম নিয়ে পড়ে রয়েছেন। এ জন্যে সাধারণত এ স্বনির্ভর অর্থনৈতিক ও রূহানী ইউনিটে বাইরের কেউ ভেতরে প্রবেশ করেনা এবং না সাধারণত ভেতর থেকে বাইরের সাথে কেউ সম্পর্ক রাখে। আবার এমন কিছু দলও আছে যাদের বাইরের সাথে কোন সম্পর্ক রাখা, অন্য কোন মাহফিলে যোগদান করা, নির্দিষ্ট নির্ধারিত পাঠ্য তালিকা ব্যতীত অন্য কোন সাহিত্য স্পর্শ করা, অন্য কারো পরামর্শে কান দেয়া একেবারে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ আছে। সত্য মিথ্যা যাঁচাই করার কোন স্বাধীনতাও তাদের নেই। এ সব স্থানে ইসলামী দাওয়াত পেশ করার সুযোগ অতি অল্পই পাওয়া যায়।

www.pathagar.org

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্য থেকে মুসলিম লীগ সবচেয়ে বেশী কর্মী জামায়াতে ইসলামীকে সরবরাহ করেছে। এ জন্যে যে তাদেরও লক্ষ্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, যার জন্যে পাকিস্তানের দাবী উঠেছিল। তাদের মধ্যে যাঁরা নিষ্ঠাবান ছিলেন তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে মুসলিম লীগের নিকটে এমন কোন পরিকল্পনা ছিলনা যার দ্বারা ইসলামী চরিত্র গঠন ও ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়। এ কারণেই তাঁরা ক্রমশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করা শুরু করেন। এ কথা সত্য যে প্রাথমিক যুগে যে সব রাজনৈতিক কর্মী জামায়াতে যোগদান করেন তাদের মধ্যে অনেকেই মুসলিম লীগে ছিলেন।

কংগ্রেসের সাথে যে সব নিষ্ঠাবান মুসলমান সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং দেশের স্বাধীনতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন এবং মনে করতেন যে স্বাধীনতার পর ইসলামী জীবন যাপনের পথ আপনা আপনি সুগম হয়ে যাবে, তাঁরা মাওলানার অকাট্য যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে উপলব্ধি করলেন যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার জন্যে কংগ্রেসের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা মায়া মরীচিকার অনুসরণ করা মাত্র। উপরন্তু তাঁরা কংগ্রেসের দূরভিসন্ধিও বুঝতে পেরেছিলেন যে তাদের স্বাধীনতার অর্থ সমগ্র ভারতবাসীর স্বাধীনতা নয় বরঞ্চ শুধুমাত্র হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাধীনতা অর্থাৎ রাম-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা। এ স্বাধীনতার দ্বারা শুধু প্রভুর পরিবর্তন মাত্র এবং ইংরেজের গোলামীর শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে হিন্দুর শৃঙ্খল পরিধান করা- তখন তারা কংগ্রেস পরিত্যাগ করে মুসলিম লীগ অথবা জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। খাকসার ও আহরার দলের কিছু লোকও তাদের দলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে জামায়াতে যোগদান করেন। কারণ, সেখানে তাঁরা তাঁদের মনের খোরাক পাচ্ছিলেন না।

জামায়াতে ইসলামী সর্বপ্রথম শিক্ষিত লোকদের মাধ্যমে সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। কারণ, একটি আদর্শিক দল হিসেবে তার প্রভাব বিস্তারের প্রধান মাধ্যমই ছিল তার সাহিত্য ভাণ্ডার। শিক্ষিত লোক শহরেই থাকুক অথবা গ্রামে জামায়াতের সাথে পরিচিত হন। আর শহরে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে জামায়াতের প্রভাব শহরেই বেশী পরিলক্ষিত হয়।

দেশের মধ্যে একে তো সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প প্রবল ছিল, তদুপরি মাওলানা মওদূদী কংগ্রেসের কঠোর সমালোচক হওয়ার কারণে অমুসলিম এবং বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে জামায়াতের প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের লিখিত মুসলমানদের ইতিহাসে সত্য ঘটনাকে বিকৃত করে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করা হয়েছে। হিন্দু জাতির প্রতি মুসলিম শাসকদের নির্যাতন-নিষ্পেষণের অলীক কল্পকাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। তার ফলে

www.pathagar.org

স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুজাতি মুসলমানদেরকে ভালো চোখে দেখতে পারেনি। তবে অতি অল্পসংখ্যক অমুসলিম জামায়াত কর্মীদের সামগ্রিক আচার-আচরণ, উন্নতমানের চরিত্র, তাদের অমায়িক ব্যবহার এবং মহান আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রবল ঝঞ্ঝা এ প্রভাবকে তৃণখণ্ডের ন্যায় উড়িয়ে নিয়ে যায়।

বিভিন্ন মহলে প্রভাব বিস্তারের পরিকল্পনা

জামায়াতে ইসলামী তার এলাহাবাদ সম্মেলনে সমাজের বিভিন্ন স্তরে অনুপ্রবেশ করে প্রভাব বিস্তারের ব্যাপক ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সমাজে যে ধরনের চিন্তাধারা, মন-মানসিকতা, রুচি-প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ করছিল তদনুযায়ী এবং সঠিক প্রকাশভংগি (Approach) সহ কিছু বিভাগ ও তার দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয় যাদের কাজ ছিল একদিকে এ সব চিন্তার ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ এবং তাদের জন্যে উপযোগী সাহিত্য রচনা করা।

আরবী ভাষায় তরজমা ও সাহিত্য রচনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় মাওলানা মাসউদ আলম নদভীর উপর, যাঁর প্রধান কার্যালয় ছিল জলন্ধরে। কুরআনের বক্তব্য দাওয়াতের উপযোগী করে সাহিত্য রচনার দায়িত্ব দেয়া হয় মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসানকে। তিনি সে সময়ে মালির কোটতলায় একটি দ্বীনী মাদ্রাসার প্রধান পরিচালক ছিলেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াতের অন্যতম মুখপাত্র ছিলেন। সাহিত্যের অঙ্গনে অশালীন ও জাহেলী চিন্তাধারা খণ্ডন করে ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন জনাব আব্দুস সালাম নঈম সিদ্দীকী। তিনি একাধারে প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সমালোচক ও কবি ছিলেন। জনসাধারণের জন্যে সহজ সরল ভাষায় সাহিত্য তৈরীর ভার অর্পিত হয় মাওলানা নাযীরুল হক মিরাঠীর উপর। তাঁর সাহিত্য হবে সমাজ সংস্কারমূলক। তিনি একজন খ্যাতনামা আলেমে দ্বীন, খতীব এবং গণমানুষের মনস্তত্ত্ববিদ ছিলেন। সাংবাদিকতার অঙ্গনে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় অর্ধ সাপ্তাহিক কাওসার পত্রিকার সম্পাদক মালিক নসরুল্লাহ খান আযীযের উপর। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গবেষণার দায়িত্ব অর্পিত হয় জনাব আব্দুল বশীর আযরীর উপর। তিনি অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। ইতিহাস বিভাগে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন ও চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারের জন্যে খাযা মুহাম্মদ সিদ্দীককে নিযুক্ত করা হয়। তিনি এ্যাংলো-এরাবিক কলেজ দিল্লী-এর ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। দর্শন শাস্ত্রে জনাব মুমতাজ হুসেনকে নিয়োগ করা হয়। আইন শাস্ত্রকে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপনের জন্যে জনাব আব্দুল আযীয খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি টুং-এ জজের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংরেজী সাহিত্য রচনার ভার দেয়া হয় অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াকুবকে। তিনি একটি কলেজে ইংরেজীতে অধ্যাপনা করতেন এবং

www.pathagar.org

ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর দক্ষতা ছিল। জনাব এ আর সুফী ইংরেজীর তরজমার কাজ করতেন এবং তিনি থাকতেন শিমলায়। এভাবে হিন্দী, সিন্ধী, গুজরাটী, বাংলা, মালায়ালাম, তামিল, পশতু, ফার্সী প্রভৃতি ভাষায় তরজমার দায়িত্ব যথাক্রমে- হাফেয মুহাম্মদ ইমামুদ্দীন রামনগরী, মাওলানা হাফেয আব্দুর রাযযাক, জনাব ইসমাঈল উসমান এখলাস, সাইয়েদ মুহাম্মদ হুসাইন জামেয়ী, হাজী মুহাম্মদ আলী, মৌলভী শফী আব্দুল্লাহ, গাযী আব্দুর রাযযাক, জনাব মুহাম্মদ ফারুকী প্রমুখের উপর অর্পিত হয়।

জামায়াতে ইসলামী এ কাজগুলোকে সংস্কারমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্চমানের করার অভিলাষ পোষণ করছিল যাতে করে ভবিষ্যত বংশধরদের নৈতিক সংরক্ষণ ও ইসলামী শিক্ষাদীক্ষায় সঠিক প্রতিনিধিত্বের জন্যে স্কুল পর্যায়ে পাঠ্যসূচী তৈরী করা যায়। এ পাঠ্যসূচী সরকার পরিচালিত স্কুলগুলোতে যদি নাও চলে, অন্ততপক্ষে যেন প্রাইভেট স্কুলগুলোতে পাঠ্যসূচী করার চেষ্টা করা হয়। অথবা যে সব স্কুল জামায়াতের তত্ত্বাবধানে কায়েম হবে এ পাঠ্যসূচী থেকে যেন সেখানে এর সুফল লাভ করা যায়।

এ সম্মেলনে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, শিশুদের জন্যে সহজ সাহিত্য তৈরী করা হবে যা হবে তাদের রুচিসম্মত। তার মধ্যে চরিত্রগঠনমূলক গল্প-কাহিনী থাকবে। এ সবের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ ও গুণাবলী সৃষ্টি করা হবে। এ কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয় জনাব মুহাম্মদ শফী গাজিয়াবাদীর উপর। ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধের জন্যে রসাত্মক সাহিত্য রচনা করার দায়িত্ব জনাব মুমতাজ হুসেনকে দেয়া হয়, যাঁকে দর্শন শাস্ত্রের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয়। কবিগণকে সংগঠিত করার দায়িত্ব জনাব নঈম সিদ্দীকীকে দেয়া হয়। ব্যবসায়ী ও মিল মালিকদের মধ্যে দাওয়াত ছড়াবার দায়িত্ব দেয়া হয় জনাব সুলতান আহমদ লাখনোভীকে। উপরন্তু তবলীগী প্রতিনিধি তৈরী করে জামায়াতের পরিচিতির জন্যে বিভিন্ন লোক নিয়োগ করা হয়। জামায়াতের প্রত্যেক রুকন ও কর্মী-শুভাকাঙ্ক্ষী সপ্তাহে একদিন দ্বীনের দাওয়াতের জন্য ওয়াক্‌ফ করবেন একথাও গুরুত্বসহকারে বলে দেয়া হয়। জামায়াতের বিরুদ্ধে ভুল ধারণা দূর করা, শিক্ষিত মহলকে অবহিত করা প্রভৃতি কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজে জামায়াতের প্রভাব বিস্তারের ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

মহিলাদের মধ্যে কাজ

পুরুষদের মধ্যে জামায়াতের দাওয়াতের সাথে সাথে মহিলাদের মধ্যে কাজের তাকীদ দেয়া হয়। যে সব পুরুষ জামায়াতে যোগদান করেছেন, তাঁরা তাঁদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যেই দাওয়াতী কাজ করবেন বিশেষ করে মহিলাদেরকেও এ কাজে উদ্বুদ্ধ

www.pathagar.org

করতে হবে। নতুবা ভবিষ্যত বংশধরদেরকে ইসলামের পথে নিয়ে আসা সম্ভব হবে না এবং পরিবারের মধ্যেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা হতে পারে।

জামায়াতে ইসলামী হামেশা এ ব্যবস্থাই করেছে যে, যখন কোথাও কোন পুরুষের সম্মেলন হয়েছে সেখানে মহিলাদের জন্যে পর্দার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে তারা সম্মেলনের আলোচনার দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এর সুফল এই হয়েছে যে জামায়াতের দাওয়াত তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাঁদের অনেকে রুকন হয়ে মহিলাদের মধ্যে কাজের সূচনা করেছেন।

শুরু থেকেই আমীরে জামায়াত যেখানেই সফরে গিয়েছেন, সেখানেই মহিলাদেরকে সম্বোধন করেও কথা বলেছেন। মহিলাদের জন্যে সাহিত্যও তৈরী করা হয়েছে যে, মহিলাদের নিকটে ইসলামের দাবী কি। দাবীসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেও মহিলাদের মধ্যে কাজের ধারাপদ্ধতি নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে।

হামীদা বেগম নাম্নী জনৈকা মহিলা অত্যন্ত নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সাথে এ কাজে অগ্রসর হন এবং মহিলাদের মধ্যে সংগঠিতভাবে কাজের সূচনা করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্রতিবেশীর মধ্যে সেবামূলক কাজ করতে থাকেন। অভাবগ্রস্ত মহিলাদের সাহায্য দান, বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার ব্যবস্থা ও প্রবন্ধাদির মাধ্যমে মহিলাদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর কাজের অগ্রগতি সাধন করেন। চিঠিপত্রের দ্বারাও মহিলাদের মধ্যে কাজ করেন। শিশুদের মধ্যে শীতের সুয়েটার বিতরণ এবং প্রতিবেশী মহিলাদের জামা-কাপড় সেলাই করে দিয়ে তাঁর মহান চরিত্রের প্রভাব বিস্তার করেন। স্কুলে স্কুলে গিয়ে শিক্ষয়িত্রীদের কাছে জামায়াতের দাওয়াত পেশ করেন। সরকারী অফিসারগণের বেগমদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের কাছে জামায়াতের পরিচিতি তুলে ধরেন। আপন পরিবারের মধ্যেও দ্বীনের মর্ম-কথা ও তার দাবী সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত ও সজাগ করেন। তাঁর এ অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মহিলাদের মধ্যে কাজ বিস্তার লাভ করে এবং তাদের এক একটি করে ইউনিটও গঠিত হতে থাকে। ছেচল্লিশ সাল পর্যন্ত মহিলাদের মধ্যে কাজ সন্তোষজকভাবে বেড়ে যায়। অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করেও বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা এ পথে তাঁদের দৃঢ়তা ও অবিচলতার প্রমাণ দেন। তাদের দ্বারা ঘরে ঘরে সাহিত্য পরিবেশন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়।

এমনিভাবে ছাত্রদের মধ্যেও দাওয়াতী কাজ চলতে থাকে। ফলে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সংগঠন কায়েম হয়। লাহোর ইসলামিয়া কলেজ এবং অন্যান্য কলেজগুলোতে কাজ ছড়িয়ে পড়ে। মাওলানা মওদূদী জামায়াত গঠিত হওয়ার পূর্বে ইসলামিয়া কলেজ লাহোরে ঊনচল্লিশের আগস্ট থেকে চল্লিশের

www.pathagar.org

অক্টোবর পর্যন্ত অবৈতনিক অধ্যাপনার কাজ করেন এবং শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে দ্বীনের তবলীগের কাজ করেন। দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য-লক্ষ্যও শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে তুলে ধরেন। ফলে অনেকেই তাঁর চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হন।

একথা সত্য যে, জামায়াতে ইসলামী গঠিত হওয়ার পর অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার ভেতর এবং বিভিন্ন প্রকারের আলোড়ন সৃষ্টিকারী আন্দোলনের মধ্যে গোটা সমাজের দৃষ্টি নৈতিকতা ও দ্বীন ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আকৃষ্ট করা কোন সহজ কাজ ছিল না। তথাপি তার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সকল মহলে অনুপ্রবেশের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। যদিও দেশের অধিক সংখ্যক লোককে জামায়াতের দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু একদিকে সমাজের সত্যনিষ্ঠ মহলের একটা অংশকে অবশ্যই আকৃষ্ট করেছিল এবং অপরদিকে সমাজের একটা বৃহত্তর অংশকে জামায়াতের সাথে পরিচিত করতে পেরেছিল, এ কাজকে একেবারে তুচ্ছ ও নগণ্য বলা যায় না- যা মাত্র কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল। ভারত বিভাগের পূর্বে প্রায় প্রতিটি জেলায় ও শহরে জামায়াতের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.org

বহির্বিশ্বে জামায়াতের প্রভাব

জামায়াতে ইসলামী তার সূচনা থেকেই সাংগঠনিক দিক দিয়ে একটি স্থানীয় ও আঞ্চলিক জামায়াত। কিন্তু বিশ্বজনীন দাওয়াতের দিক দিয়ে একটি আন্তর্জাতিক আন্দোলন। তার দাওয়াত বিশেষভাবে সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের কাছে এবং সাধারণভাবে বিশ্বমানবতার কাছে। প্রথম থেকেই তার দাওয়াত এই রয়েছে- মুসলমান আল্লাহর দ্বীনের পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে যাও- সর্বপ্রথম নিজ নিজ সমাজকে ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর। তারপর কাজ ও কথার দ্বারা দুনিয়াকে এ মূলনীতির সাথে পরিচিত কর। দুনিয়ার অমুসলিমদের কাছে জামায়াতের দাওয়াত এই যে- তোমরা খোদার বন্দেগীর পথ অবলম্বন কর। এ জন্যে যে খোদার নাফরমানীর অপর নামই হচ্ছে "ফাসাদ ফিল্ আরদ্" দুনিয়ার অনাচার যা দুনিয়ার ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে।

দাওয়াতী সাহিত্য প্রণয়ন

জামায়াতের বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার তৈরী হয়েছে এ মূলনীতির ভিত্তিতেই। সমস্ত মানব জাতিকে সংস্কার-সংশোধনের আহ্বান জানানো হয়েছে। এ ধরনের আহ্বান যে দল দিতে চায় তার জন্যে অপরিহার্য এই যে তা একদিকে ভাষা, বংশ, বর্ণ, অঞ্চল ও শ্রেণীভিত্তিক গোঁড়ামি ও বিদ্বেষের বহু উর্ধে থাকবে। অপরদিকে তার দাওয়াত অপরের কাছে পৌঁছাবার জন্যে বিভিন্ন ভাষাকে প্রচারের মাধ্যম বানাবে। এ ভাবেই সে তার দাওয়াত বিভিন্ন মানবসমাজে পৌঁছাতে পারে। জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা তাঁর প্রাথমিক দাওয়াত উর্দু ভাষায় পেশ করেন। তারপর সে দাওয়াতী সাহিত্য থেকেই বিশ্বজনীন দাওয়াতী সাহিত্য দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় তৈরী করার কথা।

এ প্রয়োজন প্রথম দিন থেকেই অনুভব করা হয়। ইসলামী দুনিয়াকে এ দাওয়াত সম্পর্কে অবহিত করার জন্যে একমাত্র আরবী ভাষাই উপযোগী এবং পাশ্চাত্য জগৎ ও আধুনিক শিক্ষিত লোকের জন্যে উপযোগী ইংরেজী ভাষা। স্বয়ং ভারতও বিভিন্ন ভাষাভাষীর দেশ বলে এখানেও প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় সাহিত্য রচনা করা।

www.pathagar.org

তরজমার ব্যবস্থাপনা

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাষায় জামায়াতের সাহিত্য তরজমা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ কাজ ১৯৪৫ সালে শুরু করা হয় এবং এক বছরে তার যথেষ্ট অগ্রগতি হয়। ইতিমধ্যে কয়েকটি মূল গ্রন্থের আরবী ও ইংরেজী তরজমা হয়। এভাবে দাওয়াত ভারত অতিক্রম করে আরব দেশসমূহ, আমেরিকা, আফ্রিকা, ইরান ও ইংল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করে লন্ডন ও মানচেস্টারে জামায়াতের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। লন্ডনে এবং মদীনায় কিছু লোক দাওয়াতী কাজ শুরু করে দেন। মদীনায় জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি জামায়াতের দাওয়াতে এতোখানি প্রভাবিত হন যে, তিনি এলাহাবাদ সম্মেলনে যোগদান করেন। তিনি আরবী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে তা পরিবেশনের বিরাট আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ইতিমধ্যে বাহরাইনেও জামায়াতের দাওয়াত পৌঁছে যায়। আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে, রোডেশিয়া, কেনিয়া প্রভৃতি স্থান থেকে সাহিত্য প্রেরণের দাবী উঠতে থাকে। ইন্দোনেশিয়াতেও দাওয়াতের কাজ শুরু হয়।

জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত যেহেতু আম্বিয়ায়ে কেরামেরই দাওয়াত ছিল, তাই এ বিশ্বজনীন আবেদন রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আধুনিক বিশ্বে ইসলামের মুখপাত্র ও ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

এ যাবৎ আরবী ভাষায় যে সব গ্রন্থ অনূদিত হয় তা নিম্নরূপ ঃ

- ❖ তাজদীদ ও এহইয়ায়ে দ্বীন- (ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন)
- ❖ ইসলাম ও জাহেলিয়াত
- ❖ সিয়াসী কাশমকাশের আলোচ্য সূচীপত্র
- ❖ আধুনিক আরবী পরিভাষায় জামায়াতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- ❖ দ্বীনে হক (একমাত্র ধর্ম)
- ❖ ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে কায়েম হয়
- ❖ ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ
- ❖ কুরআনের চার মৌলিক পরিভাষা

ইংরেজী ভাষায় রচিত বইগুলো-

What is Islam? After Communism What?
Life after death Significance of Jehad

এ ছাড়া আরও কয়েকখানা গ্রন্থ ইংরেজীতে অনূদিত ও প্রণীত হয়।

www.pathagar.org

দশম অধ্যায়

চারটি ঐতিহাসিক সম্মেলন

এলাহাবাদ সম্মেলনের পর সাতচল্লিশের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত হয় যে, পাটনায় নিখিল ভারত বার্ষিক সম্মেলন হবে এবং তার জন্যে ৪, ৫ ও ৬ এপ্রিল তারিখও নির্বাচিত করে দেয়া হয়। কিন্তু এ বছরটি সারা ভারতে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড ও হানাহানির বছরে পরিণত হয়। একদিকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে পাকিস্তান আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে, অপরদিকে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় ভারতকে অখণ্ড রাখার জন্যে মুসলিম নিধনকার্যে আত্মনিয়োগ করে। ভারতীয় হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে তার সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হুঙ্কার দিয়ে বলতে থাকেন, 'মুসলমানরা বহিরাগত-এদেশে বসবাসের অধিকার তাদের নেই। হিন্দুজাতির সাথে মিলে একজাতি হয়ে থাকতে চাও থাক, নতুবা যেখান থেকে এসেছ সেখানে চলে যাও।' এভাবে অন্যান্য হিন্দু নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকেও অনুরূপ উস্কানিমূলক বক্তৃতা-বিবৃতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইন্ধন জোগাতে থাকে। সারা ভারতের মুসলমানদের জানমাল ইজ্জত-আবরু চরম হুমকির সম্মুখীন হয় এবং যেখানে-সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বলতে থাকে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের কোথাও জমায়েত হওয়া, একস্থান থেকে অন্যত্র যাতায়াত করা খুবই বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। এ জন্যে দেশব্যাপী কোন সম্মেলন করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

আমীরে জামায়াত কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন এমন সব শূরা সদস্যকে নিয়ে পরামর্শ করে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সারা ভারতের কর্মীগণকে কোন একস্থানে সমবেত করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। অতএব নিখিল ভারত সম্মেলনের পরিবর্তে চারটি বিভাগীয় সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। টুং, পাটনা, মাদ্রাজ এবং দারুল ইসলাম পাঠানকোট এ চার স্থানে আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত হয়।

টুং সম্মেলন (১৭ ও ১৮ই এপ্রিল- ১৯৪৭)

এ সম্মেলনে রাজপুতানা, সি পি, বেরার, বোম্বে এবং মধ্য ভারতের কর্মীগণ যোগদান করেন।

www.pathagar.org

এ সম্মেলনগুলোর গুরুত্ব এতো বেশী এ জন্যে ছিল যে, অখণ্ড ভারতে এগুলো ছিল শেষ সম্মেলন এবং সেজন্যে ভবিষ্যতের অবস্থার আলোকে কর্মসূচী নির্ধারণের প্রয়োজন ছিল।

বিভাগের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় দেড় শ' রুকন, কর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষী টুংং সম্মেলনে যোগদান করেন। কেন্দ্র থেকে আমীরে জামায়াত ও মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ সাহেব যোগদান করেন।

সতেরোই এপ্রিল প্রথম অধিবেশন বেলা আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত, দ্বিতীয় অধিবেশন-যোহরের পর থেকে আসর পর্যন্ত এবং তৃতীয় অধিবেশন-আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত চলে। এগুলো ছিল শুধু রুকনদের বৈঠক। এতে পরিচিতি, রিপোর্ট গ্রহণ, তার পর্যালোচনা ইত্যাদি চলে। সমগ্র বিভাগকে কতকগুলো ছোট অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রত্যেকটির দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হয় এবং দু'তিনজনের একটি করে টীম তৈরী করে দাওয়াতী কাজ বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়।

আমীরে জামায়াত তাঁর হেদায়াত দান প্রসঙ্গে বলেন, আর্থিক অসুবিধা আমাদের কর্মীদের কাজে প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নয়। তাঁদের মধ্যে এ অনুভূতি সদা জাগ্রত থাকা উচিত যে, তাঁরা মুসলমান এবং তাঁদের প্রত্যেককে তাঁদের আমলের জবাবদিহি খোদার কাছে করতে হবে।

দ্বিতীয় দিন (১৮ই এপ্রিল) জুমার দিন-সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত অধিবেশন চলে। এতে প্রায় তিনশ' লোক অংশগ্রহণ করেন। আমীরে জামায়াত তাঁর ভাষণে বলেন, অন্যান্য স্থানের লোকের কাছে আমাদের দাওয়াত পেশ করার জন্যে হয়তো দীর্ঘ বক্তৃতার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু টুংং অধিবাসীদের কাছে এতোটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, আমাদের লক্ষ্য তাই যার জন্যে সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রঃ) দাঁড়িয়েছিলেন।

মাওলানার বক্তৃতার পর মিয়া সাহেব বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। জুমার নামায বাদ বেলা তিনটায় রুকনদের বৈঠক হয়। এখানে কিছু ভুল বুঝাবুঝির অবসান করা হয়, প্রশ্নোত্তর হয় এবং কিছু প্রস্তাব-পরামর্শ গৃহীত হয়। রাতে জনসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে মাওলানা জনগণের সামনে জামায়াতের দাওয়াত পেশ করেন।

অতঃপর মহিলাদের সম্মেলন হয় এবং তাদের কাজের পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি বলে দেয়া হয়।

টুংং-এ একদিন অবস্থানের পর ২১শে এপ্রিল ট্রেনযোগে মাওলানা ও মিয়া সাহেব মাদ্রাজ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

www.pathagar.org

মাদ্রাজ সম্মেলন (২৫শে ও ২৬শে এপ্রিল)

এ সম্মেলনের প্রধান অতিথি আমীরে জামায়াত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী এবং বিশেষ অতিথি জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ। মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ এবং মহিশূর থেকে প্রায় আড়াইশ' রুকন ও কর্মী সম্মেলনে যোগদান করেন। ভারত বিভাগের পূর্বে আমীরে জামায়াতের দক্ষিণ ভারতে এই ছিল সর্বশেষ সম্মেলন- সেজন্যে এর গুরুত্ব ছিল অত্যধিক বেশী।

পঁচিশে এপ্রিল জুমার দিন ঠিক বেলা দুটায় সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। আমীরে জামায়াত তাঁর সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণে নিখিল সম্মেলন মুলতবীকরণ এবং তদস্থলে বিভাগীয় সম্মেলন করার কারণ বর্ণনা করেন। দেশের চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির আলোকে এ সম্মেলনগুলোর গুরুত্বের প্রতি শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং নিবিষ্ট মনে আলোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আগামী দিনের কর্মসূচী সম্পর্কে সজাগ হতে অনুরোধ জানান। এরপর কাইয়েমে জামায়াত বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। তারপর মাদ্রাজ প্রদেশের কাইয়েম মাওলানা সাইয়েদ সিবগাতুল্লাহ বখতিয়ার প্রাদেশিক রিপোর্ট পেশ করেন। এসব রিপোর্টে যে সকল বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয় তাহলো, দেশে ও বিদেশে জামায়াতের সাহিত্য পরিবেশন, উর্দু ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় দাওয়াতী সাহিত্য রচনা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও জামায়াতের সহনশীল ও মানবতাসুলভ ভূমিকা, মজলিসে শূরার নির্বাচন, বর্তমান পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামীর কয়েকটি অসুবিধা প্রভৃতি।

দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বাদ মাগরেব। এতে ছ'সাতশ' শ্রোতা যোগদান করেন। মাওলানা অসুস্থতার দরুন আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল।

এ বৈঠকে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত ইংরেজী ভাষায় পেশ করেন জনাব মায-হারুদ্দীন সিদ্দীকী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, মুসলমান তাকে বলে, যে

- এ যমীনের উপরে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি অথবা সত্তার কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে না।
- মুসলমান এমন কোন নেতার নেতৃত্ব, পথপ্রদর্শন ও আনুগত্য মেনে নিতে পারে না, যে খোদা ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর কোন পরোয়া করে না।
- মুসলমান এমন কোন আইনকে বৈধ আইন এবং এমন কোন সংবিধানকে বৈধ সংবিধান বলে মেনে নিতে পারে না, যা খোদার নাযিলকৃত আইনবিধানকে সকল আইন ও সংবিধানের উৎস বলে স্বীকার করে না।

www.pathagar.org

উল্লেখ্য যে, তৎকালীন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ হিন্দু কংগ্রেসেরই একটি তল্পীবাহক সংস্থা ছিল, যারা ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের চরম বিরোধী। জামায়াতের এ সম্মেলনকে মুসলিম লীগ কর্মীগণ জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সম্মেলন মনে করে একদল দুষ্কৃতকারীর সাহায্যে সম্মেলনের উপর হঠাৎ হামলা চালায়, মঞ্চও দখল করে নেয়। রান্না করা সমুদয় খানা নষ্ট করে ফেলে। এমনকি তাঁদের নেতৃবৃন্দের নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা এ দুষ্কৃতি থেকে বিরত থাকে না। অবশ্য পরে স্থানীয় মুসলিম লীগের দায়িত্বশীলগণ এর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চান। প্রকাশ থাকে যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এ ধরনের চরিত্রই তৈরী করে।

মুসলিম লীগ এক মহান ও পবিত্র উদ্দেশ্য হাসিলের নাম করে পাকিস্তান আন্দোলন করছিল এবং দশ কোটি মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ কর্মীদের ইসলামী চরিত্র গঠনের কোন কর্মসূচী হাতে নেয়নি এবং এর কোন চিন্তাও তাদের মস্তিষ্কে ছিল না। কারণ বহু নাস্তিক, কমিউনিস্ট এবং খোদাবিমুখ লোক ইসলামের তসবীহমালা হাতে নিয়ে মুসলিম লীগে বিভিন্ন নেতৃত্বের আসন দখল করে নিয়েছিল।

যা হোক, হামলাকারীদের সম্বোধন করে মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ বলেন, আপনাদের ধৈর্য ও সহনশীলতার আচরণ করা উচিত। নিজেদের অভিলাষ ও ভাবাবেগ দমন করার শক্তি অর্জন করা দরকার। যে আচরণ আপনারা করলেন, তা মানবতা, ভদ্রতা, নৈতিকতা কোন দিক দিয়েই কি সঠিক হয়েছে? আপনারা মুসলমান। ভদ্রতার সাথে নিজেদের কথা বলার এবং অপরের কথা শুনার অভ্যাস করুন। আমাদের দাওয়াতের ভিত্তি কিতাব ও সুন্নাত। তা খণ্ডন করতে হলে কিতাব ও সুন্নাতের দলীল দিয়েই করতে হবে। দলীলসহ আমরা আমাদের ত্রুটি সংশোধন করতে পারি কিন্তু কোন ভীতি প্রদর্শন ও হুমকির পরোয়া আমরা মোটেই করি না। আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকলে জনসভায় তার জবাব দেয়া হবে। তারপর এগারোটায় বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এসব ঘটনা শুনবার পর আমীরে জামায়াত জনসভা বন্ধ করে দেন। তিনি বলেন, আমরা জবরদস্তি কারো উপরে আমাদের কথা চাপিয়ে দিতে চাই না। মাদ্রাজবাসী যদি আমাদের কথা শুনতে না চায়, তো আমরাও বলতে চাই না।

পরদিন ২৬শে এপ্রিল সব কাজ জনাব নাযীর হোসেন কাসুরীর বাসগৃহে হয়। মাওলানা মওদূদী কাসুরী সাহেবেরই মেহমান হয়েছিলেন। আলোচনা চলাকালে আবদুল হাফিয নামে জনৈক স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা মাওলানার সাথে দেখা করে গতকালের ঘটনার জন্যে খুবই দুঃখ প্রকাশ করে বার বার ক্ষমা চাইছিলেন।

www.pathagar.org

তিনি বলেন, কতিপয় দুষ্ট লোকের নৈতিকতাবিরোধী আচরণের কারণে জনসভা বন্ধ করবেন না। তিনি নিশ্চয়তা দেন যে, এমন আচরণ আর কখনো হবে না।

একদিকে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইছিলেন, অপরদিকে তাঁদের দুষ্টপ্রকৃতির কর্মীবাহিনী সভামঞ্চ দখল করে হৈহল্লা করছিল।

আমীরে জামায়াত বলেন, প্রথমে আপনারা আপনাদের কর্মীদেরকে নিয়ন্ত্রিত করুন, তার পর কোন কথা হতে পারে।

পুলিশ দুষ্কৃতকারীদেরকে ছত্রভঙ্গ করে জনসভার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে চাইলো। তার জবাবে মাওলানা বলেন, এ আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমরা নিজেরাই এর মীমাংসা করে ফেলবো। আপনাদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে না। আপনাদের শুকরিয়া।

পরিতাপের বিষয়, পরদিন মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তাদের কর্মীদের গুণ্ডামির সমর্থনে বিবৃতি দিয়ে তাদের সত্যিকার চরিত্রের পরিচয় দিলেন। একটি আদর্শবাদী দল ও একটি চরিত্রহীন কর্মী বাহিনীর নেতৃত্ব দানকারী জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে পার্থক্য যে আসমান ও যমীনের, তা কারো বুঝতে বাকী থাকার কথা নয়।

কাসুরী সাহেবের গৃহে সকাল ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বৈঠক চলে। এ বৈঠকে বহু সাংগঠনিক আলোচনার পর আমীরে জামায়াত অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ পেশ করেন।

ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যত কর্মসূচী

এ সম্মেলন ভারতের সর্বশেষ কর্মীসম্মেলন মনে করে মাওলানা মওদূদী প্রয়োজন বোধ করেন যে, যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ভারতীয় মুসলমানদের সামনে তা চিহ্নিত করে তদনুযায়ী তাদের ভবিষ্যত কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হবে। তিনি সুস্পষ্ট করে বলেন, অতি সত্বর ভারত বিভক্ত হয়ে যাবে এবং হিন্দুগণ তাদের এলাকায় এবং মুসলমানগণ তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় আপন আপন মর্জি মুতাবেক নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। যার ফলে কাজের বর্তমান পদ্ধতি একেবারেই বদলে যাবে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে হিন্দুদের যে জাতীয় রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে তাতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতি তাদের তিনটি দাবী করা হবে-

- তোমরা তোমাদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার দাবী এবং তার ভিত্তিতে স্থায়ী অধিকার আদায়ের দাবী প্রত্যাহার করে একজাতীয়তার মধ্যে একাকার হয়ে যাও।

www.pathagar.org

❖ অথবা এর জন্যে তৈরী না হলে সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে শূদ্র-অচ্ছুতের ন্যায় জীবন যাপন করতে তৈরী হও।

❖ অথবা এতেও রাজী না হলে তোমাদেরকে এমনভাবে নির্মূল করার ক্রিয়া শুরু করা হবে যে, জাতীয় রাষ্ট্রের সীমার ভেতরে তোমাদের কোন নাম-নিশানা থাকবে না।

তারপর মাওলানা বলেন, এ তিনটি দাবীর জবাবে মুসলমানদেরকে তিনটি পথের যে কোন একটি অবলম্বন করতে হবে। নইলে-

❖ জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের পলিসি মেনে নিয়ে হিন্দু জাতীয়তার মধ্যে মিশে একাকার হওয়ার জন্যে তৈরী হতে হবে।

❖ দ্বিতীয়ত, মুসলিম জাতীয়তাবাদের বর্তমান রীতিনীতির উপর চলতে চলতে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

❖ তৃতীয়ত, জাতীয়তাবাদ তার রীতি-পদ্ধতি, দাবী-দাওয়া প্রভৃতি থেকে তওবা করে ইসলামী পথনির্দেশ গ্রহণ করবে, যার দাবী এই যে, মুসলমান তার জাতীয় স্বার্থের জন্যে সংগ্রাম করার পরিবর্তে তাদের সকল চেষ্টা-চরিত্র ইসলামের সংস্কারমূলক দাওয়াতে নিয়োজিত করবে।

সর্বশেষে তিনি জামায়াত কর্মীদের সম্বোধন করে বলেন যে, ভারতে ইসলামী বিপ্লবের পথ সুগম করার জন্যে তাদের কি করা দরকার। তিনি বলেন-

১। সবচেয়ে প্রথম কাজ এই যে, আজ পর্যন্ত মুসলমানের মধ্যে যে জাতীয় সংঘাত-সংঘর্ষ চলে আসছে তা বন্ধ করতে হবে।

মুসলমান ইসলামের জন্যে কাজ করার পরিবর্তে আপন জাতীয় স্বার্থ ও দাবী আদায়ের জন্যে সংগ্রাম করবে এটা আমার নিকটে ছিল অত্যন্ত ভুল কাজ। এখন এ সংগ্রাম অব্যাহত রাখা শুধু ভুল নয় বরঞ্চ আত্মঘাতী।

২। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই যে, মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলামী জ্ঞান ছড়াতে হবে। তাদের মধ্যে ইসলামী দাওয়াত ও তবলীগের প্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে। তাদের নৈতিকতা, তামাদ্দুনিক ও সামাজিক জীবন এমন পরিশুদ্ধ করতে হবে যে, প্রতিবেশী অমুসলমানগণ তাদের সমাজের তুলনায় মুসলিম সমাজকে সুস্পষ্টরূপে অধিকতর ভালো মনে করতে থাকে।

৩। তৃতীয় প্রয়োজনীয় কাজ এই যে, এ দেশের মানসিক শক্তির যতো বেশী অংশ সম্ভব আমাদের এ দাওয়াতের কাজে লাগাতে হবে। ইসলামী দাওয়াতকে একটি গণ আন্দোলনের রূপ দিতে হলে যাঁরা ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার জন্যে সর্বপ্রকার যোগ্যতা রাখেন তাঁদেরকে দায়িত্ব দিতে হবে।

www.pathagar.org

৪। যাঁরা আমাদের কর্মী এবং ভবিষ্যতে যাঁরা হবেন তাঁদের সকলকেই ভারতের স্থানীয় ভাষাগুলো ভালো করে শিখতে হবে। সে ভাষায় লেখা ও বক্তৃতার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সে সব ভাষায় ভবিষ্যতে সাহিত্য রচনা করতে হবে। যত শিগগির সম্ভব ঐ সব ভাষায় প্রয়োজনীয় সাহিত্য তৈরী করতে হবে।

মাওলানা আরও বলেন যে, বিগত দশ বছর যাবৎ যে তুফানের আমি ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছি তা একেবারে আসন্ন। এখন যদি আপনারা সজাগ-সচেতন না হন, তাহলে এ ত্রুটি সব মুসলমানসহ আপনাদেরকেও ডুবিয়ে দেবে। আর যদি আপনারা আল্লাহর উপরে ভরসা করে কাজের সূচনা করেন, তাহলে আশা করি আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে এমন উপায়ে সাহায্য করবেন যার চিন্তাও আপনারা করতে পারেন না।

এ ছিল মাওলানার অতি মূল্যবান হেদায়েত ঐ সব মুসলমানদের জন্যে, যাদেরকে ভারত বিভক্তির পরেও ভারতেই বসবাস করতে হবে। এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে, পরবর্তীকালের অবস্থা এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, ভারতের জামায়াতে ইসলামী এক সুস্পষ্ট কর্মসূচী নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টাচরিত্র করতে থাকে যার ফলে এ মুসলমানদের জন্যে একটি প্রভাবশীল সামগ্রিক সহায় শক্তি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সূক্ষ্মদর্শী ও দূরদর্শী মাওলানা ভারতে অবস্থানকারী জামায়াত কর্মীদের জন্যে যে ভবিষ্যত কর্মসূচী নির্ধারিত করে দেন, তা যে কতখানি ফলপ্রসূ হয়েছে তার সাক্ষ্য দেন বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশের আমীর মাওলানা আবদুল আযীয। তিনি ১৯৭৯ সালে মাওলানা মওদূদীর জানাযায় শরীক হওয়ার পর করাচীতে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন ঃ

ভারত বিভাগের পূর্বে মাওলানা মরহুম মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তাঁর সর্বশেষ ভাষণে এ কথার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন যে, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগণ যেন এখানকার আঞ্চলিক ভাষাগুলো ভালো করে শিক্ষা করেন-যা এখনকার জন্যে হবে অত্যন্ত সিদ্ধান্তকর।

জামায়াতে ইসলামী হিন্দ যদিও এ বিষয়ে কিছুটা ধীর গতিতে অগ্রসর হয়েছে, তথাপি আল্লাহ তায়ালার শোকর যে, ভারতের চৌদ্দটি ভাষায় বিশ-বাইশটি দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা জামায়াতের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। অন্ধ্র প্রদেশের সাড়ে চার কোটি অধিবাসীর তেলেঘু ভাষায় ন' মাস পূর্বে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছে। শুনে খুশী হবেন যে, তার শতকরা চল্লিশজন গ্রাহক অমুসলিম। তার সার্কুলেশন প্রায় চার হাজার। একটি সংখ্যায় কোন না কোন অমুসলিমের পত্র প্রকাশিত হয় এবং তাতে বলা হয় যে, এ পত্রিকাটির মাধ্যমে তিনি ইসলাম সম্পর্কে এ সর্ব প্রথম জ্ঞান লাভ করেন।

www.pathagar.org

ইসলাম প্রচারের এ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ মাওলানা মরহুমের মাদ্রাজে প্রদত্ত হেদায়েত অনুযায়ীই গ্রহণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধিবেশন আসর থেকে মাগরে পর্যন্ত চলে। এ সময়ে অত্যন্ত সুন্দর ও সৌন্দর্যপূর্ণ পরিবেশে মুহাসাবার কাজ সম্পন্ন করা হয়। এতে অনেক সংস্কামূলক দিক পরিলক্ষিত হয়।

বাদ মাগরেব সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

পাটনা সম্মেলন (২৫শে ও ২৬শে এপ্রিল ১৯৪৭)

পূর্ব ভারত, ইউপি, বিহার, উড়িষ্যা, নেপাল, বাংলা এবং আসামের কর্মীদের নিয়ে পাটনা সম্মেলন হয়। এ সম্মেলনে আমীরে জামায়াত ও সেক্রেটারী জেনারেল মিয়া তুফাইল মুহাম্মদ শরীক হতে পারেননি। কারণ, একই তারিখে তাঁরা মাদ্রাজ সম্মেলনে যোগদান করেন। অতএব কেন্দ্র থেকে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী, মালিক নসরুল্লাহ খান আযীয-সম্পাদক কাওসার এবং সাইয়েদ মুহাম্মদ হাশেম, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক বিভাগ- এ সম্মেলনে যোগদান করেন। অংশগ্রহণকারী কর্মীর সংখ্যা ছিল সাড়ে তিনশ'।

প্রথম দিন, ২৫শে এপ্রিল সকাল আটটায় সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। এ ছিল উন্মুক্ত অধিবেশন-স্থান জামায়াত অফিস সংলগ্ন সুলতানগঞ্জ মহেন্দ্র নামক খোলা ময়দান। প্রথম অধিবেশনে চারশ'-এর অধিক লোক যোগদান করেন। কিছু স্থানীয় শুভাকাঙ্ক্ষীও এ অধিবেশনে ছিলেন।

ঠিক সকাল আটটায় তেলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয় এবং মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন। তিনি অধিক সংখ্যক লোকের সম্মেলনে যোগদানের জন্যে খোদার শুকরিয়া আদায় করে বলেন, সাম্প্রদায়িক হানাহানির কারণেই নিখিল ভারত বার্ষিক সম্মেলন স্থগিত করতে হয়েছে। তার পরিবর্তে চারটি আঞ্চলিক সম্মেলন করাই যুক্তিসংগত মনে করা হয়েছে। তিনি তাঁর ভাষণে আল্লাহ তায়ালার ইয়াদকে সর্বাধিক গুরুত্ব দান করেন। তিনি বলেন- মানুষের জ্ঞান, তার বিবেক ও প্রজ্ঞা, মন-মস্তিষ্ক, চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করে আল্লাহ তায়ালার যিকির বা ইয়াদের উপর। অন্যথায় মানুষের বাতেন বা আভ্যন্তরীণ দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তার মন তাকে ভুল পরামর্শ দেয়। তার মন-মস্তিষ্ক তাকে কুপথে চালিত করে। তার হাত-পা অন্যায় কাজের জন্যে তৎপর হয়ে পড়ে। এমনকি কেউ যদি দ্বীনের কাজও করতে চায় এবং তার দিল খোদার স্মরণ থেকে খালি থাকে, তাহলে তার দীনদারী একেবারে দুনিয়াদারীতেই পরিণত হয়। দাওয়াত দানকারীদের এ ধরনের বিপদ থেকে

www.pathagar.org

গাফেল থাকা উচিত নয়। এ রোগের ওষুধ একমাত্র খোদার ইয়াদের মধ্যে নিহিত আছে।

তিনি দ্বিতীয় যে জিনিসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তা হলো দলবদ্ধ চরিত্র গঠন। চরিত্রবান ও নেক লোকের অভাব না অতীতে ছিল আর না এখন আছে। কিন্তু তাঁরা জাতির অধঃপতন এ জন্যে ঠেকাতে পারেননি যে, তাঁরা জামায়াতী যিন্দেগীর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না এবং তাঁরা দলবদ্ধ চরিত্র গঠনও করেননি। ইসলামী বিপ্লবের জন্যে শুধুমাত্র সত্যনিষ্ঠ ও নেক হওয়াই যথেষ্ট নয়-যদি জামায়াতবদ্ধভাবে চরিত্র গঠন করা না হয়। এ নাহলে জামায়াতে ইসলামী গঠনের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে না। ব্যক্তিগতভাবে নেক হওয়াতে কোন লাভ নেই যতোক্ষণ না সামগ্রিকভাবে নেক কাজের দাওয়াত দেওয়া হয়। জামায়াতবদ্ধ জীবনই নেতৃত্ব ও আনুগত্যের পথ বলে দেয়। জামায়াতবদ্ধ জীবন যাপনেই ত্যাগ ও কুরবানী, বিনয়-নম্রতা, ভালবাসা, সহানুভূতি ও শুভাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা সৃষ্টি করে। অন্যান্য জাতির মধ্যে যে ঐক্যের সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের মধ্যে তা না থাকার শাস্তিস্বরূপ আমরা তাদের পেছনে পড়ে রয়েছি।

দেশে যে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড এবং গুণ্ডাবদমায়েশদের যে প্রাধান্য চলছে তার কারণ হচ্ছে আমাদের নৈতিক অধঃপতন। সামাজিক চরিত্র গঠনের দ্বারাই তা থেকে আমরা জাতিকে রক্ষা করতে পারি। কোন দলকে যাচাই করার মানদণ্ডই এই যে, তারা তাদের ঘোষিত নীতি কতখানি বাস্তবে মেনে চলে।

মাওলানা ইসলাহীর ভাষণের পর জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে কাইয়েম সাইয়েদ মুহাম্মদ হাশেম বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। এ রিপোর্টে অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পারা যায়। বেলা এগারোটায় এ অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনটিও ছিল মুক্ত অধিবেশন। এ অধিবেশন যোহর থেকে আসর পর্যন্ত চলে। এখানে পাঁচটি এলাকার রিপোর্ট পেশ করা হয়- যেগুলো পূর্ব ভারতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেগুলো ছিল শাহজাহানপুর, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, বাংলা প্রদেশ ও বিহার। এ রিপোর্টগুলোর পর্যালোচনা করা হয় এবং সন্তোষ প্রকাশ করা হয় যে, রিপোর্ট পদ্ধতি পূর্বের তুলনায় অনেকটা উন্নত ধরনের হয়েছে।

এ অধিবেশনে জামায়াত শুভাকাঙ্ক্ষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে তাঁরা যেন শুভাকাঙ্ক্ষীদের বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ থাকাই যথেষ্ট মনে না করেন। কারণ দ্বীনী খেদমতের প্রকৃত বৃত্ত নির্ধারিত হয় রুকনিয়াতের দ্বারা। শুভাকাঙ্ক্ষী ও মুত্তাফেকীনের (সমর্থকবৃন্দ) জন্যে যে হালকা বা ইউনিট রয়েছে তা জামায়াতে ইসলামীর কোন স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। এ হচ্ছে রুকন হওয়ার প্রস্তুতির জন্যে সাময়িক অবস্থান ক্ষেত্র। তা দীর্ঘায়িত হওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়।

www.pathagar.org

মাওলানা ইসলাহী সহজ সাহিত্য রচনা ও বয়স্কদের শিক্ষাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে আন্দোলনে যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাবে এবং তারেদরকে তৈরীও করা যাবে। তিনি ইন্‌ফাক ফী সাবীলিল্লাহের (আল্লাহর পথে ব্যয়) প্রতিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন যে, আর্থিক অসুবিধার জন্যে কাজে দুর্বলতা দেখা দেয়। বিহারের দাঙ্গা-দুর্গতদের সাহায্য কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ, পাঞ্জাবে ত্রাণ কাজ, কেন্দ্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির জন্যে অর্থের প্রয়োজন। তিনি বলেন, যে কর্মী আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, সে নিফাকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আমাদের এ দ্বীনী কাজের জন্যে অপরের আর্থিক সাহায্যও গ্রহণ করতে পারি। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এ কাজে মদদ করবেন।

তৃতীয় অধিবেশন ছিল সাধারণ সভা যা মাগরেব বাদ শুরু হয়। এখানে মালিক নাসরুল্লাহ খান আযীয ভাষণ দেন। এতে সহস্রাধিক লোক যোগদান করেন। মালিক সাহেব বলেন, মুসলমানদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টার হুকুমাত প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ একামতে দ্বীন। তিনি কুরআন ও হাদীস থেকে তার যুক্তি-প্রমাণও পেশ করেন। তিনি ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন যে, যখনই কোন ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, তখন দুনিয়া এক নতুন জান্নাতে পরিণত হয়েছে। এ পথের প্রতিবন্ধকতার কথাও তিনি বলেন। পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্যে দুনিয়াদারগণ যে ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং যে ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রত্যেক উদ্দেশ্য হাসিলের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি অবশ্যই হয়। কিন্তু হকের যে প্রতিবন্ধকতা, তা যাঁরা বরদাশত করেন তদের জন্যে দুনিয়ার সাথে আখেরাত লাভের সামগ্রী হস্তগত হয়।

তাঁর ভাষণের পর এ অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৬শে এপ্রিল রোজ শনিবার সকাল ৮টা থেকে সাংগঠনিক অধিবেশন শুরু হয়। কাজের প্রচার ও প্রসারের জন্যে বিভিন্ন প্রস্তাব-পরামর্শ গৃহীত হয়। এ ধারণা খণ্ডন করা হয় যে, দ্বীন কায়েমের জন্যে প্রতিষ্ঠিত জামায়াতের সাথে সহানুভূতির সম্পর্কই যথেষ্ট- তার রুকন হওয়ার প্রয়োজন নেই।

মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী তাঁর সভাপতির ভাষণে যিকরে এলাহীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। যার কোন ভিত্তি কুরআন ও হাদীসে নেই সেসব থেকে দূরে থাকার জন্যে কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। উপরন্তু তিনি বলেন, যিকরের সাথে চিন্তাভাবনাও থাকা দরকার। যিকর শুধু মৌলিক বাচনভঙ্গিতে সীমিত থাকা উচিত নয়। কুরআনের উপর চিন্তা-ভাবনা এ ব্যাপারে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। তাহাজ্জুদের সময় এ কাজের বিশেষ সহায়ক। তাযকিয়ায়ে নফসের

www.pathagar.org

(আত্মশুদ্ধির) উৎকৃষ্ট পন্থা এই যে, আমরা খোদার কাজ করি, এ জন্যে খোদার বান্দাদের কাছে দাওয়াত দিব এবং খোদার পথে চলবো। সত্যিকার তাযকিয়া এভাবেই হয়। কর্মপদ্ধতি খানকাহী নয়। আমরা দৈনন্দিন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথাও নিরিবিলি বসে তাযকিয়া করি না। নবীগণের পন্থা এই ছিল যে, তাঁরা লোকের কাছে দাওয়াত নিয়ে হাজির হতেন, তাদের বিরোধিতা বরদাশত করতেন। এ অধিবেশন বেলা এগারোটায় শেষ হয় এবং পরবর্তী অধিবেশন যোহর থেকে আসর পর্যন্ত চলে। এ অধিবেশনে নতুন করে কিছু এলাকা চিহ্নিত করা হয়। ইউপি প্রদেশকে ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়।

ষষ্ঠ ও শেষ অধিবেশন ছিল জনসভা, যা সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হয়। এ সভায় জামায়াতকর্মী ছাড়াও শুভাকাঙ্ক্ষী, সাধারণ মুসলমান এবং অমুসলমানদের দাওয়াত দেয়া হয়। এর জন্যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় যাতে সকলের সামনে জামায়াতের দাওয়াত পেশ করা যায়। শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকেও সভায় যোগদানের দাওয়াত দেয়া হয়।

সভায় তিন সহস্রাধিক লোক হাজির হয়। "জামায়াতে ইসলামী কি চায়? কেন চায়? কিভাবে চায়? এ বিষয়ের উপরে ভাষণ দেন মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী। শ্রোতাগণ নীরব নিস্তব্ধ হয়ে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে মনোযোগ সহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করে। মাওলানা ইসলাহী "আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার"-এর প্রতি মুসলমানগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ইসলামের দাওয়াত দান থেকে মুসলমানগণের অনীহা দ্বীনের মূলনীতি থেকে সরে পড়ারই নামান্তর মাত্র। তিনি অমুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলেন, আপনারা মুসলমানদের বিকৃত চরিত্র ও আচরণের প্রতি লক্ষ্য না করে রসূলে করীমে (সঃ) আচরণ ও ভূমিকার প্রতি লক্ষ্য করুন। মুসলমানদের কার্যকলাপের পরিবর্তে কুরআনের মহান শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। অপরের প্রতি জিদের বশবর্তী হয়ে সত্যের সাথে পরিচিত না হওয়া কারো জন্যেই মঙ্গলকর নয়।

এ জনসভায় শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে মিঃ গান্ধীও যোগদান করেন। গান্ধীজী শ্রোতা হিসেবে যোগদান করেন। এ বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। সংবাদপত্রে এ নিয়ে খুব হৈ-চৈ হয়। কংগ্রেস পক্ষের অভিযোগ এই যে, জামায়াতে ইসলামীর একটি অনুল্লেখযোগ্য সাধারণ সভায় যোগদান তাঁর ব্যক্তিত্বকে খাটো করা হয়েছে। যেহেতু তাঁকে কোন প্রকার সম্বর্ধনা জানানো হয়নি, তাঁকে সম্মান দেখানো হয়নি, সভায় কিছু বলতে দেয়া হয়নি, ইত্যাদি ইত্যাদি। অপরদিকে জামায়াতের সভায় গান্ধীজীর যোগদানকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগ মহল কংগ্রেস ও জামায়াতের মধ্যে এক গোপন যোগসূত্র

www.pathagar.org

আবিষ্কার করে। জাতীয়তাবাদী দলগুলো এ ব্যাপারে যে নিকৃষ্ট ধরনের নৈতিক ভূমিকা পালন করে তা এ ধরনের দলগুলোর পক্ষেই শোভনীয়।

প্রকৃত ঘটনা এই যে, বিহারের দাঙ্গাদুর্গত এলাকা দেখার জন্যে মিঃ গান্ধী পাটনায় আগমন করেন। অন্যান্যের সাথে তাঁকেও সভায় যোগদানে আমন্ত্রণ জানালে তিনি যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জামায়াতের উদ্যোক্তাগণ শ্রদ্ধা সহকারে গান্ধীজীর নিকটে নিম্নোক্ত চারটি শর্ত পেশ করেন।

- সভায় তাঁর জন্যে বিশিষ্ট কোন শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে না। কারণ, এ ধরনের বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন জামায়াতের নীতির পরিপন্থী।
- সভায় তাঁকে বক্তৃতার কোন সুযোগ দেয়া হবে না, অবশ্য প্রশ্ন করার সুযোগ থাকবে।
- তাঁর সাথে মহিলা আগমন করলে তাঁরা মহিলাদের ক্যাম্পে আসন গ্রহণ করবেন।
- যথাসময়ে সভার কাজ শুরু হবে। তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় সভার কাজ বিলম্বে শুরু করা হবে না।

মিঃ গান্ধী শর্তগুলো মেনে নিয়েই সভায় যোগদান করেন। তাঁর সাথে যে দুজন মহিলা আগমন করেন, তাঁদেরকে পর্দা করা মহিলা ক্যাম্পে বসতে দেয়া হয় এবং গান্ধীজী মঞ্চের সামনে অন্যান্যের সাথে ফরাশের উপর বসে পড়েন। বক্তৃতার পর তিনি চলে যান। সভার পরিচালক গাজী আবদুল জাব্বার মাওলানা ইসলাহীর সাথে গান্ধীজীর পরিচয় করিয়ে দেন। ইসলাহী সাহেব সংক্ষেপে তাঁর কাছে জামায়াতের দাওয়াত পেশ করেন। গাজী আবদুল জাব্বার জামায়াতের সাহিত্য অধ্যয়ন করার জন্য গান্ধীজীর প্রতি আহ্বান জানালে তিনি বলেন যে, তিনি দিল্লী যাচ্ছেন এবং জামায়াতের সাহিত্য অধ্যয়নের জন্যে সময় বের করার চেষ্টা করবেন।

এ ঘটনাকে রঙের প্রলেপ দিয়ে অন্যভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয়েই জামায়াতকে লোক-চোখে হেয় করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

এভাবে পাটনার ঐতিহাসিক জামায়াতে ইসলামী সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

পাঠানকোট সম্মেলন (৯ই ও ১০ই মে, ১৯৪৭ সাল)

উত্তর ভারতের কর্মীদের নিয়ে সম্মেলন দারুল ইসলাম পাঠানকোর্টে সাতচল্লিশের ৯ই মে শুরু হয়। এ ছিল অখণ্ড ভারতের সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ সম্মেলন। সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান এবং কাশ্মীর অঞ্চলের কর্মীগণ এ সম্মেলনে যোগদান

www.pathagar.org

করেন। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা আট শতাধিক ছিল। জনসভায় দুহাজারের অধিক লোক যোগদান করেন, যাঁদের মধ্যে হিন্দু এবং শিখ সম্প্রদায়ের লোকও ছিলেন।

দুদিনে কয়েকটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে জামায়াতের বার্ষিক রিপোর্টের সাথে এলাকাভিত্তিক রিপোর্টও পেশ করা হয়।

এ সম্মেলনে আমীরে জামায়াত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী "ভাঙা ও গড়া" শীর্ষক তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ পেশ করেন।

ভাষণে তিনি জাতিসমূহের উত্থান-পতনের বুনিয়াদী নৈতিক মূলনীতি বর্ণনা করেন। তিনি এ কথা সুস্পষ্ট করে দেন যে, বিশ্বস্রষ্টা দুনিয়ায় শুধু সৃজনশীলতা ও গঠনমূলক কার্যক্রমই ভালোবাসেন। যে জাতি ধ্বংস ও অধঃপতনের মুকাবিলায় গঠনমূলক কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, তাকে অবকাশ দান করেন। পক্ষান্তরে যারা গড়ার পরিবর্তে ভাঙার কাজ করে, তাদেরকে দুনিয়ার নেতৃত্ব থেকে অপসারিত করা হয়। কারণ, বিশ্বস্রষ্টার আইনের দৃষ্টিতে দুনিয়ার গঠনমূলক কাজই তাঁর বাঞ্ছনীয়।

তাঁর ভাষণ শেষে কিছু প্রশ্নের জবাব দান করেন। অতঃপর দক্ষিণ ভারতের সম্মেলনে তিনি যেমন স্বাধীন ভারতের জন্যে জামায়াতে ইসলামীর চার দফা কর্মসূচী পেশ করেন, তেমনি সম্মেলনে তিনি ভবিষ্যতের স্বাধীন পাকিস্তানের জন্যে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী পেশ করেন। উভয় কর্মসূচী ছিল ভিন্ন ভিন্ন ধরনের।

তাঁর ভাষণ এ দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, এ অবিভক্ত ভারতে দান করা হয়েছিল এবং তখনো জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান অস্তিত্ব লাভ করেনি। এর গুরুত্ব এদিক দিয়েও অধিক ছিল যে, এতে গোটা কেন্দ্রীয় টীম উপস্থিত ছিল এবং উত্তর ভারতের ঐসব অঞ্চলের কর্মী উপস্থিত ছিলেন, যেসব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর আর একটি গুরুত্ব এই ছিল যে, ভবিষ্যতে অস্তিত্ব লাভকারী পাকিস্তানের পরিবর্তিত অবস্থায় জামায়াতের কাজের কর্মপদ্ধতি আগাম বলে দেয়া হয়। এতে আন্দোলনের নেতৃত্বের সুদূরপ্রসারী প্রজ্ঞা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় যে, ভারত বিভাগের পর ভারত-পাকিস্তানের যে ফেতনা ও অশান্তি দেখা দিতে পারে তার প্রকৃত অবস্থা ও ধরন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এ ধরনের পরিবর্তিত অবস্থার ভিত্তিতে উভয় দেশে পৃথক পৃথক কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত করার প্রজ্ঞা ও যোগ্যতাও এ নেতৃত্বের ছিল।

পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার পর এ পরিবর্তিত কর্মপদ্ধতিকে কেউ কেউ জামায়াতের প্রাথমিক কর্মপদ্ধতির পরিপন্থি বলে আখ্যায়িত করে এর সমালোচনা করেন। এটা ঠিক এ ধরনের যুক্তি যে, কোন ব্যক্তি কোন শিশু বয়স্ক হওয়ার পর তাকে ঐ

www.pathagar.org

ধরনের পোশাক ও খাদ্য পরিবেশনের কথা বলে যা তার শৈশবকালীন লালন-পালনের উপযোগী ছিল অথবা মওসুম ও অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে পোশাকের কোন পরিবর্তন করতে সে রাজী নয়।

আমীরে জামায়াত ১০ই মে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত শীর্ষক যে বক্তৃতা করেন, তা ঐতিহাসিক পটভূমির দিক দিয়ে আসন্ন পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের ভবিষ্যত কর্মসূচীই ঘোষণা করে। তিনি সর্বপ্রথম শ্রোতাদেরকে খোদা ভীতি ও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার নসিহত করেন। কারণ অশান্তি, অনাচারের মূল হচ্ছে খোদা থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং সংস্কারের প্রকৃত উপায় হচ্ছে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত করা।

তাঁর দ্বিতীয় উপদেশ ছিল এই যে, সমস্ত কাজের মধ্যে থাকতে হবে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। একটা শান্ত ও গুরুগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি এবং ইসলামের সামাজিক আদব-শিষ্টাচারের প্রতি তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বৈঠকাদিতে একাগ্রচিত্তে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান যাতে করে দূর থেকে বহু কষ্ট স্বীকার করে সম্মেলনে যোগদান করা সার্থক হয়। তিনি আরও বলেন, এখানে পারস্পরিক পরিচিতি ও সম্পর্ক বাড়াবার চেষ্টাও করতে হবে। জামায়াতে ইসলামী কিছু হাত বদলের জন্যে ময়দানে নামেনি, বরঞ্চ এ গোটা ব্যবস্থাকে পরিবর্তনকারী একটি বিপ্লবী দল। ব্যবস্থা পরিবর্তনের কাজ বড়ো কঠিন ও কষ্টসাধ্য হয়ে থাকে। প্রচলিত বাতিল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের এ যুদ্ধ ঘোষণা। আমাদের এ ঘোষণা কেউ বরদাশ্‌তও করবে না।

অতঃপর তিনি বাতিল ব্যবস্থার তিনটি বুনিয়াদ বর্ণনা করেন। তাহলো, সেকুলারিজম অর্থাৎ ধর্মহীনতা, ন্যাশনালিজম অর্থাৎ জাতিপূজা এবং ডেমোক্রেসী (গণতন্ত্র) অর্থাৎ জনগণের সার্বভৌমত্ব। তিনি বলেন- ধর্মনিরপেক্ষবাদ (Secularism) দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যা ইসলামী ধারণার পরিপন্থি। জাতিপূজাও খোদা-পরস্তির মুকাবিলায় একটি শির্কমূলক ধারণা এবং জাহেলিয়াতের সংকীর্ণ গোঁড়ামির উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্র তথা জনগণের সার্বভৌমত্ব শির্কেরই একটি আকৃতি, যেহেতু ইসলাম খোদার সার্বভৌমত্বের পতাকাবাহী। এ তিনটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে তিনি খাঁটি অনৈসলামী এবং বাতিল ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করেন। তার মুকাবিলায় ইসলামী ব্যবস্থার বুনিয়াদ অন্যান্য তিনটি মুলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। তাহলো, খোদার দাসত্ব, আনুগত্য, মানবতার কল্যাণ এবং জনগণের খেলাফতের উপর সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। ধর্মহীন গণতন্ত্র মেনে নেয়াকে তিনি কুরআন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করার নামান্তর বলেন। এ ধরনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করা আপন রসূল পাক (সঃ) থেকে মুখ ফেরানো এবং আপন

www.pathagar.org

খোদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলনের অপর নাম বলে মন্তব্য করেন।

তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, এ কথা স্থিরীকৃত যে দেশ বিভক্ত হয়ে যাবে। এক অংশ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে সোপর্দ করা হবে এবং দ্বিতীয় অংশ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে আমরা চেষ্টা করবো- জনমত গঠন করে এমন এক শাসনতন্ত্র ও আইনের রাষ্ট্রের বুনিয়াদ কায়েম করার যাকে আমরা মুসলমান খোদার শাসনতন্ত্র ও আইন বলে স্বীকার করি। অমুসলিম ভাইদের কাছে আমাদের আবেদন, তাঁরা আমাদের বিরোধিতা করার পরিবর্তে আমাদেরকে কাজ করার সুযোগ দেবেন যাতে করে তাঁরা দেখতে পান যে, একটা ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় গণতন্ত্রের তুলনায় খোদার আনুগত্যের ভিত্তিতে গঠিত একটি গণতান্ত্রিক খেলাফত সমগ্র পাকিস্তানবাসীর জন্যে এবং অতঃপর গোটা দুনিয়ার জন্যে কতটা রহমত ও বরকত বলে প্রমাণিত হয়। কারণ, এ খেলাফত কায়েম হবে রসূলে আকরাম (সঃ)-এর নির্দেশ ও হেদায়েত অনুযায়ী।

এক প্রশ্নের জবাবে মাওলানা বলেন, নির্বাচন ও আইন সভায় যাওয়ার উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, একটি অনৈসলামী শাসনতন্ত্রের অধীনে একটি ধর্মহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনা করা হবে, তাহলে তা হবে আমাদের তাওহীদের আকীদাহ-বিশ্বাস ও আমাদের দ্বীনের পরিপন্থি। কিন্তু কখনো যদি আমরা দেশের জনমতকে এতোখানি আমাদের আকীদাহ ও মতবাদের সপক্ষে আনতে পারি যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করে দেশের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করতে পারব, তাহলে এ ভাবে কাজ না করার কোন কারণ থাকবে না। লড়াই না করে সহজে যে জিনিস লাভ করা যায়, তা অযথা বাঁকা আঙুল দিয়ে টেনে বের করার জন্যে শরিয়ত কোন নির্দেশ দেয়নি। আমাদের কথা এই যে, জনমত যদি আমাদের অনুকূল হয়ে যায় এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে দেশবাসীর মধ্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার চাহিদা সৃষ্টি হয়, তাহলে তারপর নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টাচরিত্র একেবারে শরিয়ত সম্মত।

তিনি বলেন, ইসলামী বিপ্লবের সংগ্রামের কতগুলি সুস্পষ্ট স্তরে আছে। প্রথম স্তরে জনগণের চিন্তার পরিশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন করতে হবে। অর্থাৎ জাহেলিয়াতের চিন্তাধারার জঞ্জাল পরিষ্কার করে ইসলামী জীবন বিধানের রাজপথ সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে। দ্বিতীয় স্তর হলো তানযীম ও তরবিয়তের, যার মাধ্যমে এমন একটি বাহিনী বা টীম তৈরী হবে, যারা ইসলামী শাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তৃতীয় স্তরে সমাজের সাধারণ সংস্কার-সংশোধন করতে হবে, যাতে করে তাদের মধ্যে ইসলামী শাসনের চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং তার জন্যে দাবী উত্থাপিত হতে

www.pathagar.org

থাকে এবং তারা যেন তাদের গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড ইসলামের দাবী অনুযায়ী সমাধা করতে পারে। চতুর্থ স্তর হচ্ছে মিল্লাতের মধ্যে নেতৃত্বের বিপ্লব সাধন করা, এর দ্বারা সৎ ও যোগ্য লোককে সম্মুখে অগ্রসর করানো এবং অসৎ লোককে পশ্চাতে ঠেলে দেয়া যাবে। এ হচ্ছে চারটি মূলনীতি- যার ভিত্তিতে আমরা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের সংগ্রাম করবো।

এ ছিল কাজের সেই নক্‌শা যা পাকিস্তান অস্তিত্ব লাভ করার পূর্বেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েমের সংগ্রামের জন্যে জামায়াতে ইসলামী পূর্ব থেকেই তৈরী করে রেখেছিল। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ এ কথারই প্রমাণ পেশ করে যে, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানে আসার পর তার যাবতীয় রাজনৈতিক তৎপরতা এ কর্মসূচির আলোকেই পরিচালিত করে।

উপরোক্ত চারটি সম্মেলনের কার্যবিবরণী থেকে আমাদের সামনে জামায়াতে ইসলামীর ঐতিহাসিক ভূমিকার আলোকচ্ছটা উজ্জ্বল হয়ে উঠে, যা সে পরবর্তীকালে ভারত ও পাকিস্তানের পৃথক পৃথক এলাকায় দ্বীনী, শিক্ষাগত, রাজনৈতিক ও নৈতিক দিক দিয়ে পালন করে।

জনসভায় ভাষণ দেয়ার জন্যে বক্তার মান নির্ণয়

জামায়াতে ইসলামী তার সংগঠন ও প্রশিক্ষণের মান অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে এমন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতো যে, জামায়াতের মধ্যে কারো বক্তৃতা দেয়ার যোগ্যতা থাকলেই তাকে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো না। বক্তৃতাদানকারীদের জন্যে জামায়াত একটা মান নির্ধারণ করে দিয়েছিল। সাধারণ কর্মীদের উপর এ বাধা-নিষেধ ছিল যে, যতোক্ষণ না জামায়াত থেকে তাকে অনুমতি-পত্র দেয়া হবে, ততোক্ষণ সে কোন জনসভায় বক্তৃতা করবে না।

অন্যান্য দলে বক্তৃতা করা নেতৃত্বের একটা গুণ মনে করা হয়। যিনি যতো উচ্চস্বরে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা করতে পারেন, তিনিই নেতা সাজতে পারেন। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী লাগামহীন বক্তৃতা করাকে তার নীতি-বিরুদ্ধ মনে করে। সেজন্যে যারা বক্তৃতার যোগ্যতা রাখতেন, তাদেরকে একটা প্রশ্নমালা দেয়া হতো পূরণ করে দেয়ার জন্যে। অতঃপর তার জবাবের ভিত্তিতে জনসভায় বক্তৃতার অনুমতি দেয়া হতো।

www.pathagar.org

প্রশ্নমালা

১। আপনি কি বক্তৃতার মাধ্যমে সঠিকভাবে জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন?

২। আপনার কি এতোটুকু নৈতিক সাহস রয়েছে যে, জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে যদি আপনাকে কোন প্রশ্ন করা হয় যার জবাব দিতে আপনি পারেন না, তাহলে আপনি কী নিঃসংকোচে বলে দেবেন যে, আপনি জবাব দিতে পারবেন না?

৩। আপনি বক্তৃতা করতে গিয়ে মূল বিষয়বস্তু থেকে সরে যাবেন না তো?

৪। আপনার মধ্যে এতো সহনশীলতা কি আছে যে, যদি আপনার প্রতি উত্তেজনাকর মন্তব্য ও গালমন্দ করা হয়, তাহলে আপনি নিজেকে সংযত রাখতে পারবেন?

এ প্রশ্নগুলো শুধু বক্তাদেরকেই করা হতো না, বরঞ্চ অন্যান্য রুকনদেরকেও করা হতো যে, তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় বক্তৃতার জন্যে অভিলাষী ব্যক্তিগণ কতোখানি মানে পৌঁছেছেন।

বক্তৃতার এ মান নির্ণয় করা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, জামায়াতে ইসলামী নিয়ম-শৃঙ্খলার দিক দিয়ে কতটা কঠোর। তাছাড়া, জামায়াত ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সাথে এক একজনের দ্বীনী, নৈতিক এবং ইলম ও আমলের প্রশিক্ষণ দিত যাতে করে ইসলামী শাসন কায়েমের জন্যে এমন একটি বাহিনী তৈরী হতে পারে যার আচার-আচরণের উপর কারো অঙ্গুলি নির্দেশের কোন অবকাশ থাকবে না। জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা বলেছিলেন, সৎ লোকের এমন এক সুশৃঙ্খল বাহিনী যদি তৈরী হয়, যারা ইসলামকে তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছে, তাহলে আগামী দিনের সূর্যোদয় যেমন নিশ্চিত, তেমনি এটাও নিশ্চিত যে, কোন না কোন একদিন সমাজের নেতৃত্ব তাদেরই হাতে আসবে ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.org

একাদশ অধ্যায়

পাকিস্তান আন্দোলন ও জামায়াতে ইসলামী

পাকিস্তান আন্দোলনের মূলে ছিল মুসলমানদের ঈমান ও আকীদাহ-বিশ্বাসের প্রেরণা ও দাবী। ঈমানের দাবীই হলো এই যে, মুসলমান সকল দাসত্ব-আনুগত্য, প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব, আইন-শাসন ও গোলামী প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব-আনুগত্যের জীবন যাপন করবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই আইন-শাসন মেনে চলবে। মুসলমান ও মানুষের গোলামী-এ দুটি কখনো একত্র হতে পারে না। সে গোলামী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক হোক অথবা সাংস্কৃতিক ও মানসিক। এ কখনো সম্ভব নয় যে, মানুষের কোন প্রকার গোলামীর পরিবেশে মুসলমান তার ঈমানের দাবী পূরণ করতে পারে। কারণ, ইসলাম তাকে সকল প্রকার গোলামী ও আনুগত্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে একমাত্র খোদারই অনুগত বানিয়ে দেয়। তাই সত্যিকার মুসলমানের মেজাজ প্রকৃতিই এই হয় যে, সে তাগুত তথা খোদাবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করবে এবং তা উৎখাত করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর শেষ নবীর (সঃ) নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

ভারত উপমহাদেশে সাড়ে পাঁচশ' বছরের মুসলিম শাসন আমলে বিশেষ করে মুসলিম শাসকগণ যদি জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্যিকার মুসলমানী জীবন যাপন করতেন, ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার ও ইসলামী চরিত্র গঠনের কাজ করতেন, তাহলে ভারতের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতো। ব্যক্তিগতভাবে দু'একজন শাসক মুসলমানী জীবন যাপন করলেও মোগল শাসন আমলে ইসলামের সাধারণভাবে চরম নৈতিক বিকৃতি ঘটে।

সাধারণত ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এ উপমহাদেশের কোটি কোটি মানুষ মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও ইসলামী চরিত্র গঠনের কোন ব্যবস্থা তাদের জন্যে করা হয়নি। ফলে নও মুসলিমদের অধিকাংশই ঐ সব মুশরেকী ও জাহেলী রসম-রেওয়াজের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি, যা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তারা মেনে চলতো। বাইর থেকে যে সব মুসলমান এ দেশে এসেছিল, তাদের অবস্থাও ভারতীয় মুসলমান থেকে তেমন বেশী ভালো ছিল না। পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি তাদের ছিল অধিক আগ্রহ-আসক্তি। মুসলিম শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল শুধু দেশ শাসন করা। ইসলামের কোন খেদমত তাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল না।

বিশেষ করে বাদশাহ আকবরের শেষের দিকে তাঁরই উদ্যোগে ভারতভূমি থেকে ইসলামকে নির্মূল করার এক গভীর ষড়যন্ত্র চলেছিল। এ ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যুগিয়েছিলেন শুধু তাঁর অমুসলিম অমাত্যবর্গই নয়, কতিপয় দুনিয়াপূজারী আলেম ও মুসলিম পণ্ডিত। 'দ্বীনে এলাহী'র এক আপাত সুন্দর নাম দিয়ে নতুন এক

www.pathagar.org

ধর্মের প্রবর্তন করা হয়েছিল। মুসলমানী নাম রাখা, খাতনা করা, গরুর গোশত খাওয়া, দাড়ি রাখা, মুসলমান মাইয়েতকে কবর দেওয়া প্রভৃতি এ নতুন ধর্মে নিষিদ্ধ ছিল। নামায-আযান বন্ধ হয়ে গেল। বাদশাহকে সিজদাহ করার প্রচলন হলো। এ ধর্মে হিন্দুদের উৎসব দেওয়ালী, দশোহারা, রাখীপূর্ণিমা, শিবরাত্রি প্রভৃতি পালন করার ব্যবস্থা করা হলো। শেষ কথা, মুসলিম সমাজকে পৌত্তলিক সমাজে পরিণত করার সকল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করা হলো। মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে তওবা করে এ ধর্মের শপথ গ্রহণ করতে হতো। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতিকে এবং আকবরের দরবারের হিন্দু অমাত্যবর্গকে খুশী করার জন্যে যে নতুন ধর্মের আবির্ভাব ঘটানো হলো, সে ধর্মে আকবরের দরবারের কোন হিন্দু পরিষদ দীক্ষিত হননি। ইসলামের ইতিহাসে আকবরের ন্যায় এতো বড়ো ইসলামের শত্রুর কোন নজীর পাওয়া যায় না।

কিন্তু আকবর তাঁর গোটা রাষ্ট্রীয় শক্তি দিয়েও কল্পিত ধর্মের গোড়া পত্তন করতে পারেন নি। তার কারণ এই যে, সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের বিকৃতি যতোই ঘটে থাক না কেন, তাদের মনের অভ্যন্তরে ইসলামী চেতনা ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিস্ফুলিংগের মতো বিদ্যমান ছিল এবং তা প্রজ্বলিত করার জন্যে কিছু আল্লাহর পিয়ারা বান্দাহও এদেশে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁদেরই একজন শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী আকবরের নতুন ধর্মের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন।

আকবরের পর তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করে 'দ্বীনে এলাহী, ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও ব্যর্থ হন। এ ধর্মের বিরোধিতা করার অপরাধে শায়খ আহমদকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়। তথাপি ইসলামের বিকল্প এক নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সাধ চিরতরে নির্মূল হয়ে যায়। জাহাঙ্গীর অবশেষে আলফে সানীর কাছে-নৈতিক পরাজয় বরণ করেন। আকবর তাঁর ষড়যন্ত্রমূলক এক অতি অভিনব ধর্ম প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু সেই সাথে তিনি এ উপমহাদেশে মোগল সাম্রাজ্য তথা মুসলিম শাসনের অধঃপতনের বীজও বপন করেন। তার ফলেই ১৭৫৭ সালে পলাশীর মাঠে মুসলিম শাসনের রবি অস্তমিত হয়।

তারপর থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত পুরা দু'শ বছর উপমহাদেশের মুসলমানদের ইতিহাস অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ইংরেজ শাসন কায়েমের ফলে মুসলমানরা শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকেই অপসারিত হয়নি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদেরকে চরম দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়। এককালীন শাসকশ্রেণী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার পর তাদের মধ্যে পরাজিতের মানসিকতা সঞ্চার হতে থাকে এবং তারা ইসলাম থেকে অধিকতর দূরে সরে পড়ে। ইসলামী আকীদাহ-বিশ্বাসে ফাটল ধরতে থাকে এবং তাদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। জীবনকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি দ্বীনদারী, অপরটি দুনিয়াদারী। রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশ ও সমাজ পরিচালনা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শিল্পকলা প্রভৃতি দুনিয়াদারী মনে করে তা বর্জন করা হয় এবং জীবনের অতি সংকীর্ণ পরিসরে

www.pathagar.org

ইসলামের আংশিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক কিছু ক্রিয়াকর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাকে দ্বীনদারী মনে করা হয়। এ ধারণার পৃষ্ঠপোষকতা করে সূফীবাদ যা ক্রমশ বেদান্তবাদ, যোগবাদ, খৃস্টীয় বৈরাগ্যবাদ প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম উম্মতের একটা অংশকে মোরাকাবা, মুশাহাদা, রিয়াযাত, কামালাত, সবর ও হাকীকাত প্রভৃতি জটিল দার্শনিক ব্যাখ্যার গোলক-ধাঁধায় নিক্ষেপ করে। আকবরের 'দ্বীনে এলাহী' প্রতিষ্ঠা লাভ না করলেও তার বিষক্রিয়া মুসলিম ও নওমুসলিমদের একটা বৃহত্তর অংশকে এমনভাবে সংক্রমিত করে যে, কিছুটা মুসলমানী এবং কিছুটা হিন্দুয়ানী এমন এক মিশ্র সভ্যতা সংস্কৃতির জগাখিচুড়ি তৈরী হয়।

শাহ ওলী উল্লাহ দেহলবী (রঃ)

মুসলমানদের এমন এক পতন-যুগে শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবীর মতো একজন মুসলিম মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। বাদশাহ আওরঙ্গযেব আলমগীরের মৃত্যুর চার বছর পর ১৭০৩ খৃস্টাব্দে তিনি দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। বৃটিশ শাসন তখনও দিল্লী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেনি। তিনি এমন এক যুগে জন্মগ্রহণ করেন, যখন ফররুল শাহ, মুহাম্মদ শাহ রংগীলা ও শাহ আলমের মতো লোক নামকা ওয়াস্তে দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন। বিপদের ঘনঘটার প্রতি চক্ষু বন্ধ করে তাঁরা বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়পূজায় লিপ্ত ছিলেন। চারধারে লুটতরাজ, জুলুম-অত্যাচার, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার রাজত্ব চলছিল। এমন যুগে ও পরিবেশে শাহ ওলীউল্লাহর মতো মনীষীর আবির্ভাব সত্যিই বিস্ময়কর।

প্রথমত, মুসলমানদের চিন্তাধারায় জাহেলিয়াতের যে জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছিল, তা তিনি কুরআন-হাদীসের বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা পরিষ্কার করেন। ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন এবং এ সবের মাধ্যমে ইসলামের নামে মুসলিম সমাজে যতো প্রকার বেদআতের সমাবেশ ঘটেছিল, তা তিনি খণ্ডন করেন এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এমন যুক্তিসঙ্গত ও সুসামঞ্জস্য খসড়া পেশ করেন, যা সরল প্রকৃতির ও বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হতে পারে। এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে যদিও কার্যত কোন আন্দোলন তিনি গড়ে তুলেননি এবং তার ফুরসতও হয়তো তাঁর হয়নি, তথাপি তাঁর যে কাজটি সবচেয়ে বেশী আলোড়ন সৃষ্টিকারী হয়, তাহলো এই যে, তিনি জাহেলী রাষ্ট্র ও ইসলামী রাষ্ট্রের চিত্র সুস্পষ্টরূপে জনসমক্ষে পেশ করেন এবং এ বিষয়টিকে বার বার এমন পদ্ধতিতে তুলে ধরেন যার ফলে ঈমানদারদের পক্ষে জাহেলী রাষ্ট্র খতম করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রচেষ্টা না চালিয়ে নিশ্চেষ্ট মনে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' এবং 'ইযালাতুল খিফা'-এ দুখানি গ্রন্থে কুরআন-হাদীসের সাহায্যে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

www.pathagar.org

সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী (রঃ) ও শাহ ইসমাঈল শহীদ (রঃ)

শাহ ওলী উল্লাহর বিরাট অবদান এই যে, তিনি কুরআন-হাদীসের শিক্ষা ও আপন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সৎ ও সুস্থ চিন্তাসম্পন্ন লোকদের একটি বিরাট দল তৈরী করেন। তাঁর চার সুযোগ্য পুত্র, বিশেষ করে শাহ আবদুল আযীয (রঃ) এ দলটির কলেবর বৃদ্ধি করেন। তাঁদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হাজার হাজার লোক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন, যা, পরবর্তীকালে একটি শক্তিশালী আন্দোলনের রূপ দান করে।

শাহ সাহেবের চিন্তাধারাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যে সাইয়েদ আহমদ বেরলভী ও শাহ ইসমাঈলকে ইসলামী আন্দোলনের দৃশ্যপটে আমরা দেখতে পাই। সাইয়েদ আহমদ (রঃ) ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বেরেলীতে এবং শাহ ইসমাঈল ১৭৭৯ খৃস্টাব্দে দিল্লীর উক্ত শাহ পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের মৃতপ্রায় মুসলমান জাতির মধ্যে তাঁরা যেভাবে সশস্ত্র জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং নিজেদের সাংগঠনিক যোগ্যতার পরিচয় দেন তা অতীব বিস্ময়কর। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এমন কি বাংলাদেশ থেকেও হাজার হাজার মুজাহেদীন আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে তাঁদের সাথে মিলিত হয়। তাঁদের সিপাহীদের দিন কাটতো ঘোড়ার পিঠে যুদ্ধ বেশে এবং রাত কাটতো জায়নামাযে। এভাবে তাঁরা দীর্ঘ বারো শতক পরেও সাহাবায়ে কেরামের সীরাতের নমুনা পেশ করেন। তাঁরা একটি ক্ষুদ্র এলাকায় খেলাফত আলা মিন্‌হাজিন্ নবুয়্যাত (নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত) তথা একটি সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেন। কিন্তু কতিপয় দুর্বল ঈমান মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এ রাষ্ট্র বেশী দিন স্থায়ী হতে পারেনি। ১৮৩১ সালে বালাকোট প্রান্তরে তৎকালীন জাহেলী শক্তিত্রয়ের বিরুদ্ধে ইসলামের পতাকাবাহীদের যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয়, তাতে বহু মুজাহেদীনসহ সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী (রঃ) ও শাহ ইসমাঈল (রঃ) শাহাদাত বরণ করেন।

তাঁদের আন্দোলন বাহ্যত ব্যর্থ হলেও তা ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে রেখে গিয়ছিল এক দুর্বার ইসলামী চেতনা ও ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের অদম্য প্রেরণা, যার বহিঃপ্রকশ ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। তখন বৃটিশ তাদের রাজনৈতিক শক্তি ভারতে দৃঢ়তর করতে সক্ষম হয়েছে।

এবার অত্যাচারী ও রক্তপিপাসু বৃটিশ শাসকের পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের পালা শুরু হয়, যার জন্যে তারা ভারতের হিন্দু জাতিকে সহায়ক শক্তি হিসেবে বেছে নেয়।

তারপর প্রায় দু'শ' বছর যাবৎ এ উপমহাদেশে বৃটিশ ও হিন্দুদের দ্বৈত শাসনে মুসলমানগণ চরম জুলুম-নিপীড়নের শিকার হয়। যার ফলে তাদেরকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে পাকিস্তান আন্দোলন করতে হয়।

www.pathagar.org

পাকিস্তান অর্জনের পথে মাওলানা মওদূদী প্রণীত- "মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ" এবং "মাসয়ালায়ে কাওমিয়াত" গ্রন্থদ্বয় বিরাট খেদমত করেছে। এখন প্রশ্ন, এতোসব করার পরও মাওলানা মওদূদী মুসলিম লীগের সাথে মিলে আন্দোলন করেননি কেন? তার একমাত্র কারণ ছিল মুসলিম লীগের কর্মপন্থা। মাওলানা একাধিকবার এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন-

- যদি আমাদের লক্ষ্য একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন হয়, তাহলে সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে আমাদের জাতিকে নৈতিক দিক দিয়েও তৈরী করে নিতে হবে। এর জন্যে শিক্ষাদীক্ষা, চিন্তাধারা, নৈতিকতা, তাহযীব-তামাদ্দুন, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই আমাদেরকে কাজ করতে হবে। তা ছাড়া এ উদ্দেশ্য সফল হওয়া বড়োই সুকঠিন।
- এ আন্দোলনে সার্বিকভাবে এ সকল বিভাগে নেতৃত্ব নির্বাচনে অতি সাবধানতার সাথে কাজ করতে হবে। সমাজতন্ত্রী, নাস্তিক, ধর্মহীন জায়গীরদার-জমিদার প্রভৃতি সকলকে একস্থানে একত্র করলে যে ভিড় জমে ওঠে, তা কোন দিনই জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে না। এরা তো একে অপরের ধ্বংস সাধনে ও নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যেই জাতিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। ফলে গন্তব্যস্থান লক্ষ্যচ্যুত হবে।
- মুসলমানদের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা একটি আদর্শবাদী ও সত্যের দিকে আহ্বানকারী দল। কোন মূল্যেই যেন এ বৈশিষ্ট্য প্রভাবিত হতে না পারে।

দুঃখের বিষয়, মুসলিম লীগ কর্তৃপক্ষ এসব কথার কোন গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজনবোধ করেনি।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ থেকে লিখিত এক পত্রের জবাবে মাওলানা বলেন-

"আপনারা কখনো একথা মনে করবেন না যে, কোন প্রকার মতানৈক্যের কারণে আমি এ কাজে অংশগ্রহণ করছি না। প্রকৃতপক্ষে আমার অক্ষমতা এই যে, আমি বুঝতে পারছি না যে, যদি অংশগ্রহণ করি তো কিভাবে করব। অর্ধ বা অসম্পূর্ণ উপায়-পদ্ধতি আমার মনে ধরে না। নিজের জন্যে এটাই সঙ্গত মনে করি যে, আমি এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার পরিবর্তে একজন ছাত্রের মতো দেখতে থাকি যে, পরিকল্পনাকারীগণ এ আংশিক সংস্কার ও গঠনমূলক কাজের কি উপায় নির্ধারণ করেন এবং কার্য সম্পাদনকারীগণ তা কার্যে পরিণত করে কি সুফল প্রদান করেন। (তর্জুমানুল কুরআন, জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪)

এ ছিল মুসলিম লীগের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে মাওলানার মতানৈক্য। তাঁর এ অভিমত সম্পর্কে দ্বিমত হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের ইতিহাস লেখক বোধ হয় এ সত্যকে উপেক্ষা করতে পারবেন না যে, ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার পথে যে সব প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে, স্বাধীনতা লাভের পর তিন যুগ

www.pathagar.org

অতীত হওয়ার পরও পাকিস্তান সে বাস্তব ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত না হয়ে শুধু কাগজে-কলমেই রয়ে গেছে। উপরন্তু একে সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টাচরিত্র যাঁরা করেছেন, তাদেরকে যেভাবে জেল, ফাঁসী ও নানাবিধ অত্যাচার-নির্যাতনে নিষ্পেষিত হতে হয়েছে এবং হচ্ছে- এ সবের ভবিষ্যদ্বাণী বিভাগ পূর্বকালেই মাওলানার প্রবন্ধাদিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

তথাপি একথা ভুললে চলবে না যে, মাওলানা পাকিস্তান আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও লেখনীর মাধ্যমে ইসলামী জীবন বিধানের সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করে পাকিস্তান আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতাই করছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালে কংগ্রেসী হিন্দুদের সুরে সুর মিলিয়ে কিছু জাতীয়তাবাদী মুসলমান এরূপ মন্তব্য করতে লাগলো যে, ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করা কি করে সহ্য করা যায়? তার জবাবে মাওলানা বলেন-

মুসলমান হিসেবে আমার কাছে এ প্রশ্নের কোন গুরুত্ব নেই যে, ভারত অখণ্ড থাকবে, না দশ খণ্ডে বিভক্ত হবে। সমস্ত পৃথিবী এক দেশ। মানুষ তাকে সহস্র খন্ডে বিভক্ত করেছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবী যতো খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে, তা যদি ন্যায়সঙ্গত হয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে আরও কিছু খন্ডে বিভক্ত হলেই বা ক্ষতিটা কি? এ দেব-প্রতিমা খণ্ডবিখণ্ড হলে মনঃকষ্ট হয় তাদের, যারা তাকে দেবতা মনে করে। আমি যদি এখানে একবর্গ মাইলও এমন জায়গা পাই, যেখানে মানুষের উপর খোদা ব্যতীত অন্য কারো প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব থাকবে না, তাহলে এ সামান্য ভূমিখণ্ডকে আমি সমগ্র ভারত থেকে অধিকতর মূল্যবান মনে করবো।' (সিয়াসী কাশমকাশ, ৩য় খণ্ড)

যে সময় পাকিস্তানকে ইসরাইলীদের দাবীর সাথে তুলনা করা হলো তখন তার প্রতিবাদ করে মাওলানা বলেন-

"আমার মতে পাকিস্তান দাবীর সাথে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমির দাবীর কোন তুলনা হতে পারে না। ফিলিস্তিন প্রকৃতপক্ষে ইহুদীদের আবাসভূমি নয়। ইহুদীদের এ অবস্থা নয় যে, জাতীয় আবাসভূমি স্বরূপ তাদের একটা দেশ আছে, যার স্বীকৃতির জন্যে তারা চেষ্টা করছে। বরঞ্চ তাদের সত্যিকার পজিশন হচ্ছে এই যে, একটি দেশে; যা তাদের জাতীয় আবাসভূমি মোটেই নয়, অথচ তাদের দাবী যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে তাদেরকে সেখানে একত্রিত করে বসবাসের সুযোগ দেয়া হোক এবং বলপূর্বক সে দেশকে তাদের জাতীয় আবাসভূমি বানিয়ে দেয়া হোক। পক্ষান্তরে পাকিস্তান দাবীর ভিত্তি এই যে, যে সব অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলো তো তাদের জাতীয় আবাসভূমি। মুসলমানদের বক্তব্য এই যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে এক হয়ে থাকার ফলে তাদের জাতীয় আবাসভূমির রাজনৈতিক সত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে তা থেকে তাদেরকে রক্ষা করা হোক এবং অখণ্ড ভারতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিবর্তে হিন্দু-ভারত ও মুসলিম-ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র হোক। অন্য কথায় মুসলমানদের এ দাবী নয় যে, তাদের জন্য একটি জাতীয় আবাসভূমি সৃষ্টি করা

www.pathagar.org

হোক। বরঞ্চ তাদের বক্তব্য এই যে, তাদের যে জাতীয় আবাসভূমি বর্তমান রয়েছে স্বতন্ত্রভাবে সেখানে এক স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করার অধিকার তাদেরকে দেয়া হোক। (তর্জুমানুল কুরআন, জুলাই, অক্টোবর, ১৯৪৪)

মাওলানার বক্তব্য কতো যুক্তিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট এবং প্রকৃত সত্যও তাই। এমন কথা আর কেউ, এমন কি মুসলিম লীগের পক্ষ থেকেও কেউ বলেছেন কিনা তা আমাদের জানা নেই। উপরন্তু হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি- যে দ্বিজাতিত্বের ভিত্তিতেই (Two Nation Theory) পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা এ মতবাদও মাওলানা মওদূদী অকাট্য যুক্তি-প্রমাণসহ প্রতিষ্ঠিত করেন। মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর একজাতীয়তাবাদের মতবাদ একমাত্র মাওলানা মওদূদীই খণ্ডন করেন। একথা কেউ কি অস্বীকার করতে পারবেন? মাওলানার "মাসয়ালায়ে কাওমিয়াত" (ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ) গ্রন্থখানি পাকিস্তান আন্দোলনের জন্যে এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যার লক্ষাধিক সংখ্যা মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ছাপিয়ে সারাদেশে বিতরণ করা হয়। কেউ কি তা অস্বীকার করতে পারেন?

ইউ, পি, প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি সম্বলিত একটি খসড়া তৈরী করার জন্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছাতারীর নওয়াব মুহাম্মদ ইসমাঈল খান, মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, মাওলানা সাইয়েদ আযাদ সুবহানী, নওয়াব শামসুল হাসান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কমিটির সভাপতি ছিলেন ছাতারীর নওয়াব, যাঁর আমন্ত্রণক্রমে মাওলানা মওদূদী ১৯৪১ সালের জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে উক্ত কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন, যা লাখনোর দারুন্নাদওয়াতে অনুষ্ঠিত হয়।

উপরের আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, মাওলানা মওদূদী শুধু যে পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন তাই নয়। বরঞ্চ এ আন্দোলনকে সার্বিক সাহায্য করেছেন, এর গতিবেগ বর্ধিত করেছেন, আন্দোলন বিরোধী উক্তি ও সমালোচনার অকাট্য যুক্তিপূর্ণ জবাব দিয়েছেন। তবে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেননি, করতে পারেন নি। বিভিন্ন চরিত্র ও মতাদর্শের এমন কি ইসলামের বিপরীত মতাদর্শের লোকের ভিড় জমিয়ে যে দল গঠিত হয়, তার দ্বারা সেক্যুলার বা ধর্মহীন রাষ্ট্র গঠন চলতে পারে, ইসলামী রাষ্ট্র গঠন কিছুতেই সম্ভব নয়। এ তত্ত্বজ্ঞান মাওলানার ছিল। এর প্রকৃত প্রমাণ এই যে, এ বিষয়ে তিনি ভারত বিভাগের বহু পূর্বে যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তা পাকিস্তান সৃষ্টির পর প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে দেখা গেছে। জামায়াতে ইসলামী ও মাওলানা মওদূদীর নাম শুনলে যাঁদের নাশিকা কুঞ্চিত হয়, আমার মনে হয় তাঁরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেননি, অথবা পাকিস্তানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার চিন্তায় তাঁদের সুখনিদ্রা ভঙ্গ হয় এবং মনে ভীতির সঞ্চার হয়।

www.pathagar.org

দ্বাদশ অধ্যায়

জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

একটি অধঃপতিত মুসলিম উম্মাহ-যাকে কুরআনের ভাষায় উৎকৃষ্ট ও কল্যাণধর্মী উম্মাহ বলা হয়েছে-তার প্রকৃত রূপে রূপান্তরিত করার জন্যে মাওলানা যে ক্রমিক প্রচেষ্টা চালান তা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারলে একটি ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিম লীগের আন্দোলনে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে এবং অনেকের ভুল ধারণা অপনোদনের জন্যে আমরা সে ধারাবাহিক আলোচনার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজনীয় মনে করছি।

ইসলামী আন্দোলনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা

"আমার লক্ষ্য ইসলামী আন্দোলনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। আমাকে ক্রমান্বয়ে আমার উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হতে হয়েছে। অতএব তর্জুমানুল কুরআনের প্রথম চার বছর (১৯৩২-৩৬) এ চেষ্টায় অতিবাহিত হয় যে, মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে গোমরাহীর যে চিত্র ফুটে উঠেছিল তা চিহ্নিত করে দিতে হয় এবং ইসলাম থেকে দৈনন্দিন যে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছিল তা রুখতে হয়।

"এ চেষ্টা অব্যাহত ছিল। এমন সময় হঠাৎ ১৯৩৭ সালে এ আশঙ্কা দেখা দিল যে, ভারতের মুসলমান ঐ ভৌগোলিক জাতীয়তার আন্দোলনের শিকার হয়ে না পড়ে, যা প্রবল ঝঞ্ঝার ন্যায় গোটা দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। .... অতএব এ আশঙ্কা নির্মূল করার জন্যে আমি 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে ১৯৩৭ সালের শেষে এবং ১৯৩৮ সালের শেষে লেখি-যা ১৯৩৯ সালের প্রারম্ভে প্রকাশ লাভ করে। এ সব নিবন্ধে আমার লক্ষ্য ছিল এই যে, মুসলমান যেন অন্তত পক্ষে তাদের মুসলমানিত্বের নিম্নস্তরে নেমে না যায় এবং নিজের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা হারিয়ে না ফেলে। এ জন্যে আমি তাদের মধ্যে ইসলামী জাতীয়তার অনুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করি। তাদেরকে সেই গণতান্ত্রিক ধর্মহীন শাসন ব্যবস্থার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিই যা একজাতীয়তার ধারণার ভিত্তিতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছিল। সেই সাথে ঐসব "আইনানুগ রক্ষাকবচ এবং মৌলিক অধিকার" -এর তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করি যার উপর আস্থা পোষণ করে মুসলমানগণ ঐ ভয়াবহ গণতান্ত্রিক সংবিধানের জালে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করছিল। এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তিই এখানে ইসলামকে সমুন্নত দেখতে চায়, সে অবশ্যই এ ধারণা পোষণ করবে যে, তার নিকটে পূর্ব থেকেই যে পুঁজি মওজুদ আছে তা যেন নষ্ট

www.pathagar.org

হয়ে না যায়। তারপর সে অতিরিক্ত পুঁজি লাভ করার চেষ্টা করবে। যারা প্রথম থেকে ক্বালেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'-তে বিশ্বাসী এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে, তাদের সম্পর্কেই আমাদের প্রথমে চিন্তা করা দরকার। তারা যেন বিনষ্ট হয়ে না যায়। এ জন্যে আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করি যাতে মুসলমানদেরকে অমুসলিম জাতীয়তার মধ্যে একাকার হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা যায় এবং তাদের মধ্যে এ অনুভূতির সৃষ্টি করা যায় যে, তারা একটি স্থায়ী জাতীয়তার ধারক-বাহক। তাদের জন্যে এ কিছুতেই সম্ভব নয় যে, তারা অন্য জাতির মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।"

যখন ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত মুসলিম জাতি মুসলিম লীগ সংগঠনে এবং কায়েদে আযমের নেতৃত্বে একত্র হয়ে গেল, তখন মাওলানা লিখলেন-

"এ কাজ যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, তা আল্লাহর ফযলে বিগত দু'তিন বছরে হাসিল হয়েছে। এখন আর এ আশঙ্কা নেই যে, ভারতের মুসলমান কোন ভৌগোলিক জাতীয়তার মধ্যে নিজেদেরকে বিলীন করে দেবে অথবা নিজেদেরকে এমন কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলবে যা একজাতীয়তার ধারণার ভিত্তিতে গঠন করা হয়েছে।" (উক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৬, ৭)

তিনি আরও বলেন-

"আমি এখন দেখছি যে, মুসলিম জাতি খোদার ফযলে হিন্দু জাতির মধ্যে একাকার হয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে গেছে। তাদের মধ্যে আপন জাতীয়তার অনুভূতি এতোটা মজবুত হয়েছে যে, কোন নেহরু এবং গান্ধীর সাধ্য নেই যে, তাদেরকে হিন্দু এবং ভারতীয় জাতীয়তার মধ্যে একীভূত করে ফেলবে।

"এ যা কিছু হয়েছে তা কোন মানবীয় চেষ্টার ফলে হয়নি, বরঞ্চ নিছক আল্লাহর মেরেবানীতে হয়েছে। তাঁর অনুগ্রহে এমন বিভিন্ন কার্যকারণ সৃষ্টি হয়েছে যার দ্বারা মুসলমান এ ভয়াবহ পরিণাম থেকে বাঁচার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। এ ব্যাপারে যে সব লোকের কমবেশী খেদমত করার তৌফিক তিনি দান করেন, তার জন্যে তাদের গর্ব করার কিছু নেই, বরঞ্চ তাঁর শুকরিয়া আদায় করা উচিত।" (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭)

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

এ স্তর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমার মনে এ প্রশ্ন জাগে যে, মুসলমানদেরকে কি এ পরিণতির উপর নিশ্চিত থাকতে দেওয়া উচিত, না তাদের মধ্যে অধিকতর উদ্যোগ সৃষ্টি করে ইসলামের মূল লক্ষ্যের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। ....

"এ প্রশ্ন মনের মধ্যে উদয় হওয়ার সাথে সাথেই মন বলে ফেলে যে, প্রথম কথাটি ভুল এবং দ্বিতীয়টিই সঠিক। অথবা যদি দ্বিতীয় কোন কারণ সৃষ্টি না হতো, তথাপি

www.pathagar.org

আমাকে সে কাজ করতে হতো যা আমি করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সেই সাথে এমন দুটি কারণ সৃষ্টি হলো, যা আমাকে বাধ্য করে এবং আমি সঙ্গে সঙ্গেই ঐসব প্রবন্ধ লেখা শুরু করি যা 'সিয়াসী কাশমকাশ' তৃতীয় খণ্ড নামে প্রকাশিত হয়।

মুসলিম জাতীয়তার আন্দোলন

"প্রথম কারণ এই ছিল যে, এ নবতর মুসলিম জাতীয়তার আন্দোলনে মুসলিম জনসাধারণের নেতৃত্ব এমন একদল লোকের হাতে চলে যায় যাঁরা ছিলেন দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং নিছক জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় আপন জাতির পার্থিক স্বার্থের জন্যে কাজ করছিলেন। দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এমন লোকের পরিমাণ এতো নগণ্য যেমন আটার মধ্যে লবণ হয়ে থাকে। নেতৃত্ব দানে তাঁদের কোনই অধিকার নেই....। ভারতে ইতিপূর্বে জনসাধারণের আস্থা আলেম সমাজের উপর থেকে ওঠে গিয়ে কখনো অদ্বীনদার এবং দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ লোকের উপর স্থাপিত হয়নি। আমার নিকটে এ অবস্থা ভৌগোলিক জাতীয়তার আন্দোলন থেকে কম আশঙ্কাজনক নয়।" (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮)

"দ্বিতীয় কারণ এই ছিল যে, আমি এ আন্দোলনে দ্বীনী প্রবণতা অপেক্ষা জাতীয় প্রবণতা অধিকতর সক্রিয় দেখতে পেয়েছি.... এমনকি একজন খ্যাতনামা নেতাকে এ বিষয়ে অভিযোগ করতে শুনেছি যে, বোম্বাই এবং কোলকাতার ধনবান ব্যক্তিগণ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বারাঙ্গনার নিকটে যায়। অথচ মুসলমান বারাঙ্গনা তাদের পৃষ্ঠপোষকতার অধিক হকদার। এ চরম সীমায় পৌঁছে যাওয়ার পর এ মুসলিম জাতীয়তাবাদ বা জাতিপূজার প্রতি উদারতা প্রদর্শন আমার নিকটে বিরাট গোনাহর কাজ। .... আমরা কি খোদার প্রতি ঈমান রাখে এমন বান্দাহদেরকে খোদার পরিবর্তে অন্য কারো প্রতি আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ দেখতে থাকবো এবং কিছু বলবো না? (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৭৮)

"এ ছিল দুটি কারণ যা আমাকে এ প্রবন্ধগুলো (মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ ৩য় খণ্ড) লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। আমি এ প্রবন্ধগুলোতে মুসলমানদের বিভিন্ন দল এবং কোথাও কোথাও তাদের নেতাদের সুস্পষ্ট সমালোচনা করেছি। কিন্তু খোদা সাক্ষী, কোন ব্যক্তি বা দলের প্রতি আমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই, আমি শুধু হকের বন্ধু এবং বাতিলের দুশমন। যাকে আমি সত্য মনে করেছি তা সত্য হওয়ার প্রমাণও পেশ করেছি এবং যাকে বাতিল বলে মনে করেছি তার বাতিল হওয়ার যুক্তি-প্রমাণও বয়ান করেছি।" (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৯)

ইসলাম আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মানুষকে যে প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করা হয়েছে, তাও সেই প্রকৃতিরই একটা দিক যা সমগ্র সৃষ্টি জগতকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। অতএব মানব-প্রকৃতির আইন-

www.pathagar.org

কানুনও সৃষ্টিজগতের আইন-কানুনের মতোই শাশ্বত, বিশ্বজনীন এবং নিরপেক্ষ ও সমদর্শী। মানব-প্রকৃতির এ শাশ্বত, বিশ্বজনীন ও নিরপেক্ষ আইনের অপর নামই হচ্ছে ইসলাম। এ কোন জাতীয়তাবাদীর চিন্তাধারণা নয় যে, সমগ্র দুনিয়াকে আপন জাতির স্বার্থ ও সুবিধার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে। এ কোন শ্রেণীভিত্তিক নেতার চিন্তাধারারও নয়, যে সকল ব্যাপারে একটি শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে সবকিছু দেখে। ..... এ কোন মানুষের চিন্তা-গবেষণারও ফল নয়, এতো রাব্বুল আলামীনের হেদায়েত থেকে গৃহীত। ... যাঁর দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখেন, না ভারতীয়, জার্মান ও ইতালীয় হিসাবে। আর না শ্রমিক, কৃষক, অথবা পুঁজিপতি হিসেবে। ব্যক্তিবর্গ ও জাতিসমূহের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ নেই। আছে নিছক মানুষের প্রতি। .... (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১১, ১২)

"কিন্তু যখন আমরা বলি যে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বপ্রথম আমাদের দেশকে এবং অবশেষে সমগ্র দুনিয়াকে 'দারুল ইসলামে' পরিণত করা, তখন যে জানে না তার মধ্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। ..... সে মুসলমান জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে বলে "মুসলমানের শাসন বা রাষ্ট্র" তার লক্ষ্য হয়ে পড়েছে।" (ঐ, পৃঃ ১২)

"এ ভুল ধারণা এ জন্যে সৃষ্টি হয়েছে যে, 'দারুল ইসলামকে' 'দারুল মুসলেমীনের' অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। .... অথচ যা আমাদের লক্ষ্য তা মুসলমানদের শাসন বা রাষ্ট্র নয়। বরঞ্চ ইসলামী শাসন বা রাষ্ট্র। এ ইসলাম আমাদের অথবা অন্য কারো বাপ-দাদার উত্তরাধিকার নয়। এর সাথে কারো কোন বিশেষ সম্পর্ক নেই। যে এর মূলনীতির উপর ঈমান আনবে এবং তদনুযায়ী আমল করবে, সেই হবে ইসলামের পতাকাবাহী। সে যদি বংশের দিক দিয়ে চামার অথবা মেথরও হয়, তাহলে সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেলাফতের পদে সমাসীন হতে পারবে। সে যদি নাককাটা হাবশী গোলামও হয় তাহলেও সে আরব ও আজমের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নেতা হতে পারবে। (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২-১৪)

মাওলানা একজন নওমুসলিম

এ পর্যায়ে মাওলানা তাঁর মন থেকে যে যবনিকা উত্তোলন করেন এবং যে অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "যদি ইসলাম নিছক ঐ ধর্মেরই নাম হতো যা এখন মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায়, তাহলে সম্ভবত আমি নাস্তিক ও বিধর্মী হয়ে যেতাম। কিন্তু যা আমাকে নাস্তিকতার পথে পা বাড়তে অথবা অন্য কোন সামাজিক পথ ও পন্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত রেখেছে, তা কুরআন পাক ও সীরাতে মুহাম্মদীর অধ্যয়ন। এ আমাকে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা ও মূল্য সম্পর্কে সজাগ করে দিয়েছে। এ স্বাধীনতার এমন এক ধারণার সাথে আমাকে পরিচিতি করে দিয়েছে যার উচ্চতা পর্যন্ত দুনিয়ার যতো বড়ো উদার ও বিপ্লবী ধারণা-মতবাদ হোক না কেন, তা পৌঁছতে পারেনি। (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৭-১৮)

www.pathagar.org

"অতএব প্রকৃতপক্ষে আমি একজন নওমুসলিম। অত্যন্ত যাচাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমি এ মতবাদের উপর ঈমান এনেছি, যার সম্পর্কে আমার মনমস্তিষ্ক সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষের জন্যে সাফল্য ও উন্নতির এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।

"আমি শুধু অমুসলিমদেরকেই নয়ম বরঞ্চ মুসলমানদেরকেও ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছি... আসুন, ঐ অত্যাচার-নিপীড়ন খতম করে দিই, যা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। মানুষের উপর থেকে মানুষের খোদায়ী মিটিয়ে দিই এবং কুরআনের নক্শার উপরে এক নতুন দুনিয়া তৈরী করি, যার মধ্যে মানুষের জন্যে মানুষ হিসেবে সম্মান ও শ্রদ্ধা, স্বাধীনতা ও সাম্য, ইনসাফ, দয়া-মমতা পাওয়া যাবে।" (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৮)

মাওলানা আরও বলেন,

"দুনিয়ায় যখন কোন আন্দোলন কোন নৈতিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শুরু হয়, তখন তার দিকে তারাই অগ্রসর হয়, যাদের মনমস্তিষ্কে সে আন্দোলনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও মূলনীতি আবেদন সৃষ্টি করে। যাদের স্বভাব-প্রকৃতি তার মেযাজ-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রাখে। যাদের মন সাক্ষ্য দেয় যে, এ আন্দোলনই সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত এবং যারা মনের পূর্ণ আগ্রহ সহকারে তা পরিচালনা করতে এবং দুনিয়ায় তা প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রসর হয়। তার বৃত্তের মধ্যে যারা আসে তাদেরকে আনা হয় না, বরঞ্চ স্বয়ং আসে। তারা তাকে যাচাই করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, বুঝেসুঝে, পূর্ণ অনুভূতি এবং পরিপূর্ণ সংকল্প সহকারে আসে। তারপর যখন আসে, তখন তার উদ্দেশ্যকে আপন উদ্দেশ্য মনে করে কাজ করে। তার জন্যে এ আন্দোলন পরিচালনা করা তার জীবনের মিশনে পরিণত হয়।" (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩)

"এটাই কারণ যে, যারা কোন আন্দোলনের সত্যতার স্বীকৃতি দিয়ে তা গ্রহণ করে, তাদের জীবনের কায়া পরিবর্তন হয়ে যায়। তারা পূর্ব থেকে একেবারে অন্যরূপ হয়ে যায়। তারা তার নীতির খাতিরে বন্ধুত্ব এবং রক্তের সম্পর্ক পর্যন্ত পরিত্যাগ করে। তারা নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য, নিজেদের পজিশন, লাভ ও সুযোগ-সুবিধা এবং প্রতিটি বিষয়ে ক্ষতি স্বীকার করে। এমনকি তারা জীবনের দুঃখকষ্ট ও মৃত্যুর আশঙ্কা সহ্য করতে তৈরী হয়ে যায়। এ বিপ্লব এতোটা সর্বব্যাপী হয় যে, তাদের অভ্যাস বদলে যায়, তাদের আচার-আচরণে পরিবর্তন সূচিত হয়। এমনকি তাদের চেহারা-সুরত, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যখানা এবং সাধারণ জীবন যাপন প্রণালীর উপরে সে আন্দোলনের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আশপাশের লোকের মধ্যে তাকে তা প্রতিটি আচরণে পৃথকভাবে চিনতে পারা যায়। প্রত্যেকে তাকে দেখে বলে দেয়, "ঐ যে যাচ্ছে অমুক আন্দোলনের সমর্থক বা কর্মী।" (তর্জুমানুল কুরআন, নভেম্বর, ১৯৩৯)

www.pathagar.org

আন্দোলনের দ্বিতীয় যুগ

তারপর এক দ্বিতীয় যুগ শুরু হয়। যারা এ আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট হয়, তাদের এ স্বাভাবিক বাসনা হয় যে, তাদের সন্তানগণও ঐ মতবাদেই গড়ে উঠুক যাকে তারা স্বয়ং সত্য মনে করে গ্রহণ করেছে। এ উদ্দেশ্যে তারা নতুন বংশধরদের উপর শিক্ষাদীক্ষার, পারিবারিক জীবন এবং বাইরের পরিবেশ থেকে এমন ধরনের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে যাতে তাদের চিন্তাধারা-স্বভাব, চরিত্র, অভ্যাস ও আচার-আচরণ-সব কিছুই ঐ মতবাদ, পথ ও পন্থার প্রাণশক্তি ও তার মূলনীতি অনুযায়ী গড়ে ওঠে। এ ব্যাপারে তাদের খানিকটা সাফল্যও অর্জিত হয়। কিন্তু একটা পরিমাণ পর্যন্ত হয়। (ঐ, পৃঃ ২৫)

আন্দোলনকে তার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে দুটি পন্থা অবলম্বন করা হয়। এক এই যে, যারা (সকল চেষ্টা সত্ত্বেও) অকর্মণ্য বিবেচিত হবে, তাদেরকে জামায়াত থেকে বহিষ্কার করা হয়।

দ্বিতীয় এই যে, প্রচারের মাধ্যমে জামায়াতের মধ্যে ঐসব নতুন নতুন লোক ভর্তি করা হতে থাকবে যারা আগ্রহ ও মন-মানসিকতার দিক দিয়ে এ আন্দোলনের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং যাদের মধ্যে এ আন্দোলনের নীতি ও উদ্দেশ্য ঠিক সে ভাবেই আবেদন সৃষ্টি করতে পারে যেমন প্রাথমিক অনুসারীদের মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করেছিল। (ঐ, পৃঃ ২৬)

আন্দোলনের পতনযুগ

অতঃপর যখন জামায়াতের মধ্যে তার নীতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষাকারী লোকের সংখ্যা কম এবং সামঞ্জস্য রক্ষাকারী নয় এমন লোকের সংখ্যা অধিক হয়ে যায়, তখন.... প্রত্যেক নবাগত বংশধর পূর্ববর্তী বংশধর থেকে নিকৃষ্ট হতে থাকে ..... শেষ পর্যন্ত এক সময় এমন আসে, যখন জামায়াত খতম হয়ে যায়..... নিছক এক বংশগত ও সামাজিক জাতীয়তা তার স্থান গ্রহণ করে। অতঃপর যে নাম প্রাথমিক পর্যায়ে একটি আন্দোলনের পতাকাবাহীদের জন্যে ব্যবহার করা হতো, তাকে ঐসব লোক ব্যবহার করে, যারা এ আন্দোলনকে নস্যাৎ করে এবং তার পতাকাকে অবনমিত ও পরাভূত করে। (ঐ, পৃঃ ২৭)

ইসলামের বর্তমান অবস্থা

"ইসলাম বর্তমানে ঐ শেষ স্তরে পৌঁছে গেছে। আন্দোলন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তার উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়েছে। নীতিসমূহ এক একটি করে লঙ্ঘন করা হয়েছে। তার নাম এখন নিছক একটি বংশগত ও সামাজিক জাতীয়তা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাকে এমন অবস্থাতে ও নির্বিঘ্নে ব্যবহার করা হচ্ছে যেখানে

www.pathagar.org

ইসলামের উদ্দেশ্য নস্যাৎ করা হয় এবং যেখানে ইসলামের স্থলে গায়ের ইসলাম হয়- (ঐ, পৃঃ ২৮)। এ অবস্থাতে অবাক হবেন না যদি একটি নৈতিক ও সামাজিক মতবাদ হিসেবে ইসলামের অনুশাসনের দাবী শুনে দুনিয়া বিদ্রূপ করা শুরু করে। কারণ, ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারীগণ স্বয়ং তার মর্যাদাকে ও তার দাবীকে নিজের পেটপূজার বেদীতে উৎসর্গ করেছে। (ঐ, পৃঃ ৩৩)

অতঃপর মাওলানা খাকসার আন্দোলন ও মুসলিম লীগ সংগঠনের সমালোচনা করে বলেন যে, ইসলামী হুকুমত কায়েম করার জন্যে মুসলমানগণ অধীর। তার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পথনির্দেশনার জন্যে তাদের কাছে কোন ধরনের লোক আছে এবং এ অবস্থায় কি তাদের প্রয়োজন?

মাওলানা বলেন-

"কাজ ব্যক্তিগত হোক বা সামষ্টিক, তার যে কোন অবস্থায় দুটি শর্ত অনিবার্য। প্রথম শর্ত আত্মপরিচয় ও আত্ম-উপলব্ধি এবং দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি। একটি সঙ্গতিসম্পন্ন জামায়াত আমাদের মধ্যে এমন আছে যাদের আত্ম-অনুভূতিই নেই। দ্বিতীয় আর একটি সংগতিসম্পন্ন দল এমন যার আত্ম-অনুভূতি তো আছে, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তি নেই। নিজেদের পজিশনকে তারা ভালো বাসেন। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, মুসলমান হওয়া কোন খেলা-তামাশার বস্তু নয়। সেই সাথে দায়িত্বের এক বিরাট বোঝা রয়েছে। কিছু বাধা-নিষেধও আছে। ত্যাগ ও কুরবানী আছে। জিহাদ ও কঠোর পরিশ্রম আছে। এ এমন এক মিশন যার জন্যে গোটা দুনিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয় এবং এ সংগ্রামে খোদার সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু চাওয়া না-জায়েয।" (ঐ, পৃঃ ৪১)

উপরে যে দু'ধরনের দল বা লোকের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করে মাওলানা বলেন, মুসলমানদের দল এ দু'ধরনের লোক নিয়েই গঠিত। এ জন্যে সাধারণত যে সামাজিক আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে বিস্তার লাভ করছে তা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ভ্রান্ত, তাদের উদ্দেশ্য ভ্রান্তিপূর্ণ। তাদের কর্মপন্থাও ত্রুটিপূর্ণ। তাদের নেতৃত্বও ভ্রান্তিপূর্ণ এবং তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা ত্রুটিপূর্ণ।" (ঐ, পৃঃ ৪২)

ইসলাম ও তার দাবী

মাওলানা বলেন- ইসলামের প্রতি যদি সত্যিই আপনার মহব্বত থাকে এবং প্রকৃতপক্ষে আপনি মুসলমানই থাকতে চান, তাহলে আপনার জেনে রাখা উচিত যে, ইসলাম ইহুদীবাদ এবং হিন্দু ধর্মের মতো কোন বংশগত ধর্ম নয়, যা বংশানুক্রমিক জাতীয়তার জন্ম দেয়। বরঞ্চ ইসলাম হচ্ছে গোটা মানব জাতির জন্যে

www.pathagar.org

একটা নৈতিক ও সামাজিক বিধিবিধান। একটি বিশ্বজনীন মতবাদ। একটি বিশ্বজনীন ধারণা। সে এমন এক জামায়াত গঠন করতে চায়, যে এ বিধিবিধান, এ মতবাদ ও এ ধারণা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। দুনিয়ার সামনে তার বাস্তব চিত্র পেশ করবে। তারপর যে যে জাতির লোক তা গ্রহণ করতে থাকবে, তাদেরকে উক্ত জামায়াতে শামিল করতে থাকবে। অবশেষে জাতিগুলোর মধ্যকার পার্থক্য সৃষ্টিকারী প্রাচীরগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তার নিকটে "ইসলামী" শুধু সেই বস্তু, যা তার বিধিবিধান, মতবাদ ও ধারণার অনুরূপ হয় এবং যা তার বিপরীত তাকে গ্রহণ করতে সে অস্বীকার করে। (ঐ, পৃঃ ৪৮)

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন মতবাদ ও জীবন বিধান হওয়ার কারণে তার দাবী হলো ঃ

এক- সে বিভিন্ন দলের মধ্যে একটি দল হয়ে থাকতে প্রস্তুত নয়। বরঞ্চ তার স্বভাব-প্রকৃতির দাবীই এই যে, সেই একমাত্র দল.... অবনমিত হওয়া এবং আপোস করা (Compromise) তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে দরকষাকষি করে না। বিজয়ী হতে চায়।

لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

দুই- সে ব্যক্তি বা শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যার প্রতি লক্ষ্য করে না। বরঞ্চ সার্বিক ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করে। সে মানুষ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং ঐ সব সমস্যার সমাধান করতে চায় যা সামগ্রিক ভাবে মানুষের জন্যে সমাধানযোগ্য।

তিন- তার সামনে সাময়িক অথবা আঞ্চলিক কোন উদ্দেশ্য নেই। বরঞ্চ শাশ্বত ও বিশ্বব্যাপী উদ্দেশ্য রয়েছে। তাহলো এই যে, দুনিয়ার যে জীবন ব্যবস্থা তার নীতির পরিপন্থী তাকে নির্মূল করতে চায় এবং নিজস্ব নীতি অনুযায়ী স্থায়ীভাবে একটি ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়।

চার- সে এমন কোন সংকীর্ণ জাতীয়তার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না যা বংশীয় ও ঐতিহাসিক পরম্পরাগত প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত।

পাঁচ- সে বংশ পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত বিশেষ কোন জাতির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও রসম-রেওয়াজের মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখতে চায় না। বরঞ্চ প্রতি যুগে বিশ্ব মানব তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান ও গবেষণায় যে সত্য (ধারণা-মতবাদ নয়) উপলব্ধি করতে পেরেছে অথবা চেষ্টাসাধনা ও কর্মকাণ্ডের দ্বারা যে সত্যনিষ্ঠ সুফল সৃষ্টি করেছে সেসবকে সে তার, প্রস্তাবিত সামগ্রিক অবস্থার মধ্যে স্বীয় নীতি অনুযায়ী এমন ভাবে অভিনিবিষ্ট করে ফেলে যে, সেগুলো ঐ ব্যবস্থার স্বাভাবিক অংশে পরিণত হয়।

www.pathagar.org

ছয়- তার সাফল্যের জন্যে শুধু একথা প্রমাণ করাই যথেষ্ট নয় যে, সে স্বয়ং সত্য এবং তার মধ্যে মানুষের কল্যাণ রয়েছে। বরঞ্চ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে একথার দাবী করে যে, তার মূলনীতিগুলোকে একটা বিপ্লবী আন্দোলনের ভিত্তি বানাতে হবে। তার উপর যারা ঈমান রাখে, তাদেরকে এ আন্দোলনের মাধ্যমে একটা মুজাহিদ দল হিসেবে দাঁড়াতে হবে এবং অবশেষে একটি রাষ্ট্রের জন্যে মৌলিক আইন হয়ে পড়বে। (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৯-৫০)

একটি ইসলামী জামায়াতের দাবীসমূহ

মাওলানা ভারতের সকল মুসলমানদের সম্বোধন করে বলেন ঃ "যদি আপনারা ইসলামী জামায়াতবদ্ধ হয়ে কাজ করতে চান, তাহলে আপনাদেরকে ঐ জাতীয় পলিসি পুনর্বিবেচনা করতে হবে যা আপনারা লালন করে চলেছেন। তাকে একেবারে পরিহার করে ইসলামের দাবী অনুযায়ী পলিসি বানাতে হবে। আপনাদের মন থেকে জাতীয় স্বার্থের ধারণা বের করে দিতে হবে এবং তদস্থলে ইসলামী নীতি ও তার লক্ষ্যকে গ্রহণ করতে হবে।

আপনাদের দৃষ্টি এ উদ্দেশ্যের প্রতি নিবদ্ধ করতে হবে যে, ইসলামী নীতিই দুনিয়াকে শাসন করবে। এ উদ্দেশ্যে আপনাদেরকে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে হবে।

ঐসব অকর্মণ্য লোকদেরকে আপনাদের থেকে পৃথক করে দিতে হবে, যারা আপনাদের নীতি মেনে চলে না। তারপর সকল জাতির মধ্য থেকে বেছে ঐসব নেক লোকদেরকে আপনাদের মধ্যে শামিল করতে হবে, যারা আপনাদের নীতি মেনে চলতে প্রস্তুত। আপনাদেরকে সুবিধাবাদীর মনোভাব পরিহার করতে হবে। আপনাদেরকে একটি মুজাহিদ দলে পরিণত হতে হবে যে আপন নীতির জন্যে সংগ্রামরত হবে। যার উদ্দেশ্য স্বীয় জাতীয় রাষ্ট্র (National state) কায়েম করা হবে না, বরঞ্চ আদর্শিক রাষ্ট্র (Ideological State) কায়েম করা হবে। (ঐ, পৃঃ ৫১)

"এ অবস্থায় আপনারা একটি বিশ্বশক্তিতে (world Power) পরিণত হবেন। আপনারা দুনিয়াকে নিজেদের জন্যে নয়, সত্যের মূলনীতির জন্যে জয় করার চেষ্টা করবেন। আর যদি সত্য সত্যই আপনাদের প্রাকৃতিক নীতি মানুষের মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে এবং মানুষের সমস্যা সমাধান করতে পারে, যা প্রকৃতপক্ষে তা পারে, তাহলে দুনিয়া স্বয়ং পরাভূত হওয়ার জন্যে নিজেকে আপনাদের সামনে পেশ করবে.... ইসলামের নীতির মধ্যে বিশ্বব্যাপী শান্তি নিহিত আছে। দুনিয়া স্বয়ং তার দিকে আকৃষ্ট হবে। শর্ত এই যে, আপনারা নিজেদের জন্যে নয়, বরঞ্চ নিজেদের নীতির জন্যে বেঁচে থাকবেন ও মৃত্যুবরণ করবেন।"

www.pathagar.org

যারা কাজ করতে চায় তাদের জন্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতা

এখন যারা ইসলামকে জানে ও বুঝে যা নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল এবং যাদের মন এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত যে, মানবতার কল্যাণ ও সৌভাগ্য তার অনুশাসনেই হতে পারে এবং শুধুমাত্র ইসলামী নীতির উপরেই মানবীয় তামাদ্দুন ও সমাজের এক সুবিচারপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে, তাদের কিন্তু ভ্রান্ত ধারণা থেকে মন পরিষ্কার করে নেয়া উচিত। (ঐ, পৃঃ ৫৭)

"প্রথম কথা এই যে, মুসলমানদের স্বার্থের সাথে ইসলামকে একত্রে বাঁধা ভুল হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ প্রশ্নের কোনই গুরুত্ব নেই।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের সাফল্য না ঐ সব মুসলমানের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল, যা আদমশুমারীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, আর না তাদের সাফল্যের পথে হিন্দু এবং অন্যান্য অমুসলিমের সংখ্যাধিক্য কোন বিরাট প্রতিবন্ধকতা।

তৃতীয়ত, কোন আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর এ বিষয়ের উপর করে না যে, তাদের সত্যিকার অনুসারী ও ভক্তদের সংখ্যা শতকরা ৬০ অথবা ৭০ হতে হবে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং বর্তমান দুনিয়ার অভিজ্ঞতা আমাদেরকে একথা বলে যে, একটি মজবুত এবং সুশৃঙ্খল দল যার সদস্যগণ আপন আন্দোলনের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে, তার পথে জানমাল কুরবান করতে প্রস্তুত থাকে এবং দলীয় শৃঙ্খলা পুরোপুরি মেনে চলে, সে দল শুধুমাত্র তার বিশ্বাস ও শৃঙ্খলার শক্তিতে ক্ষমাতাসীন হতে পারে..... অতএব ইসলামকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে হলে প্রকৃত মুসলমানদের বিরাট সংখ্যার প্রয়োজন করে না, অল্পসংখ্যকই যথেষ্ট হয়। তবে শর্ত এই যে, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে তাদেরকে মুসলমান হতে হবে এবং খোদার পথে জানমাল দিয়ে জিহাদ করতে তৈরী হতে হবে।"

মাওলানা মুসলমানদের বিভিন্ন দল ও তাদের নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করার ফলে সে সব দলের অনুসারীদের অসন্তুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। তাদেরকে সম্বোধন করে মাওলানা বলেন- তাঁদের শান্ত মনে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত করা উচিত যে, তাঁরা ইসলামের জন্যে ইসলামের নীতি অনুযায়ী কাজ করতে চান, না নিজেদের জন্যে নিজেদের নীতি অনুযায়ী। যদি প্রথমটি হয়, তাহলে সোজাসুজি এমন প্রতিটি জিনিস পরিহার করতে হবে, যা গায়ের ইসলামী। (ঐ, পৃঃ ৭০)

মাওলানা দুনিয়ার অবস্থা ও তার অনিষ্ট-অনাচার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন- "দুনিয়ার যেখানেই যে অশান্তি-অনাচার দেখতে পাওয়া যায় তার মূল কারণ একটিই। তাহলো, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো শাসন-কর্তৃত্ব মেনে নেয়া।" (ঐ, পৃঃ ৮৪)

www.pathagar.org

অতঃপর বলেন-

"এক ব্যক্তি অন্যের খোদা হয়ে যাক, অথবা অন্যের খোদায়ী স্বীকার করে নিক, অথবা নিজে নিজের খোদা হয়ে যাক, এ সকল অবস্থাতে ধ্বংস ও ক্ষতির প্রকৃত কারণ পূর্ববৎ রয়ে যায়। ... অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা হবেন একজন এবং হুকুম-শাসন চলবে অন্য কারো"- (ঐ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

"মানব জীবনকে প্রকৃত কল্যাণ ও সৌভাগ্যের অধিকারী করতে হলে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন উপায় নেই যে, গায়রুল্লাহর হুকুম-শাসন একেবারে অস্বীকার করতে হবে এবং একমাত্র তাঁরই শাসন-কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে যিনি প্রকৃত শাসক। প্রতিটি ঐ শাসন ব্যবস্থা নাকচ করে দিতে হবে, যা মানবীয় সার্বভৌমত্বের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধুমাত্র সেই শাসন ব্যবস্থা স্বীকার করে নিতে হবে, যেখানে সার্বভৌমত্ব তাঁরই হবে যিনি প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। প্রতিটি ঐ সরকারের শাসনাধিকার মানতে অস্বীকার করতে হবে, যেখানে মানুষ স্বয়ং শাসক এবং আদেশ-নিষেধ করার দাবীদার। শুধুমাত্র সে সরকারই বৈধ মনে করতে হবে, যেখানে মানুষ প্রকৃত শাসকের অধীনে খলীফা হওয়ার মর্যাদা স্বীকার করবে"।

পাকিস্তান প্রকৃতপক্ষে কিরূপ হওয়া উচিত

মাওলানা অতঃপর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমালোচনার পর বলেন,

"একজন সত্যিকার মুসলমান হিসেবে যখন আমি দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন আনন্দ প্রকাশের কোন কারণ দেখতে পাইনি যে, তুরস্কের উপর তুর্কীগণ, ইরানের উপর ইরানীগণ এবং আফগানিস্তানের উপর আফগানগণ শাসন করছেন। মুসলমান হিসেবে আমি (Govt of the People, for the People by the People) (জনগণের সরকার, জনগণের জন্যে, জনগণের দ্বারা) এ মতবাদে বিশ্বাসী নই, যার জন্যে আমি আনন্দ করতে পারি। এর বিপরীত 'মানুষের উপর আল্লাহর শাসন হোক অথবা সুবিচার সহ

حُكْمُ اللّٰهِ عَلَى النَّاسِ بِالْحَقِّ এ মতবাদে বিশ্বাসী।

মুসলমান হিসেবে এ বিষয়ে আমার কোন আকর্ষণ ও অনুরাগ নেই যে, ভারতের যেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে তাদের সরকার কায়েম হোক। আমার নিকট যে প্রশ্নটি সবচেয়ে অগ্রাধিকারযোগ্য তাহলো এই যে, আপনাদের এ 'পাকিস্তানে' শাসন ব্যবস্থার বুনিয়াদ খোদার সার্বভৌমত্বের উপর রাখা হবে, না পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুযায়ী জনগণের সার্বভৌমত্বের উপর। যদি

www.pathagar.org

প্রথম অবস্থা হয়, তাহলে নিশ্চিতরূপে এ হবে "পাকিস্তান"। নতুবা দ্বিতীয় অবস্থায় এ তেমনই "না-পাকিস্তান" হবে, যেমন দেশের ঐ অংশ হবে যেখানে আপনাদের স্কীম অনুযায়ী অমুসলমানগণ শাসন করবে। বরঞ্চ খোদার দৃষ্টিতে এ (পাকিস্তান) তার চেয়েও অধিক ঘৃণিত ও অভিশপ্ত হবে। কারণ, এখানে নিজেদেরকে মুসলমান বলে ঘোষণাকারীগণ এমন কাজ করবে, যা অমুসলিমগণ করবে। (ঐ, পৃঃ ৯২-৯৩)

অখণ্ড ভারতের পজিশন

মুসলমান হিসেবে আমার দৃষ্টিতে এ প্রশ্নের কোনই গুরুত্ব নেই যে, ভারত একটি দেশ থাকবে, না দশ খণ্ডে বিভক্ত হবে। সমস্ত দুনিয়া একটি দেশ। মানুষ তাকে হাজার হাজার খণ্ডে বিভক্ত করেছে। এ সময় পর্যন্ত যে বিভক্তি হয়েছে তা যদি বৈধ হয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে আরও কিছু খণ্ডে বিভক্ত হলে এমন কি ক্ষতিটা হবে? মুসলমানের তো আলোচ্য বিষয় এই যে, এখানে মানুষ আল্লাহর আদেশের কাছে মাথা নত করে, না মানুষের হুকুমের কাছে.... যদি এখানে মানুষের হুকুমে মাথা নত করে, তাহলে ভারত জাহান্নামে যাক এবং তার ভূমিপূজারীগণ। আমার এতে কি আসে যায় যে, এ একটি দেশ থাকবে না, হাজার খণ্ডে বিভক্ত হবে। এ প্রতিমা ভেঙ্গে গেলে আর্তনাদ করবে তারা, যারা একে মাবুদ মনে করে পূজা করে। আমি যদি এখানে এক বর্গমাইল ভূখণ্ডও এমন লাভ করি, যেখানে মানুষের উপর খোদা ব্যতীত আর কারো শাসন-কর্তৃত্ব থাকবে না। তাহলে আমি সে সামান্য ভূখণ্ডকে সমগ্র ভারত থেকে অধিকতর মূল্যবান মনে করবো। (ঐ, পৃঃ ৯৪)

কুরআন কি বলে

"কুরআনে দেখতে পাই নবীর পরে নবী আসেন এবং তাঁরা একই কথার দিকে আপনার জাতিকে দাওয়াত দেন।

তাহলে يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

হে আমার জাতি! আল্লাহর দাসত্ব-আনুগত্য অবলম্বন কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন শাসক নেই।

"ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেক নেতা প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক যুগে সকল সাময়িক ও আঞ্চলিক সমস্যা উপেক্ষা করে এ একটি সমস্যাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এর উপর সকল শক্তি নিয়োগ করেছেন.... তারা এই একটি সমাধানের উপরই জীবনের সকল সমস্যার সমাধান নিহিত আছে বলে মনে করতেন।" (ঐ, পৃঃ ৯৭)

www.pathagar.org

আমাদের সম্পর্ক

একটি মুসলিম জামায়াত হিসেবে আমাদের সম্পর্ক ঐ আন্দোলনের সাথে যার লীডার আম্বিয়া আলায়হিমুসসালাম ছিলেন। ইসলামের চিন্তাচেতনার ব্যবস্থা এবং তার কর্মপন্থা তাই, যা আমরা পাই আম্বিয়া আলায়হিমুসসালামের সীরাতে। আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাই, যা ছিল নবীগণের এবং ঐ মনযিল পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তাও তাই, যে পথে প্রত্যেক যুগে চলেছেন আল্লাহর নবীগণ। আমাদেরকে জীবনের সকল ব্যাপার ও ক্রিয়াকর্ম সে দৃষ্টিতে দেখতে হবে, যে দৃষ্টিতে তাঁরা দেখেছিলেন। আমাদের সামগ্রিক সামাজিক পলিসি ঠিক ঐ ধারা-প্রণালীর উপরই কায়েম হওয়া উচিত, যার উপরে তাঁরা কায়েম করেছিলেন। এ পথ ও পন্থা পরিত্যাগ করে যদি আমরা অন্য কোন পথ ও মতবাদ এবং কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করি, তাহলে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বো। (ঐ, পৃঃ ৯৮)

আমাদের পদ-মর্যাদা

"আমাদের পদ-মর্যাদা এই যে, আমরা সংগ্রামের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়া থেকে গায়রুল্লাহর শাসন উৎখাত করে দেব এবং খোদার বান্দাহদের উপর খোদা ব্যতীত অন্য কারো শাসন-কর্তৃত্বের চিহ্ন রাখবো না।" (ঐ, পৃঃ ৯৮)

"আমাদের সামনে তো একটি মাত্র উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তাহলো এই যে, আল্লাহর বান্দাহ আল্লাহ ব্যতীত আর কোন শক্তি ও সত্তা দ্বারা শাসিত হবে না। বান্দাদের হুকুম-শাসন খতম হয়ে যাবে এবং সে শাসন ঐ সুবিচারপূর্ণ নীতির উপর কায়েম হবে যা আল্লাহ পাঠিয়েছেন। .... এ উদ্দেশ্য আমরা সকলের সামনে পেশ করবো। যে তা গ্রহণ করবে, সে আমাদের বন্ধু এবং যে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে তার সাথে আমাদের সংগ্রাম চলবে- তার শক্তি যতোই হোক না কেন। (ঐ, পৃঃ ১১০-১১১)

উনচল্লিশ সালে যখন এ সমালোচনামূলক প্রবন্ধের মাধ্যমে মাওলানা মওদূদী হিন্দু জাতীয়তার স্বাধীন ভারতের এবং মুসলিম জাতীয়তার স্বাধীন পাকিস্তানের দাবীর সময়ে ইসলামী লক্ষ্য পেশ করছিলেন, তখন এ লক্ষ্য বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনও ছিল। এ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে যে সব প্রতিবন্ধকতা অনুভূত হচ্ছিল সে সবের প্রতিকার বলে দেয়াটাও জরুরী ছিল। এ বিশ্লেষণও প্রয়োজন ছিল যে, ইসলামী হুকুমত কায়েমের স্বাভাবিক পন্থা কি। মাওলানা মওদূদীর প্রবন্ধাদি থেকে তার যুক্তি-প্রমাণ স্বরূপ কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে দেয়া হলো-

www.pathagar.org

প্রকৃত ইসলামী লক্ষ্য

"প্রকৃত ইসলামী লক্ষ্য কি? এর জবাব কুরআন এভাবে দিয়েছে-

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ.

-তিনিই আল্লাহ যিনি তাঁর রসূল মুহম্মদ (সঃ)কে 'হেদায়েত' ও 'দ্বীনে হক' সহ পাঠিয়েছেন যাতে তিনি সেই দ্বীনকে অন্যান্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন- তা এ কাজ অমুসলিমদের যতোই অপ্রীতিকর হোক না কেন"। (ঐ, পৃঃ ১১৪)

এ আয়াতে 'হুদা' শব্দের অর্থ দুনিয়ায় জীবন যাপন করার সঠিক পন্থা। .... এ কথা আল্লাহ তাঁর রসূলকে শিক্ষা দিয়ে পাঠিয়েছেন। দ্বিতীয় জিনিস যা রসূল (সঃ) নিয়ে এসেছিলেন তাহলো 'দ্বীনে হক, ... আর দ্বীনে হক এই যে, মানুষ অন্যান্য মানুষের স্বয়ং আপন মনের এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের দাসত্ব-আনুগত্য পরিহার করে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হুকুম-শাসন মেনে নেবে এবং তাঁরই দাসত্ব-আনুগত্য করবে। অতএব আল্লাহর রসূল তাঁর প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন, যাতে মানুষের না স্বায়ত্ত শাসনের কোন সুযোগ আছে, আর না মানুষের উপর মানুষের হুকুম-শাসন চালাবার কোন অধিকার আছে। বরঞ্চ শাসনকর্তৃত্ব বা সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। (ঐ, পৃঃ ১১৪-১১৫)

"অতঃপর রসূল পাঠাবার উদ্দেশ্য এই বলা হয়েছে যে, তিনি সেই আনুগত্য ব্যবস্থাকে (দ্বীন) এবং সকল জীবন বিধানকে (আলহুদা) অন্যান্য সকল প্রকার জীবন বিধানের উপর জয়ী করবেন অর্থাৎ সকল প্রকার আনুগত্য আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের অধীন হবে। সে সব নিয়ন্ত্রিত (Regulate) করবে আল্লাহ তায়ালারই আইন এবং সে বৃহত্তর আনুগত্য এবং আইন শৃঙ্খলার সীমারেখার বাইরে আর কোন আনুগত্যের অস্তিত্বই থাকবে না। (ঐ, পৃঃ ১১৫)

"এ হচ্ছে রসূলের মিশন এবং রসূল এ মিশন পূর্ণ করবার জন্যে আদিষ্ট, শির্ককারীগণ যতোই নাশিকা কুঞ্চিত করুক না কেন। শির্ককারী কারা? ঐ সব লোক যারা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আল্লাহর আনুগত্যের সাথে অন্যান্য স্থানীয় ব্যক্তিসত্তার (অর্থাৎ খোদার আনুগত্য থেকে বিমুখ) আনুগত্য স্বীকার করে। (ঐ, পৃঃ ১১৬)

এ লক্ষ্যে পৌঁছুবার সোজাপথ

"এ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্যে সরল সঠিক পথ সেটাই যা আল্লাহর রসূল মুহাম্মদ (সঃ) অবলম্বন করেছিলেন। অর্থাৎ মানুষকে 'আল হুদা' ও 'দ্বীনে

www.pathagar.org

হকের' দিকে দাওয়াত দিতে হবে। অতঃপর যারা তা গ্রহণ করবে, দাসত্ব ও আনুগত্য আল্লাহর জন্যে একনিষ্ঠ করে দেবে এবং খোদার আইনকে স্বীয় জীবনে আইনে পরিণত করবে, তাদের একটি মজবুত দল গঠন করতে হবে। তারপর এ দলটি তার যথাসম্ভব সকল নৈতিক ও বৈষয়িক উপায়-উপাদানসহ 'দ্বীনে হক' কায়েমের জন্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম (জিহাদে কাবীর) করবে। অবশেষে অন্যান্য শক্তিবর্গ যেসব শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা সবই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং গোটা আনুগত্য ব্যবস্থার উপর ঐ 'আল হুদা' ও 'দ্বীনে হক' বিজয়ী হবে। (ঐ, পৃঃ ১১৬-১১৭)

ইসলামের এই প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছুবার সহজ সরল পথ পরিহার করতে কিছু লোক এ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে যে, প্রথমে ভারতকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করা হোক। অতঃপর ইসলামী লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সংগ্রাম করা যাবে। মাওলানা মওদূদী এ চিন্তাধারা যাঁরা পোষণ করেন তাঁদেরকে প্রশ্ন করেন-

"আমেরিকা, জাপান, জার্মানী ও ইংল্যান্ডের মতো স্বাধীন দেশগুলিতে 'হুকুমতে এলাহিয়া' কায়েম করা কি কম কঠিন, যতোটা ভারতের মতো পরাধীন দেশে কঠিন মনে হচ্ছে? আমি বুঝতে পারি না যে, বৃটিশ শাসনের স্থলে ভারতীয় শাসন প্রতিষ্ঠা কোন অর্থে 'হুকুমতে এলাহিয়া' কায়েমের পথে কিছুটা অগ্রসর। (ঐ, পৃঃ ১২৫)

মুসলমানদের একটা বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মনে করতো যে, যে গণতান্ত্রিক সংবিধান অনুযায়ী ইংরেজ এখানে রাষ্ট্র গঠন করতে চাচ্ছেন প্রথমে সেই গণতান্ত্রিক সংবিধান অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্র কায়েম হোক, তারপর তো চেষ্টা করা যাবে এ জাতীয় রাষ্ট্রকে ক্রমশ ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার। মাওলানা মওদূদী এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন-

"যে ধরনের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রস্তাবিত পাকিস্তনে রয়েছে, তেমন বরঞ্চ সংখ্যার দিক দিয়ে তার চেয়ে অনেক অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, তুরস্ক এবং মিসরে বিদ্যমান রয়েছে। সেসব দেশে ঐ ধরনের 'পাকিস্তান' রয়েছে যেমন, এখানে দাবী করা হচ্ছে। ওখানে কি মুসলমানদের স্বায়ত্ত শাসিত রাষ্ট্র কোন পরিমাণেও "হুকুমতে এলাহিয়া' বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক, অথবা সহায়ক বলে মনে হয়, সহায়ক হওয়া তো দূরের কথা, আমি জিজ্ঞেস করি, আপনারা কি সেখানে হুকুমতে ইলাহিয়ার প্রচারণা চালিয়ে ফাঁসী অথবা নির্বাসন দণ্ড অপেক্ষা কম শাস্তির আশা করতে পারেন? (ঐ, পৃঃ ১৩১)

www.pathagar.org

"অবশ্য এতে সন্দেহ নেই যে, জনগণের নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ করে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে এবং তাদের মনস্তত্ত্বে পরিবর্তন আনয়ন করে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ঐ ধরনের নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লবের জন্যে মুসলমানদের কুফরী রাষ্ট্র কি কোনরূপ সহায়ক হবে? "যারা অধঃপতিত সমাজের বৈষয়িক স্বার্থের আবেদন করে ক্ষমতা হস্তগত করবে," সেসব লোকের সাথে আপনারা কি এ আশা করতে পারেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় অর্থ, তার উপায়-উপাদান এবং তার ক্ষমতা, এখতিয়ার এমন আন্দোলনের সাহায্যে ব্যয় করবে যার উদ্দেশ্য হবে জনগণের মানসিকতার পরিবর্তন করা এবং তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে তৈরী করা? ..... সত্য কথা এই যে, এসব লোক এ বিপ্লবের সাহায্য করার পরিবর্তে উল্টো তার বিরোধিতা করবে। তারা খুব জানে যে, জনগণের মন-মানসিকতার যদি পরিবর্তন হয়, তা হলে সে পরিবর্তিত সমাজে তাদের জারিজুরি চলবে না।

"শুধু তাই নয়, বরঞ্চ তার চেয়ে ভয়াবহ সত্য এই যে, শুধু নামের মুসলমান হওয়ার কারণে এসব লোক কাফেরদের তুলনায় অধিকতর স্পর্ধা ও নির্ভীকতা সহকারে এ ধরনের প্রত্যেক প্রচেষ্টা চূর্ণ করে দেবে এবং তাদের অন্যায়ে প্রশ্রয় দানের জন্যে যথেষ্ট হবে।" (ঐ, পৃঃ ১৩২)

দুনিয়ার ইতিহাসের প্রতি যাঁরা নজর রাখেন, তাঁদের কাছে এ কথা গোপন নয় যে, মাওলানা মওদূদী ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালে ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে যা কিছু লিখেছিলেন, তা ছিল তাঁর রাজনৈতিক অসাধারণ দূরদর্শিতার ফল। তারপর আজ পর্যন্ত দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে ইসলামী আন্দোলনের সাথে স্বয়ং মুসলিম সরকারগুলো ও তাদের শাসকবৃন্দ সে আচরণই করেছেন। তুরস্কে নূরসী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বদীউযযামান নূরসী এবং তাঁর অনুসারীদের সাথে মিসর ও অন্যান্য আরবদেশগুলোতে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্না শহীদ ও তাঁর অনুসারীদের সাথে, ইন্দোনেশিয়ার 'দারুল ইসলাম' আন্দোলনের সাথে, ইরানে আয়াতুল্লাহ খুমেনী ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে এবং স্বয়ং পাকিস্তানে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর বহু কর্মীর সাথে ঐসব কিছুই বরঞ্চ তার থেকে অনেক বেশী অত্যাচার-উৎপীড়ন করা হয়েছে, যার ইঙ্গিত স্বয়ং মাওলানা বহু পূর্বেই করেছিলেন।

www.pathagar.org

পাকিস্তান আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত

"বৃটিশ সরকারের মুসলমানদের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ, মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের অত্যাচার, অবিচার এবং ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলিম জাতিকে জাগ্রত করে। ইকবালের কবিতা আত্মপরিচিতি সৃষ্টি করে এবং মাওলানা মওদূদী সৃষ্টি করেন আত্মবিশ্বাস। কায়েদে আযম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন।

অবশেষে ১৯৪০ সালে লাহোরের মিন্টু পার্কে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ সম্মেলনে যে ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হয়, তা পাকিস্তান প্রস্তাব নামে আখ্যায়িত হয়।

মুসলিম ও অমুসলিমদের সামনে ইসলামের দাওয়াত

প্রথম কাজ হিসেবে মাওলানার সে ভাষণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যা তিনি চল্লিশের মে মাসে কাপুরথালায় হিন্দু-মুসলমান ও শিখদের এক সম্মিলিত সমাবেশে দান করেন, যা 'শান্তি পথ' নামে পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয়। তার কিছু উদ্ধৃতি নিম্নে দেয়া হলো ঃ

এ যমীন ও আসমানের বিরাট কারখানা যা আপনাদের চোখের সামনে চলতে দেখছেন, যার মধ্যে চন্দ্র-সূর্য ও বিরাট বিরাট তাকারাজি ঘড়ির কাঁটার মতো চলছে .... এসব সম্পর্কে আপনারা কি করে একথা মেনে নিতে পারেন যে, এসব কিছু কোন সৃষ্টকর্তা ব্যতিরেকেই আপনা-আপনিই হয়ে গেছে এবং কোন পরিচালক ব্যতিরেকেই চলছে? আপনারা কখনো কি একথা চিন্তা করে দেখছেন যে, মায়ের পেটের মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র ফ্যাক্টরীতে কিভাবে মানুষ তৈয়ার হয়? এতে বাপেরও কিছু করার নেই, মায়েরও কোন কর্মকৌশল কাজে আসে না। এ ফ্যাক্টরী থেকে প্রতিদিন এই পন্থায় লক্ষ লক্ষ মানুষ তৈরী হয়ে বেরুচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকের নমুনা পৃথক পৃথক। আকার-আকৃতি পৃথক, শক্তি ও যোগ্যতা পৃথক, স্বভাব-প্রকৃতি ও চিন্তাধারা পৃথক, চরিত্র ও গুণাবলী পৃথক। একই মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণকারী দু'টি সহোদর ভাইয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। এ এমন এক অলৌকিক ব্যাপার, যা দেখলে বিবেক স্তম্ভিত হয়ে যায়।"

"এ সারা দুনিয়ায় আপনারা বেঁচে রয়েছেন। এ দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা শুধু এ জন্যে অব্যাহত রয়েছে যে, এ বিরাট সাম্রাজ্যের সকল বিভাগগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে কাজ করছে।"

"অতএব ব্যাপার শুধু এতোটুকু নয় যে, দুনিয়া কোন নির্মাতা ব্যতীত তৈরী হয়নি, বরঞ্চ এটাও প্রকৃত ঘটনা যে, এসব কিছু একই জন বানিয়েছেন.... ব্যবস্থাপনার

www.pathagar.org

সুশৃঙ্খলা পরিষ্কার এটাই প্রমাণ করে যে, এখানে একজন ব্যতীত আর কারো হাতে শাসন-কর্তৃত্বের কোন এখতিয়ার নেই।"

"যদি বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপ্রভু ব্যতীত ছোটো ছোটো খোদা এমন হতো, যারা দুনিয়ার উপর শাসন ও কর্তৃত্ব রাখতো না কিন্তু দুনিয়ার কোন অংশেই যদি তাদের নিজস্ব প্রকৃত শাসন চালাবার এখতিয়ার থাকতো, তাহলে এ আসমান ও যমীনের সমস্ত কারখানা লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতো।

"আপনারা যদি চিন্তা করেন, তাহলে মন সাক্ষ্য দেবে যে, খোদার এ সাম্রাজ্যে কোন বান্দাহর আপন ইচ্ছামত হুকুম শাসন চালাবার কোন অধিকারই নেই। এমনটি হওয়া না শুধু প্রকৃত ঘটনারই পরিপন্থী, না শুধু বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃতির পরিপন্থী, বরঞ্চ প্রকৃত সত্যেরও পরিপন্থী।"

মানুষের ধ্বংসের প্রকৃত কারণ

"আজ এ প্রশ্ন আপনাদের প্রত্যেকের জন্যে এবং দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে এক বিব্রতকর জটিলতা সৃষ্টি করে রেখেছে যে, অবশেষে আমাদের মানব জীবন থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা উঠে গেল কেন? .... এর সংক্ষিপ্ত জবাব এই যে, মানুষ তার জীবনকে প্রকৃত সত্যের বিপরীত বানিয়ে রেখেছে। সে জন্যে তাকে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে এবং যতোক্ষণ না সে তার জীবনকে প্রকৃত সত্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল করেছে, তার জীবনে সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা আসবে না এবং প্রকৃত সত্য এই যে, আপনাদেরকে আল্লাহ পয়দা করেছেন। আপনাদেরকে তিনি লালিত-পালিত করছেন। আপনাদের এবং সারা দুনিয়ার কর্মকর্তা তিনি-এ যমীন ও আসমান সবই তাঁর-সম্পত্তি (Property)। তাঁর এ সম্পত্তির উপরে মর্জি তাঁরই চলবে এবং চলা উচিত। আপনাদের এখানে আপন মর্জি চালাবার কোন অধিকার নেই- যেখানে খোদার আনুগত্যের পরোয়া না করে মানুষ তার আপন হুকুম চালায় এবং অন্য মানুষ হুকুম মেনে চলে, সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা নেই, থাকতে পারে না।"

মানুষের কল্যাণ কিভাবে হতে পারে?

"ভেবে দেখুন, মানুষের কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধি কিভাবে লাভ করা যেতে পারে? তার উপায় এ ছাড়া আর কিছু নেই যে, মানব জীবনের জন্যে আইন রচনা তিনিই করবেন যাঁর চোখে সকল মানুষ সমান। সকলের অধিকার সুবিচারসহ তিনি নির্ধারিত করে দেবেন। তাঁর না কোন স্বার্থ রয়েছে, আর না কোন পরিবার, শ্রেণী, কোন দেশ অথবা কোন জাতির স্বার্থের প্রতি তাঁর কোন বিশেষ আকর্ষণ-অনুরাগ রয়েছে। সকলেরই তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। শুধু এ অবস্থাতেই সুবিচার কায়েম হতে পারে।"

www.pathagar.org

মাওলানা তাঁর ভাষণে শাহী পরিবার, ব্রাহ্মণ, পীর, সুদী মহাজন এবং শাসক জাতিগুলোর দৃষ্টান্ত পেশ করে বলেন, এদের মধ্যে সুবিচার না কেউ কায়েম করে, আর না করতে পারে। তিনি বলেন ঃ

"এ জন্যে আমরা যদি নিজেদের মঙ্গল চাই, তাহলে আমাদের জন্যে এ ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই যে, আমরা খোদার উপর ঈমান আনবো, তাঁর শাসন-কর্তৃত্বের কাছে নিজেদেরকে অনুগত প্রজার মতো সোপর্দ করে দেব এবং এ দৃঢ় প্রত্যয়সহ দুনিয়ায় জীবন যাপন করব যে, তিনি আমাদের গোপন-প্রকাশ্য প্রতিটি ক্রিয়াকর্ম দেখছেন এবং একদিন তাঁর আদালতে হাজির হয়ে গোটা জীবনের কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে।"

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মপন্থা

এ প্রসঙ্গে তর্জুমানুল কুরআনে ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখার সাথে ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতীয় মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষিত মহলের স্নায়ুকেন্দ্র আলীগড়ে এক ঐতিহাসিক ভাষণে মাওলানা ব্যাখ্যা করেন ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে কায়েম হয়। সে ভাষণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মাওলানা বলেন ঃ

রাষ্ট্রের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ

রাষ্ট্র যে ধরনেরই হোক না কেন, তা কৃত্রিম উপায়ে গঠিত হয় না। তা একটি সমাজের ভেতরের নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, তামাদ্দুনিক ও ঐতিহাসিক কার্যকারণের প্রক্রিয়া থেকে স্বাভাবিকভাবেই অস্তিত্ব লাভ করে। যে ধরনেরই শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা ঈপ্সিত হলে, তার মেযাজ ও প্রকৃতি অনুযায়ী উপকরণ সৃষ্টি করা এবং তার উপযোগী কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। তার জন্যে প্রয়োজন এই যে, যে ধরনের আন্দোলন শুরু করতে হবে, সে ধরনের ব্যক্তি-চরিত্র তৈরী করতে হবে। সে ধরনের নৈতিক স্বভাব তৈরী করতে হবে। সে ধরনের নেতৃত্ব, তদনুরূপ সামাজিক ও সামষ্টিক কর্মকাণ্ড হতে হবে, যার দাবী এ বিশেষ ধরনের শাসন ব্যবস্থা করে।"

ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

"ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, জাতায়ীতার কোন মৌলিক পদার্থই তার মধ্যে থাকবে না। তা হবে একটি নিরেট আদর্শিক রাষ্ট্র। যে এ আদর্শ গ্রহণ করবে সে যে কোন জাতির হোক না কেন, এ রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।"

www.pathagar.org

"এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তার গোটা প্রাসাদ খোদার সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তার মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, দেশ যেহেতু খোদার তার শাসকও একমাত্র তিনিই। রাষ্ট্রের সঠিক রূপ এছাড়া আর কিছু নয় যে, মানুষ খোদার খলীফা হিসাবে কাজ করবে।"

ইসলামী বিপ্লবের পথ

ইসলামী রাষ্ট্র কোন অলৌকিক উপায়ে অস্তিত্ব লাভ করে না। এর জন্যে প্রয়োজন এই যে, প্রথমে এক আন্দোলন শুরু হবে যার ভিত্তিই হবে সেই জীবন যাপন মতবাদ, সেই জীবনের উদ্দেশ্য, সেই চারিত্রিক মান এবং আচার-আচরণ যা ইসলামের মেযাজ প্রকৃতির সাথে সংগতিশীল। এর নেতা ও কর্মী শুধু তারাই হবে, যারা এ বিশেষ ধরনের মানবতার ছাঁচে তৈরী হওয়ার জন্যে সদা প্রস্তুত। তারপর তারা আপন চেষ্টাচরিত্রের মাধ্যমে সমাজে ঐ মানসিকতা এবং নৈতিক প্রাণশক্তি বিতরণের চেষ্টা করবে।"

অতঃপর এর ভিত্তিতে শিক্ষাদীক্ষার এমন এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, যা এ বিশেষ ধরনের লোক তৈরী করবে। তার মাধ্যমে মুসলমান বিজ্ঞানী, মুসলমান দার্শনিক, মুসলমান ঐতিহাসিক, মুসলমান অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ, মুসলমান আইন বিশেষজ্ঞ, মুসলমান রাজনীতিবিদ, মোট কথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি বিভাগে এমন লোক তৈরী হবে, যারা চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে মুসলমান হবে। যাদের মধ্যে এ যোগ্যতা হবে যে, তারা চিন্তাচেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির এক পরিপূর্ণ ব্যবস্থা এবং বাস্তব জীবনের এক পরিপূর্ণ কাঠামো ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে তৈর করবে। তাদের মধ্যে এতোটা শক্তিসামর্থ হবে যে, দুনিয়ার খোদাবিমুখ চিন্তাশীলদের মুকাবেলায় নিজস্ব বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও মানসিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবে।"

"এ মানসিক পটভূমির সাথে এ আন্দোলন কার্যত ঐ ভ্রান্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে যা চারপাশে ছড়িয়ে আছে। এ সংগ্রামে এর পতাকাবাহীগণ বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট মাথায় নিয়ে, ত্যাগ-কুরবানী স্বীকার করে এবং জীবন উৎসর্গ করে নিজেদের নিষ্ঠা ও অদম্য সংকল্পের প্রমাণ দেবে। অগ্নি-পরীক্ষার ভাটিতে দগ্ধীভূত হয়ে এমন স্বর্ণ হয়ে বেরুবে যে, প্রত্যেককে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নির্ভেজাল ও উন্নত মানের স্বর্ণ হিসেবেই দেখতে পাবে।"

"সমাজের ঐসব লোক যাদের মধ্যে কিছু না কিছু নেকী ও সততা রয়েছে, তারা এ ধরনের সংগ্রামের ফলে এ আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। জনগণের মানসিকতায় এক বিপ্লব সংঘটত হবে। অবশেষে এক অনিবার্য ও স্বাভাবিক ফল হিসেবে সেই শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবে, তার জন্যে প্রাথমিক কর্মী থেকে শুরু

www.pathagar.org

করে মন্ত্রী ও পরিচালক-প্রত্যেক স্তরের উপযোগী লোকজন এ শিক্ষা-ব্যবস্থার বদৌলতে পাওয়া যাবে, যার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে।"

"ইসলামী বিপ্লব শুধু এ অবস্থাতেই সংঘটিত হতে পারে যখন একটি গণআন্দোলন কুরআনের ধারণা, মতবাদ ও সামগ্রিক চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং সামাজিক জীবনে সকল মানসিক, নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির বুনিয়াদকে শক্তিশালী সংগ্রামে রূপান্তরিত করবে।"

"ইসলাম প্রকৃতপক্ষে সেই আন্দোলনের নাম, যা এক খোদার সার্বভৌমত্বের ধারণা-বিশ্বাসের উপর মানব জীবনের গোটা প্রাসাদ নির্মাণ করতে চায়। এ আন্দোলন প্রাচীনতম কাল থেকে একই বুনিয়াদ এবং একই পদ্ধতিতে চলে আসছে। তার লীডার ঐসব ব্যক্তি ছিলেন, যাঁদেরকে বলা হতো আল্লাহর রসূল। আমাদেরকে যদি এ আন্দোলন চালাতে হয়, তাহলে অনিবার্যরূপে ঐ নেতৃবৃন্দের কর্মপদ্ধতিরই অনুসরণ করতে হবে। কারণ, তাছাড়া অন্য কোন কর্মপদ্ধতি ও বিশেষ ধরনের আন্দোলনের জন্যে যা আছে আর না হতে পারে।"

"এ ব্যাপারে আমরা একই স্থান থেকে সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ পথ-নির্দেশনা পাই এবং তা হচ্ছে মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবন চরিত্র। ইসলামী আন্দোলনের সকল নেতার মধ্যে শুধু মুহাম্মদই (সঃ) একক নেতা, যাঁর জীবনে আমরা এ আন্দোলনের প্রাথমিক দাওয়াত থেকে শুরু করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এবং প্রতিষ্ঠার পর সে রাষ্ট্রের রূপ ও আকৃতি, সংবিধান, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পলিসি এবং রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি-পদ্ধতি পর্যন্ত এক একটি স্তর ও এক একটি বিভাগের বিস্তারিত ও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাই।"

"যে নেতাকে আল্লাহ তায়ালা পথ দেখানোর জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি দুনিয়ার এবং স্বয়ং আপন দেশের বহু সমস্যার মধ্যে কোন একটির প্রতিও মনোযোগ দেন নি। বরঞ্চ তিনি শুধু এ দাওয়াতই দেন, "খোদা ব্যতীত সকল ইলাহকে প্রত্যাখ্যান কর এবং শুধুমাত্র এক 'ইলাহ'-এর দাসত্ব-আনুগত্য ও বন্দেগী কবুল কর।"

নবী পাকের (সঃ) সে আহ্বানের প্রতিক্রিয়া

"আহ্বানকারী জেনে-বুঝেই আহ্বান জানান এবং আহ্বান শ্রবণকারী বুঝতে পারছিল যে, কিসের আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ জন্যে যার যার উপরে যে দিক দিয়ে এ আহ্বানের আঘাত পড়ে তারা একে দাবিয়ে দেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। প্রত্যেক প্রতিমাপূজারী অনুভব করে যে, এ আহ্বানে তাদের প্রতিমা চূর্ণ-বিচূর্ণ

www.pathagar.org

হয়ে যাবে। যারা পরস্পর বিবদমান ছিল তারা ও এ নতুন আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। শুধুমাত্র ঐসব লোক নবী পাকের (সঃ) আহ্বানে সাড়া দেয়, যাদের মন ছিল পরিচ্ছন্ন, যারা সত্য উপলব্ধি করার ও তা মেনে নেয়ার ক্ষমতা রাখতো। তাদের মধ্যে এতোটা সত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল যে, যখন একটি জিনিস তারা বুঝতে পারলো যে তা সত্য, তখন তার জন্যে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জীবন দিতেও তারা প্রস্তুত ছিল।

"এ ধরনের লোকেরই এ আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন ছিল। তাঁরা একজন দু'জন করে আন্দোলনে শরীক হতে থাকেন এবং দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বাড়তে থাকে। কারো রোজগার বন্ধ হয়ে গেল, কাউকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হলো, কারো আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব দূরে সরে দাঁড়ালো, কাউকে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়ে হেঁচড়ে নেয়া হতে থাকলো, কাউকে প্রস্তর ও গালির সম্মুখীন হতে হলো। কারো চক্ষু খুলে নেয়া হলো, কারো মস্তক চূর্ণ করা হলো, কাউকে নারী, ধনদৌলত, শাসন-ক্ষমতা এবং প্রতিটি সম্ভাব্য বস্তুর প্রলোভন দিয়ে খরিদ করা হলো। এসব কিছু হলো এবং হওয়ার প্রয়োজন ছিল। এসব ব্যতীত ইসলামী আন্দোলন না সুদৃঢ় হতে পারতো, আর না প্রসার লাভ করতে পারতো।"

"একদিকে আন্দোলনে যোগদানকারীদের এভাবে তরবিয়ত হচ্ছিল এবং অন্যদিকে এ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ফলে ইসলামী আন্দোলন প্রসার লাভও করছিল। ব্যতিক্রম ছিল শুধু ঐসব লোক, যাদেরকে আত্মসম্ভ্রমের অহঙ্কার অথবা বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ অথবা পার্থিব স্বার্থের ভালবাসা একেবারে অন্ধ করে রেখেছিল। অন্যান্য সকলে আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল।"

"এ সময়ে আন্দোলনের নেতা নবী মুহাম্মদ (সঃ) নিজের বাস্তব জীবন দিয়ে এ আন্দোলনের নীতি ও আদর্শের এবং প্রতিটি ঐ বিষয়ের যার জন্যে এ আন্দোলন চলছিল পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটান। তাঁর প্রতিটি কথা, কাজ ও তৎপরতায় ইসলামের প্রাণশক্তি দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল এবং মানুষ উপলব্ধি করছিল ইসলাম কোন্ বস্তুর নাম।"

"আপন আন্দোলনের ব্যাপারে নবী (সঃ) আপন দেশ, জাতি, গোত্র, পরিবার এবং কারো স্বার্থের কখনো কোন পরোয়া করেন নি। এ জিনিসই দুনিয়ার মধ্যে এ প্রত্যয় সৃষ্টি করে যে, তিনি মানুষ হিসেবে মানুষের কল্যাণের জন্যেই আবির্ভূত হয়েছেন। এ জিনিসই তাঁর দাওয়াতের প্রতি প্রত্যেক জাতির লোককে আকৃষ্ট করেছে।"

www.pathagar.org

হিজরতের পর আন্দোলন

"তেরো বছরের তীব্র সংগ্রামের পর এমন সময় এলো যখন মদীনায় একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো। দশ বছর পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সঃ) এ রাষ্ট্রের নেতৃত্বদান করেন এবং এ সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগ ইসলামের রীতি-পদ্ধতিতে পরিচালনা করার অনুশীলন তাঁদেরকে (সাহাবায়ে কেরাম) শিখিয়ে দেন। তাঁরা ইসলামী শাসনের এমন নমুনা পেশ করেন যে, আট বছরের অল্প সময়ের মধ্যে মদীনার মতো একটি নগর রাষ্ট্র সমগ্র আরবের একটি রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়।"

"এ বিপ্লবকে রক্তপাতহীন বিপ্লব বলা যেতে পারে। এ বিপ্লবে শুধু দেশের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিরই পরিবর্তন হয়নি, বরঞ্চ মনমানসিকতারও পরিবর্তন হয়, দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তিত হয়, চিন্তা-পদ্ধতির পরিবর্তন হয়, জীবন যাপন পদ্ধতি বদলে যায়, নৈতিক দুনিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয়, আচার-আচরণ বদলে যায়, মোট কথা একটি গোটা জাতির কায়া পরিবর্তিত হয়ে যায়।"

'যতোক্ষণ পর্যন্ত এ নতুন আদর্শে জীবনের চিত্র তৈরী হয়নি, মানুষ বুঝতে পারতো না যে, এ অভিনব ধরনের নেতা অবশেষে কি তৈরী করতে চান। কিন্তু যখন সে চিন্তাধারার ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান গড়ে উঠলো এবং মানুষ স্বচক্ষে তাঁকে কাজ করতে দেখলো ও তার সুফলও তাদের সামনে সুস্পষ্টরূপে দেখা দিল, তখন তারা বুঝতে পারলো যে, এটাই সেই বস্তু ছিল যা তৈরী করার জন্যে এ আল্লাহর নেক বান্দাহ সারা দুনিয়ার অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করেছিলেন। তারপর হঠকারিতা ও জিদ করে টিকে থাকার আর কারো সুযোগ রইলো না।"

"আজও যদি আমরা এ পদ্ধতিতে কাজ করি, তাহলে সেই সুফলই লাভ করতে পারি। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, এ কাজের জন্যে ঈমান, ইসলামী অনুভূতি, মনের একাগ্রতা, দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি এবং ব্যক্তিগত ভাব-প্রবণতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরাট কুরবানীর প্রয়োজন। এর জন্যে এমন সব দুর্বার সাহসী লোকের প্রয়োজন যারা হকের উপর ঈমান আনার পর তার প্রতিই পুরোপুরি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে, অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেবে না। দুনিয়ায় যা কিছু হোক না কেন, তারা তাদের লক্ষ্য থেকে কণামাত্র বিচ্যুত হবে না। পার্থিব জীবনে তাদের ব্যক্তিগত উন্নতি ও সমৃদ্ধির সকল সম্ভাবনা উৎসর্গ করবে। নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মাতাপিতার আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল হতে দেখে বিব্রত হবে না। বন্ধুবান্ধব সম্পর্ক ছিন্ন করলে কাতর হবে না। সমাজ, সরকার, আইন, জাতি, দেশ প্রভৃতি যেসব বস্তুই তাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক হবে, সেসবের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে।"

www.pathagar.org

"এ ধরনের লোকই পূর্বেও আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করেছিলেন। এ ধরনের লোক আজও করবেন এবং এ কাজ এ ধরনের লোকের দ্বারাই হতে পারে।"

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে একটি ইসলামী দল ও জাতীয়তাবাদী দলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ভারতীয় মুসলমানদের অধঃপতনের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করে তাদের মধ্যে সত্যিকার ইসলামী প্রাণশক্তি জাগ্রত করার এক দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং তর্জুমানুল কুরআনের মাধ্যমে তিনি এ উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করেন। কিন্তু তিনি তাঁর কাজ করার মাত্র চার-পাঁচ বছর পরই ভারতের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন শুরু হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত আইন (India Act of 1935) প্রণয়নের মাধ্যমে বৃটিশ ভারতে তাদের ঔপনিবেশিক শাসন পরিহার করে পাততাড়ি গুটাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার জন্যে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে যাওয়াই ছিল তাদের ইচ্ছা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এ উদ্দেশ্যে একজাতীয়তার ভিত্তিতে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করেছিল এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী সাতটি প্রদেশে ১৯৩৭ সালে তাদের সরকার কায়েম হয়।

সাতটি প্রদেশের কংগ্রেস তথা হিন্দুদের শাসন একথা প্রমাণ করে যে, বৃটিশের পর তাদের হাতে সারা ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে মুসলমানদের মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকার কোন উপায় থাকবে না। তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বিলুপ্ত হবে এবং হিন্দু জাতীয়তার মধ্যে একাকার হয়ে যেতে বাধ্য হবে। দ্রুত পরিবর্তশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি এ কথাই বলছিল যে, স্বাধীনতা অতি আসন্ন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুজাতির হাতেই ক্ষমতা অর্পিত হবে।

এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করার জন্যে মাওলানা যে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহলো একজাতীয়তার অযৌক্তিকতা, অন্তঃসারশূন্যতা, তার ভয়াবহ পরিণাম ব্যাখ্যা করে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ইতিহাস থেকে বলিষ্ঠ যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা ইসলামী জাতীয়তার ধারণা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন। পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুযায়ী দেশ সত্বরই স্বাধীনতা লাভ করছে এ কথা ধরে নিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ হিন্দুদের তিন চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধীনে মুসলমানদের অস্তিত্ব জিইয়ে রাখার জন্যে তাদের মৌলিক অধিকার ও রক্ষাকবচ সম্পর্কেই দাবীদাওয়া পেশ করছিলেন। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধীনে যেখানে হিন্দুদের তিন-ও মুসলমানদের এক ভোট-কোন মৌলিক অধিকার অথবা রক্ষাকবচের নিশ্চয়তা তাদেরকে হিন্দু জাতির মধ্যে বিলীন হওয়া থেকে অথবা নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তবে মাওলানা জাতীয়তার ব্যাখ্যা

www.pathagar.org

মুসলমানদের মধ্যে আত্মচেতনা ও আত্ম-উপলব্ধির প্রেরণা জাগ্রত করে এবং তারা যে একট সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি এ দৃঢ় প্রত্যয় তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। এ প্রত্যয় তাদেরকে হিন্দু জাতীয়তার মধ্যে একাকার হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করলো বটে, কিন্তু ইসলামী জাতীয়তার স্থলে মুসলিম জাতীয়তার অন্ধ ভাবাবেগ তাদেরকে এক ভিন্ন পথে পরিচালিত করে। দ্বিজাতিত্বের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র অর্থাৎ পাকিস্তানের দাবী উত্থিত হয়। হিন্দু প্রাধান্য ও অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ভারতীয় মুসলমানগণ পাকিস্তান দাবীর পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু একটি মুসলিম রাষ্ট্র মনে করে এবং সেভাবে তার প্রচার-প্রপাগান্ডাও শুরু করে। একটি মুসলিম রাষ্ট্র হলেই যে তা ইসলামী রাষ্ট্র হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, বরঞ্চ মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে মুসলমানদের যে রাষ্ট্র হবে তা একটি কাফের রাষ্ট্র অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হতে পারে। মিসর, তুরস্ক, ইরাক, সিরিয়া, আলজেরিয়া, সুদান, লিবিয়া, আফগানিস্তান ও ইন্দোনেশিয়া তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই চরিত্রহীন মুসলিম নেতৃত্বের অধীন একটি মুসলিম রাষ্ট্রের ইসলাম দুশমনী থেকে এবং একটি হিন্দু রাষ্ট্রের মুসলিম জাতিকে নির্মূল করার ষড়যন্ত্র থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্যে মাওলানা মওদূদী যে ফলপ্রসূ ও অনিবার্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তাহলো পরিপূর্ণ ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একটি ইসলামী দল গঠন, যার নাম দেয়া হয় জামায়াতে ইসলামী।

দেশ সাতচল্লিশ সালে বিভক্ত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়- ভারত ও পাকিস্তান। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানকে তার শাসকদের অভিলাষ অনুযায়ী যেমন একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মহীন (সেক্যুলার) রাষ্ট্রে পরিণত হতে বাধাদান করে আসছে, তেমনি ভারতের হিন্দু রাষ্ট্রে মুসলমানদেরকে মুসলমান হিসেবে টিকে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ দলটি একটি চরিত্রবান কর্মীবাহিনীসহ যদি বিদ্যমান না থাকতো, তাহলে একদিকে যেমন ভারতের মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতো, অন্যদিকে পাকিস্তান একটি মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও একটি কমিউনিস্ট দেশে পরিণত হতো। আল্লাহ তায়ালার খাস রহমতে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, জম্মু কাশ্মীর প্রভৃতি দেশগুলোতে স্বতন্ত্র সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামী মশালকে প্রজ্বলিত রেখেছে এবং মানুষের মনে ইসলামের যৌবন-জোয়ার সৃষ্টি করছে। মাওলানা মওদূদীর এই হলো মহানতম অবদান গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্যে, যার ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ইসলামী জাগরণের গুঞ্জরণ ধ্বনিত হচ্ছে।

www.pathagar.org

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেশ বিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও জনসেবা (১৯৪৭ এর জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত)

বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারতভূমি ত্যাগ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেছেন। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে (অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস) ক্ষমতা হস্তান্তরেরই কথা। কিন্তু তাদের অধীনে মুসলমানগণ তাদের জানমাল, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও তাহ্যীব-তামাদ্দুন নিরাপদ মনে না করে নিজস্ব আবাসভূমি পাকিস্তানের জন্যে সাত বছর ধরে সংগ্রাম করে আসছে যা মেনে নিতে বৃটিশ সরকার বাধ্য হয়েছেন। অখণ্ড ভারতে একজাতীয়তার ভিত্তিতে দেশ শাসনের সুযোগ নষ্ট হওয়ায় তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে হিন্দুদের হিংস্র মানসিকতার ব্যাপক প্রকাশ ঘটে। দেশের সর্বত্র মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চলগুলোতে হিন্দুদের পক্ষ থেকে চরম বর্বরতা ও পাশবিকতার তাণ্ডবলীলা শুরু হয়। বিহার প্রদেশে সর্বাধিক লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড হতে থাকে। একজাতীয়তা ও অখণ্ড ভারতের পতাকাবাহীগণ মুসলমানদের জনপদগুলো একটির পর একটি করে জ্বালিয়ে দিতে থাকে। বহু মানব সন্তানকে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়। কয়েক দিনের মধ্যে হাজার হাজার বর্গমাইলব্যাপী এলাকার মুসলমান গৃহহারা ও সর্বস্বহারা হয়ে পড়ে। প্রতিদিন প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে লোমহর্ষক ঘটনার খবর আসতে থাকে। বিপন্নদের আশ্রয় ও ত্রাণ সাহায্য বিতরণের জন্যে পাটনা শহরে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রিলিফ্ ক্যাম্প উদ্বোধন করে প্রধানত জনাব আবদুল জাব্বার গাজীর উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। দেশের প্রায় সর্বত্রই দাঙ্গা-উপদ্রুত অঞ্চলে জামায়াতের পক্ষ থেকে আশ্রয় শিবির উদ্বোধন, অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থাকরণ এবং আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। সারা দেশে হত্যা ও লুটতরাজের ব্যাপকতার তুলনায় জামায়াতে ইসলামীর ত্রাণকার্য অতি সীমিত হলেও জামায়াত কর্মীগণ জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে তাঁদের এ নৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। শুধু তাই নয়, হিন্দু সংখ্যালঘু এলাকায় মুসলমানদের বর্বরতার কারণে যেসব হিন্দু বিপন্ন হয়েছেন, সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে থেকে তাদেরও সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করে জামায়াত কর্মীগণ আর্তমানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

www.pathagar.org

জামায়াতে ইসলামী ও জনসেবা

এ বিরাজমান অবস্থায় জামায়াতে ইসলামী তার রুকনদের (সদস্যবৃন্দ) যে বিষয়ের মানসিক প্রশিক্ষণ দেয় তা নিম্নরূপ ঃ

১। যেহেতু মানুষের জনপদগুলো খোদাভীতি, সততা ও সত্যনিষ্ঠা থেকে দূরে সরে পড়েছে এবং খোদার স্থান জাতি অধিকার করে বসেছে, সে জন্যে এসব অশান্তি, অনাচার ও হত্যাকাণ্ডের পেছনে শুধু গুণ্ডাবদমাইশ ও দলীয় নেতাদের ভূমিকাই নেই, বরঞ্চ একটি পূর্ণ ভ্রান্ত জীবন বিধানই এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এ ভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন ব্যতীত কিছু বাহ্যিক কলাকৌশল অবলম্বন করে এ হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা যাবে না। দুষ্কৃতকারীদের ধরপাকড় করে, প্রেসের সমালোচনা করে এবং শান্তি কমিটি স্থাপন করে এ অনাচার নির্মূল করা যাবে না। এ সমস্যার মূলে রয়েছে মানুষের মানসিক বিকৃতি ও অধঃপতন।

২। অবস্থা যতোই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করুক না কেন, জামায়াতে ইসলামীকে সর্বাবস্থায় সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় বিদ্বেষের উর্ধে থেকে হকের দাওয়াত দিতে হবে। সেই সত্যনিষ্ঠার পথেই চলতে হবে যা খোদাভীতির বুনিয়াদী মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। কোন জাতির প্রতি ঘৃণা অথবা শত্রুতার কারণে এ নীতি পরিবর্তন করা যাবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এ কখনো ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না যে, কোন এক স্থানের দুষ্কৃতকারীর অত্যাচারের প্রতিশোধ অন্য কোন স্থানের নিরপরাধ লোকের উপর নেয়া হবে।

৩। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আপন স্থান থেকে পালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা রুখতে হবে। নির্ভয়ে এবং পরিপূর্ণ নিশ্চিত মনে আপন আপন স্থানে অবিচল থাকতে হবে। যে সাচ্চা মুসলমান তার উপরে আরোপিত ফরয সে পালন করে যাচ্ছে, তার এ কাজে জীবন দেয়া এমন এক কাজ যা মুসলমানেরই বাঞ্ছিত। জীবনের ভয় শুধু সেই করতে পারে যার মধ্যে খোদার ভয় নেই, অথবা থাকলে তা কৃত্রিমতায় আবৃত। যে ব্যক্তি খোদাকে ভয় করে সে তো খোদা ব্যতীত আর কাউকেই ভয় করতে পারে না। এ জন্যে জামায়াত কর্মীগণ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপন স্থানে অবিচল থাকবে যতোক্ষণ না বস্তির সকলেই স্থানান্তরিত হয়।

এসব নির্দেশ অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামী উপদ্রুত এলাকায় ব্যাপক আকারে ত্রাণকার্য চালায়। রিলিফ্ ক্যাম্পের মাধ্যমে জামায়াত কর্মীগণ তিন ধরনের কাজ করেন ঃ

১। সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে সর্বহারা মুসলমানদের হতাশা, ভীতি ও সন্ত্রাস দূর করা। হতাশাগ্রস্তদেরকে নতুন করে ঐক্যবদ্ধ করা। তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা ও প্রেরণা জাগ্রত করে সংখ্যাগুরুর মুকাবিলার জন্যে তৈরী করা নয়, বরঞ্চ

www.pathagar.org

তাদের মধ্যে সত্যিকার ইসলামী প্রাণশক্তি সঞ্চার করে তাদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করা। জামায়াতে ইসলামীর অভিমত এই যে, মুসলমান যদি সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব অনুভব করে যা ইসলাম তাদের অমুসলিম ভাইদের সংস্কার-সংশোধনের ব্যাপারে আরোপ করেছে, তাহলে তাদের আচরণ, তাদের অমুসলিম যদি সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব অনুভব করে যা ইসলাম তাদের অমুসলিম প্রতিবেশীদের প্রতি হবে সহানুভূতিশীল, যার ফলে অমুসলিমদের আচরণেও সন্তোষজনক পরিবর্তন দেখা দেবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এ সময়ে দু'ধরনের লোকই পাওয়া যায়। প্রথমত, ঐ ধরনের লোক যারা ভৌগোলিক জাতীয়তার নির্বুদ্ধিতায় মগ্ন হয়ে মুসলিম-অমুসলিমের স্বাতন্ত্র্যই ভুলে বসে আছে। দ্বিতীয় এমন ধরনের লোক, যারা বংশগত বিদ্বেষে এতোটা অন্ধ যে, তারা নিজেদের এবং অমুসলিমদের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্কের সম্ভাবনাই দেখতে পায় না।

২। জামায়াতে ইসলামীর দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিল মুসলমানদেরকে তাদের বস্তিগুলো আলাদা আলাদা পকেটের আকারে বানাতে উদ্বুদ্ধ করা। এ কাজ সরকারেরই করণীয় ছিল, কিন্তু যেসব লোক নিয়ে সরকার গঠিত, তাদের কাছে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে কোন সঙ্গতিপূর্ণ পরামর্শ দিলে তা গৃহীত হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে জন্যে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীরা নিজেরাই এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরা মুসলিম বস্তিগুলোর একটা বিশেষ পকেট তৈরী করে তাদের মধ্যে আনসার ও মুহাজেরীনের প্রাণশক্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তাঁরা এ চেষ্টা করেন যাতে করে যাদেরকে সেখানে স্থানান্তরিত করা হবে তাদের মধ্যে যেন নৈতিক ও দ্বীনী স্বার্থকে সকল কিছুর উপর অগ্রাধিকার দানের প্রেরণা জাগ্রত হয় এবং যাদের মধ্যে তাদেরকে স্থানান্তরিত করা হবে তাদের মধ্যে যেন প্রকৃত আনসারের মতো কুরবানীর মনোভাব সৃষ্টি হয়। অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ অবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয় এবং এর ফলে মুসলমানগণ অমুসলিমদের মুকাবিলায় অধিক নিরাপদ থাকবে বলে মনে করা হয়।

৩। জামায়াতের তৃতীয় কাজ ছিল দুর্গতদের মধ্যে সাহায্য ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা। কর্মীদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা সাহায্য ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে শুধু দুর্গত মানবতাকে সামনে রাখবে মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে কোন ভেদাভেদ জ্ঞান না করে। কোন অমুসলিম যদি সাহায্যের হকদার হয়, তাহলে তাকেও সাধ্যমত সকল প্রকার সাহায্য করবে। যারা দুর্গত হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের রিলিফ নিতে চান না, তাঁদের অনুসন্ধান করে বের করে তাদের সাহায্য বা ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছিয়ে দিতে হবে বলেও কর্মীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়।

www.pathagar.org

এসব যাবতীয় কাজের দায়িত্বশীল করা হয় জনাব আবদুল জাব্বার গাজীকে। তিনি কেন্দ্রের নির্দেশ এবং স্থানীয় কর্মীদের সহযোগিতায় পাটনায় রিলিফের কাজ শুরু করেন। কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ শিবিরও পাটনায় স্থানান্তরিত করা হয়। কারণ মজলুম মানবতার সাহায্য করা থেকে তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণের বৃহত্তর ময়দান আর কি হতে পারে? অতঃপর সারা দেশ থেকে বাছাই করা কর্মী এক এক মাস করে তরবিয়ত ও রিলিফ কাজের জন্য পাটনা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে আসা শুরু করেন। পরে তরবিয়তের উদ্দেশ্যে কেন্দ্র থেকে মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীকেও পাটনা পাঠানো হয়। এ কাজ ভারত বিভক্তির সময় পর্যন্ত চলতে থাকে।

এ সময়ে ক্রমবর্ধমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও জামায়াত কর্মীদের ভূমিকা পর্যালোচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠক আহ্বান করা হয় এবং যাবতীয় কাজ পর্যালোচনার পর জামায়াতে ইসলামী যে নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারিত করে তা সার্কুলার আকারে সকলকে জানিয়ে দেয়া হয়। সার্কুলারে নিম্নোক্ত বিষয়ে হেদায়েত দান করা হয় ঃ

১। সাধারণত দাঙ্গা পরিস্থিতিতে জামায়াতের রুকনদের আপন নিরাপত্তার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে আপন নৈতিক আচরণ এবং জাতীয় ও বংশীয় সংকীর্ণতার উর্ধে থেকে মঙ্গল ও কল্যাণের কার্যত দাওয়াত দান। এ ব্যাপারে রুকনগণ যতোবেশী সত্যনিষ্ঠ ও হিতাকাঙ্ক্ষী প্রমাণিত হবেন এবং যতোবেশী কল্যাণকর কাজ করতে ও তার আহ্বান জানাতে তৎপর হবেন, ততোবেশী দাঙ্গার দাবানল থেকে তাঁদের নিজেদেরকে নিরাপদ রাখা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। অন্যথায় ততোবেশী বিপদের সম্মুখীন তাঁরা হতে পারেন।

২। কোন রুকনে জামায়াত যদি শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁকে আক্রমণকারীদেরকে যথাসাধ্য সদুপদেশ দান করতে হবে। তা ব্যর্থ হলে অথবা তার সুযোগ না হলে আত্মরক্ষার জন্য শত্রুর উপর তিনি আক্রমণ করতে পারেন। তাঁর হাতে শত্রু মৃত্যুবরণ করলে তিনি খোদার কাছে দায়ী হবেন না। আর আত্মরক্ষাকারী স্বয়ং মারা গেলে ইনশাআল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবেন।

৩। কোন রুকনে জামায়াতের সামনে হিন্দু অথবা মুসলমানের কোন দলকে কোন ব্যক্তির উপর আঘাত করতে দেখলে তাকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। তাকে রক্ষা করতে নিজের জীবন বিপন্ন হলেও তা করা উচিত।

৪। দাঙ্গাচলা অবস্থায় কোন ব্যক্তি অথবা পরিবার যদি বিপন্ন হয়ে পড়ে, সে ব্যক্তি বা পরিবার মুসলমান হোক অথবা অমুসলমান, অথবা তারা আশ্রয়প্রার্থী হোক বা না হোক, নিজের চেষ্টায় সে ব্যক্তি বা পরিবারকে আশ্রয় দিতে হবে। তারপর নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও তার হেফাযত করতে হবে।

www.pathagar.org

৫। দাঙ্গাকালে যখনই এবং যেখানেই সুযোগ হয় জনসাধারণকে এবং সুযোগ হলে দাঙ্গায় উত্তেজনা সৃষ্টিকারীদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করতে হবে, তাদেরকে খোদার ভয় দেখাতে হবে, মুসলমান হলে তাকে দ্বীনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং তা হাসিলের সঠিক পন্থা বলে দিতে হবে। তাদের কাছে একথা সুস্পষ্ট করে দিতে হবে যে, জাতীয় সংঘাত-সংঘর্ষ এবং তার জন্যে এ ধরনের হত্যাকাণ্ড কিছুতেই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নয়, অমুসলিম হলে তাকে জাতীয়তাবাদের ভয়াবহ পরিণাম বলে দিতে হবে।

এ সময়ে জামায়াতে ইসলামী দাঙ্গার বিরুদ্ধে বহুল পরিমাণে প্রচারপত্র প্রকাশ করে বিতরণ করে। জাতিপূজার বিষ খতম করার এবং মানুষের মধ্যে মানবতার অনুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করে। কিন্তু জামায়াতের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মানুষ যেন মানবতার স্তর থেকে পশুত্বের নিম্নতম স্তরে নেমে এসেছে। তথাপি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় জামায়াত কর্মীগণ তাদের যথার্থ নৈতিক দায়িত্ব পালন করেন।

দারুল ইসলাম, পাঠানকোট

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় দফতর জেলা গুরুদাসপুরের পাঠানকোট শহর থেকে চার মাইল দূরবর্তী সার্না রেলস্টেশনের সন্নিকট চারিদিকে অমুসলিম জনপদ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। বছরের শুরু থেকেই দাঙ্গা-হাঙ্গামার আগুন জ্বলে উঠেছিল এবং সংখ্যালঘু জনপদগুলোর মজলুমগণ সর্বস্ব পরিত্যাগ করে সংখ্যাগুরু জনপদগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছিল। সরকারী প্রশাসনযন্ত্র একেবারে বিকল হয়ে পড়ে। যানবাহন চলাচলও ব্যাহত হয়। একজন-দুজন পথ চলাকালে আক্রান্ত হতে থাকে।

অবশেষে দাঙ্গা-হাঙ্গামার লেলিহান শিখা দারুল ইসলামের বস্তি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। তেসরা জুন ভারত বিভাগ ঘোষণার পর সমগ্র পাঞ্জাবে ব্যাপক আকারে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। আগস্ট পর্যন্ত গোটা পাঞ্জাব এক জাহান্নামের রূপ ধারণ করে। চারদিকে শুধু হত্যা, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ এ অঞ্চলে মানুষের নয়, হিংস্র পশুর রাজত্ব কায়েম করে। ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান অস্তিত্ব লাভ করবে বলে ঘোষণা করা হয় এবং গুরুদাসপুর জেলা-যার মধ্যে দারুল ইসলাম ও জামায়াতের কেন্দ্রীয় দফতর অবিস্থত-পাকিস্তানের মধ্যে শামিল করা হয়। কিন্তু ১৭ই আগস্ট বাউন্ডারী কমিশন (Boundary Commission) এ জেলাকে পুনরায় ভারতের মধ্যে শামিল বলে ঘোষণা করে। কমিশনের পক্ষ থেকে এ ছিল রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার নিকৃষ্টতম বহিঃপ্রকাশ। পরিবর্তিত ঘোষণার কোন কারণ বর্ণনা করা হয়নি। তবে ভারতের জন্যে কাশ্মীরে পৌঁছার পথ যে সুগম করাই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল তা আর কারো বুঝতে বাকী রইলো না।

www.pathagar.org

বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ জাতি বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার জাল বিস্তার করে এ দেশে তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করে এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার ছাপ রেখেই তারা একশ নব্বই বছর পর এ দেশ ত্যাগ করে। এ বিশ্বাসঘাতকতা শুধু মুসলমানদের প্রতি আলোচনার টেবিলে হেরে গিয়ে পাকিস্তানের স্বীকৃতিদানের ছিল প্রতিশোধ গ্রহণ।

এ অমানুষিক দাঙ্গা পরিস্থিতি কোন অপরাধের ভিত্তিতে নয়, বরঞ্চ জাতীয়তার দর্শনের ভিত্তিতে মুসলমানকে হিন্দুর এবং হিন্দুকে মুসলমানের দুশমন বানিয়ে দিয়েছিল। একে অপরের এতোটা রক্তপিপাসু হয়ে পড়ে যে, তাদের হাত থেকে নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও রোগী কেউই রেহাই পায়নি। ওসব মুসলমানও হিন্দু ও শিখদের কাছে ক্ষমার যোগ্য রইলো না, যারা আপন জাতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সহযোগিতা করছিল।

এদিক দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর পজিশন ছিল সবচেয়ে নাজুক। জাতীয় বিদ্বেষের এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে একটি মুসলমান দল হিসেবে অমুসলিমদের সম্বোধন করে তাদেরকে মানবতার, ভদ্রতার ও সুবিচারের দাওয়াত দেয়ার সুযোগ আর তার ছিল না। ওদিকে মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি এ দলের আদর্শগত সমর্থন থাকা সত্ত্বেও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে তাদের থেকে ঠিক তেমনি দূরে অবস্থান করছিল যেমন কংগ্রেসের দেশ মাতৃকার পূজার আন্দোলন থেকে দূরে ছিল। সেজন্য যারা ইসলামের মৌলিক নীতি উপলব্ধি করতো এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল এমন নগণ্য সংখ্যক লোক ব্যতীত অবশিষ্ট সকলে জামায়াতের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এ দিনগুলো ছিল জামায়াতে ইসলামীর চরম অগ্নি-পরীক্ষার দিন, যখন আপন-পর উভয়েই তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এ অসন্তুষ্টির কারণ এই ছিল যে, সে সিদ্ধান্ত করেছিল-

- আমরা খোদার বান্দাদেরকে দাঙ্গা-ফাসাদ থেকে নিরস্ত করে ইনসাফ ও কল্যাণের দাওয়াত দেব-
- দাঙ্গায় আমরা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মজলুমের সহায়তা করব এবং জালেমকে জুলুম থেকে রুখবো।

এ নীতি উভয়ের কাছে ছিল অপছন্দনীয় ও অগ্রহণযোগ্য।

দারুল ইসলাম বস্তির অতি বেদনাদায়ক দৃশ্য

অবশেষে দাঙ্গা-ফাসাদের সমুদ্রে দারুল ইসলাম বস্তি একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের আকার ধারণ করলো। কেন্দ্রীয় জামায়াতের বিশজন দায়িত্বশীল কয়েকটি প্রতিনিধিদলে বিভক্ত হয়ে পার্শ্ববর্তী বস্তিগুলোতে গিয়ে দৈনিক মানবতার প্রেরণা জাগ্রত করার চেষ্টা করতে থাকেন। এসব বস্তির অধিকাংশই ছিল শিখদের।

www.pathagar.org

বাইশে আগস্ট পাঠানকোট শহর মুসলমানশূন্য হয়ে পড়ে। তারা সব রেলষ্টেশনের নিকটে ভেড়া-ছাগলের মতো খোলা মাঠে পড়ে থাকে। পাঠানকোট মুসলমানশূন্য হওয়ার পর আশপাশের পল্লী অঞ্চল থেকে ছিন্নমূল মুসলমান নারী-পুরুষ জামায়াতে ইসলামীর দফতরে এসে আশ্রয় নিতে থাকে। কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের সংখ্যা তিন হাজার অতিক্রম করে। তাদের নিরাপত্তা, খোরাক-পোশাক ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাপনা জামায়াতের ঘাড়ে চাপে কারণ তারা ছিল আশ্রয়প্রার্থী। গ্রামাঞ্চল থেকে তাদের জন্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা এবং রেশনের মাধ্যমে তা গোটা ক্যাম্পে তাদের মধ্যে বিতরণ করা জামায়াতকর্মীদের অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। আশপাশের কিছু সম্ভ্রান্ত অমুসলিম নিজেদের গ্রামের মুসলমানদেরকে তাঁদের তত্ত্বাবধানে জামায়াতে ইসলামীর ক্যাম্পে পৌঁছিয়ে দেন।

জামায়াত কর্মীগণ ক্যাম্পের চার ধারে সামরিক কায়দায় মোর্চা (পরিখা) খনন করেন এবং পাহারার ব্যবস্থা করেন যাতে করে বাইরের সকল প্রকার হামলা প্রতিহত করা যায়। দু'টি বন্দুক ও লাঠিসোটাসহ রাতদিন দারুল ইসলাম বস্তির পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। এ যেন একেবারে যুদ্ধের ময়দান এবং মাওলানা মওদূদী সার্বক্ষণিক সেনাধ্যক্ষের ভূমিকা পালন করেন।

চব্বিশে আগস্ট রাতে ক্যাম্পে হামলার গুজব শুনা যেতে লাগলো যে, কয়েকশ' হিন্দু ও শিখ অস্ত্রশস্ত্রসহ দারুল ইসলাম বস্তি হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। মাওলানা আল্লাহর উপর সোপর্দ করে মিয়া তুফাইল মুহাম্মদকে দুজন সঙ্গীসহ শিখ নেতা জায়গির সিং ও চুনীলাল সিং-এর নিকটে পাঠিয়ে দেন। পরিপূর্ণ শিখ বস্তির সশস্ত্র লোকজনের ভেতর দিয়ে মাত্র তিনজন নিরস্ত্র মুসলমান শিখ নেতাদের বাড়ী পৌঁছেন। তাঁদেরকে দেখে তাঁরা অতীব আশ্চর্যান্বিত হয়ে পড়েন।

জামায়াত নেতাগণ নির্ভীক চিত্তে বললেন, শুনলাম, আপনারা নাকি দারুল ইসলাম আক্রমণ করতে চান। এ কথা সত্য হলে তার কারণ কি?

মাওলানা মওদূদী ও দারুল ইসলামের বাসিন্দাদের নিষ্কলুষ চরিত্র পূর্ব থেকেই তাঁদের মনে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। এখন এঁদের নির্ভীকতায় তাঁরা মুগ্ধ হলেন এবং আশ্বাস দিয়ে নিরাপদ স্থান পর্যন্ত তাঁদেরকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

এদিকে গুজব এতো প্রবল যে, সকলে এ ব্যাপারে প্রায় একমত যে, আজ রাতে (২৪শে আগস্ট) দারুল ইসলামের উপর হামলা একেবারে নিশ্চিত। এরূপ আশঙ্কার প্রধান কারণ এই যে, জামায়াতের জনৈক রুকন এবং দারুল ইসলামের বাসিন্দা জনাব আবদুর রহমান আশ্রয়প্রার্থী পরিবারদের নিকটস্থ একটি গ্রাম থেকে তাদের কিছু মালপত্র আনার জন্য তাদের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে ফিরে আসতে পারেননি। অনেক অনুসন্ধানের পর শস্যক্ষেতের মধ্যে তাঁর লাশ পাওয়া যায় যা

www.pathagar.org

কৃপাণের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ছিল। এতে করে মনে হয়েছিল, জামায়াতে ইসলামীর অনুপম চরিত্র ও প্রশংসনীয় ভূমিকার যে প্রভাব অমুসলিমদের উপর ছিল তা এখন শেষ হয়ে গেছে। অতএব, মাওলানা মওদূদী দারুল ইসলামের মহিলাদেরকে সম্বোধন করে বলেন-

"হয়তো দারুল ইসলামবাসীদের জীবনের আজ শেষ দিন। এ অবস্থায় যতোক্ষণ পর্যন্ত আমাদের একজন পুরুষও বেঁচে থাকবে দুশমন ইনশাআল্লাহ তোমাদের নিকট পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু খোদা না করুন, পুরুষ যদি খতমই হয়ে যায় তাহলে তোমাদেরকে মুমিন নারীদের মতো লড়াই করেই মরতে হবে। না তোমাদের আত্মহত্যা করা চলবে, আর না জীবিত অবস্থায় কারো কাছে আত্মসমর্পণ করবে। যে হামলা করতে আসবে তার মুকাবিলা করবে এবং আপন ইজ্জতের জন্যে লড়াই করে জান দিবে।"

অতঃপর তাঁদেরকে লড়াইয়ের কিছু সরঞ্জাম দিয়ে দেন এবং কৌশল ও হিকমত শিখিয়ে দেন।

কেন্দ্রীয় জামায়াত লাহোরে স্থানান্তরিত

চৌব্বিশে রাত ভয়ে ভয়ে ও নিরাপদেই কেটে গেল বলে সকলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। ২৫শে আগস্ট বিকেল বেলা লাহোর থেকে কিছু জামায়াতকর্মী একটি কন্‌ভয়ে দুটি বাসসহ দারুল ইসলাম পৌঁছেন। এ কন্‌ভয় মাত্র আধ ঘণ্টার জন্যে এসেছিল-জামায়াতের দায়িত্বশীলগণ এমন একটি আশ্রয় শিবির ছেড়ে যেতে কিছুতেই রাজী হলেন না যেখানে তিন হাজারেরও বেশী লোক রয়েছে। অতএব, জামায়াত কর্মীদের শুধু মহিলা ও শিশুদেরকে এ বাস দুটিতে করে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

জীবনের আশঙ্কা তীব্রতর হচ্ছিল বলে পদব্রজে কাফেলা রওয়ানা করা হবে কিনা এ নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছিল এমন সময় সেনাবাহিনী ২৯শে আগস্ট সন্ধ্যায় আশ্রয় শিবিরের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এভাবে ক্যাম্প রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থেকে জামায়াতকর্মীগণ মুক্ত হন। ঐ দিনই আর একটি ফৌজী কাফেলাসহ (Military Convoy) জনাব আবদুল জাব্বার গাজী তিনখানা বাস নিয়ে দারুল ইসলাম পৌঁছেন। দারুল ইসলাম থেকে জামায়াতের কেন্দ্রীয় দফতর ও তার দায়িত্বশীলগণকে লাহোর স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত করা হয় এবং তদনুযায়ী পরদিন ৩০শে আগস্ট সকাল আটটায় লাহোরের পথে জামায়াত নেতৃবৃন্দ রওয়ানা হয়ে যান। আশ্রয় প্রার্থীদের মনোবল উন্নত রাখার জন্যে এবং জামায়াতের মূল্যবান মালপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে মাত্র তিনজন কর্মীকে রেখে যাওয়া হয়। তাঁরা হচ্ছেন সর্বজনাব ইহসানুল হক, আযম হাশেমী ও মুহাম্মদ হামেদ।

www.pathagar.org

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, যে সব মালপত্র ছেড়ে যাওয়া হয়েছিল তা আর কোনাদন পাওয়া গেল না। তার মধ্যে ছিল তর্জুমানুল কুরআনের বিরাট ভাণ্ডার, জামায়াতের লাইব্রেরী, যার মধ্যে তৎকালীন এগারো হাজার একশ আঠার টাকা চার আনা মূল্যের বই পুস্তক ছিল, আমীরে জামায়াতের নিজস্ব লাইব্রেরী, যার বহু মূল্যবান-গ্রন্থ এখন একেবারেই দুস্প্রাপ্য। তাছাড়া ছিল দারুল ইসলামের গোটা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, অন্যান্য বহু আসবাবপত্র, যার তৎকালীন মূল্য সত্তর হাজার টাকারও অধিক ছিল।

মাওলানা মওদূদী ও অন্যান্য জামায়াত নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ ঐ দিনই সন্ধ্যে নাগাদ লাহোর পৌঁছে যান। লাহোর স্থানান্তরিত হওয়ার পর মাওলানা ও তাঁর সহকর্মীদের মাথা গুঁজবার প্রশ্ন বড়ো হয়ে দাঁড়ালো। তাঁদের জন্যে সরকার পক্ষ থেকে একখানা বাড়ী বরাদ্দ করার ২৪ ঘন্টা পর তা ফেরত নেয়া হয়। মাওলানা তাঁর সহকর্মীদেরকে নিষেধ করে দেন তাঁরা যেন সরকারী বরাদ্দকৃত কোন বাড়ী না নেন। অতঃপর তারা ইসলাম পার্কের খোলা ময়দানে ছোট ছোট তাঁবু খাটিয়ে মাথা গুঁজলেন।*

---

* এমনটি হলো কেন? মাওলানা মওদূদী কি তখন কোন অজ্ঞাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন? গোটা লাহোর শহরে যেখানে হাজার হাজার মূল্যবান কুঠি ও বাড়ীঘর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল, তার একটিও তাঁর ও তাঁর সহকর্মীদের জন্যে পাওয়া গেল না? একটি বরাদ্দ করে ২৪ ঘন্টার পর তা আবার ফেরত নেয়া হলো! এ সবের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যতোটা আমার মনে হয়েছে তা হলো এই যে, সাতচল্লিশের চৌদ্দই আগস্টের পর বলতে গেলে কয়েক মাস যাবৎ কোন সুস্থ মস্তিষ্ক সরকারই পাকিস্তানে ছিল না।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, কলকাতা শহর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে ঢাকাকেই পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের রাজধানী করা হলো। আমি ছিলাম একজন সরকারী কর্মচারী (অফিসার)। কোলকাতা থেকে বাড়ী হওয়ে ঢাকা পৌঁছতে দিন পনেরো বিলম্ব হলো। পৌছে যা দেখলাম তাতে বিস্মিত হলাম, মর্মাহত হলাম, হতাশাগ্রস্ত হলাম। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে রাষ্ট্র হাসিল করা হলো তার ওই অবস্থা? যেন মালে গনীমত নিয়ে মারামারি, কাড়াকাড়ি, স্বজনপ্রীতি-দুর্নীতি ও লুটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। ছোট-বড়ো প্রায় সকল হিন্দু কর্মচারী চাকুরী ছেড়ে ভারতে পাড়ি দিয়েছেন। তাঁদের শূন্য পদগুলো কে কতটা দখল করতে পারে তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা, আদর্শ ও চরিত্রহীন অফিস কর্মকর্তাগণ ও রাজনৈতিক দলের নেতা ও হোমরাচোমরাগণ পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। নতুন-পুরাতন ও অফিসগুলোতে কোন যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিচার না করেই লোক নিয়োগ করা হয়। একেবারে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিয়েও ঐ একই অবস্থা। চরিত্রহীন বিলাসী রাজপুত্র সিংহাসনে আরোহণকালে সাধারণত তার যা পরিণাম হয়, পাকিস্তানেরও সেই পরিণামের আশঙ্কা করলাম। জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে কোন ধারণা থাকলে সে কাজেরই সূচনা করতাম। কিন্তু চুয়ান্ন সালের ডিসেম্বরের আগে জামায়াতে ইসলামীর কোন নামগন্ধই আমার জানা ছিল না। তাই পঞ্চান্নের শুরুতেই জামায়াতের কাজের সূচনা করি আমার আপন স্থানে যখন আমি একটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক- গ্রন্থকার।

www.pathagar.org

এ সময়ে ছিন্নমূল জামায়াতকর্মীদের নিয়ে মাওলানা মওদূদী দুটি অভিযান শুরু করেন- শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মুহাজিরদের সেবা। এ সময়ে শহরের বহু স্থানে যে দুর্গন্ধময় আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়েছিল, তা মহামারী রোগেরই বার্তা বহন করছিল। জামায়াতকর্মীগণ মুচি দরজা ও ভাটি দরজার আবর্জনা অপসারণের কাজে লেগে যান।

মুহাজিরদের সেবার জন্যে একটি দল সীমান্তে নিয়োজিত করা হয় এবং অপর দুটি দল ওয়াল্টন ও বাউলি ক্যাম্পে অবস্থানকারী মুহাজিরদের প্রয়োজন পূরণে আত্মনিয়োগ করে।

মোট কথা, মাওলানা মওদূদী তাঁর বহু সঙ্গীসাথীসহ লাহোরে হিজরত করে সরকার বা জনগণের শরণার্থী না হয়ে আগত অন্যান্য মুহাজিরদের সেবার ভেতর দিয়েই পাকিস্তানে তাঁর কাজের সূচনা করেন। তাঁর সারা জীবনের সকল প্রকার নিঃস্বার্থ খেদমত যদি পাকিস্তানবাসী গ্রহণ করে নাও থাকে, তাতে তাঁর কোন পরোয়া নেই।

দারুল ইসলামের অন্যতম ব্যক্তিত্ব মরহুম সাইয়েদ নকী আলী বলেন,

"জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাসে সাতচল্লিশের আগস্ট মাসটি ছিল একটি স্মরণীয় মাস। আমরা ভাবছিলাম-

(ক) ষোলটি পরিবারের ছোটো ছোটো চল্লিশটি কামরায় তিন হাজারেরও বেশী আশ্রয়প্রার্থী কিভাবে রইলেন।

(খ) কিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের খানাপিনার ব্যবস্থা করলেন?

(গ) মারাত্মক ধরনের আহত ব্যক্তিগণ-যাদের ক্ষতে পোকা হয়েছিল মামুলি ঔষধপত্রে কিভাবে আল্লাহর কুদরতে আরোগ্য লাভ করেন?

(ঘ) এমন বিরাট সংখ্যক আশ্রয় প্রার্থীদের অগণিত সমস্যার সমাধান কতিপয় নগণ্য ব্যক্তি কিভাবে করলেন?

(ঙ) দারুল ইসলামের বাসিন্দাদের নৈতিক প্রভাব বিরাট শক্তিশালী দুশমনের মনকে কিভাবে ভীতবিহ্বল করেছিল যে, তারা সকল প্রকার প্রস্তুতি ও সংকল্প সত্ত্বেও দারুল ইসলামের উপর হামলা করার সাহস পেলো না?

এ সবই আল্লাহ তায়ালার খাস রহমত ও মোজেযা। তাই এ মাসটি সত্যিই জামায়াতে ইসলামীর একটি অতি স্মরণীয় মাস।

জামায়াতে ইসলামী দু'ভাগে বিভক্ত

দেশ বিভাগের ফলে জামায়াতে ইসলামী দু'ভাগে বিভক্ত হয়- জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও জামায়াতে ইসলামী হিন্দ্। উভয় দেশের জামায়াতের ভবিষ্যত কর্মসূচীও আগাম আমীরে জামায়াত ঘোষণা করেছিলেন। এখন থেকে উভয় জামায়াত তাদের পৃথক পৃথক কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে। বিভাগ-পূর্বকালে নিখিল ভারত জামায়াতের মোট রুকন সংখ্যা ছিল ৬২৫। তার মধ্যে ২৪০ জন ভারতে রয়ে যান এবং ৩৮৫ জন নিয়ে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কাজ শুরু হয়।

www.pathagar.org

চতুর্দশ অধ্যায়

জামায়াতের সাহিত্য সৃষ্টি

এ সময় পর্যন্ত মাওলানা মওদূদী আন্দোলনের উপযোগী যে সাহিত্য রচনা করেন তা নিম্নরূপ ঃ

১৯৩৩- (১) ইসলামী তাহযীব আওর উসকে আসুল ও মুবাদী
(২) মাসআলায়ে জাবর ও কাদর

১৯৩৪- (১) তানকীহাত (২) তাফহীমাত

১৯৩৫- (১) হককুয্ যাওজাইন
(২) ইসলাম আওর যবতে বেলাদাত

১৯৩৬-৩৭ (১) দ্বীনিয়াত (২) সুদ (৩) পর্দা

১৯৩৮- (১) খোতবাত

১৯৩৯- (১) মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ- (১৯৩৭ সালে শুরু করে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত তিন খণ্ডে সমাপ্ত)।
(২) ইসলাম কা নাযরিয়ায়ে সিয়াসী
(৩) ইসলামী ইবাদাত পর তাহকীকী নযর

১৯৪০- (১) তাজদীদ এ এহইয়ায়ে দ্বীন
(২) ইসলামী হুকুমত কিস তরাহ কায়েম হুতি হ্যায়?
(৩) এক আহম ইস্তেফতা

১৯৪১- (১) কুরআন কি চার বুনিয়াদী ইসতিলাহ
(২) ইসলাম আওর জাহেলিয়াত
(৩) নয়া নিযামে তালীম
(৪) ইনসানকা মায়াশী মসলা আওর উসকা হাল্

১৯৪২- সালামতি কা রাস্তা-

১৯৪৩- (১) দ্বীনে হক (২) মুরতাদকি সাযা ইসলামী কানুন মেঁ

১৯৪৪- (১) ইসলাম কা আখলাকী নোকতায়ে নযর
(২) হাকীকাতে শির্ক (আমীন আহসান ইসলাহী)

১৯৪৫- (১) হাকীকাতে তাওহীদ
(২) তাহরীকে ইস্‌লামী কি আখলাকী বুনিয়াদেঁ
(৩) দাওয়াতে ইসলামী আওর উসকে মুতালিবাত

১৯৪৬- (১) শাহাদাতে হক
(২) দাওয়াতে দ্বীন আওর উসকে তারিকে কার

১৯৪৭- (১) জামায়াতে ইসলামী কি দাওয়াত
(২) বানাও আওর বিগাড়
(৩) হাকীকাতে তাকওয়া
(৪) হিন্দুস্তান মেঁ তাহরীকে ইসলামী কা আয়েন্দা লায়েহায়ে আমল।
(৫) পাকিস্তান মেঁ তাহরীকে ইসলামী কা আয়েন্দা লায়েহায়ে আমল।

www.pathagar.org

জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন, এর সংগঠন, কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি, জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার তৈরী বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডার, ইসলামী মন-মস্তিষ্ক ও চরিত্র তৈরীর জন্যে স্থায়ী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, জামায়াতের বাস্তব ভূমিকা প্রভৃতি থেকে তার যে বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে সে সম্পর্কে কিছু কথা পাঠক সমাজের কাছে পেশ করতে চাই।

১। এ জামায়াতের দাওয়াত আকীদাহ-বিশ্বাস ও লক্ষ্যের দিকে, কোন ব্যক্তিত্বের দিকে নয়।

২। এ জামায়াতের গঠন-প্রকৃতি কোন সংকীর্ণ ফের্কার মত নয়। জামায়াতের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট ঘোষণা যে, আমাদের পক্ষ থেকে এ দাবী কখনো করা হবে না যে, ইসলাম শুধু এ জামায়াতের পরিসীমার মধ্যেই রয়েছে।

৩। গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, জামায়াতে অংশগ্রহণকারীকে এ কথা বলে দেয়া হয়- জামায়াতের দাওয়াত, কর্মসূচী ও লক্ষ্য পূর্ণ অনুভূতি সহকারে বুঝে নিয়ে জামায়াতে যোগদান করুন। বিভিন্ন প্রকার ধ্যান-ধারণা, স্বার্থ ও ইচ্ছা-বাসনা পরিত্যাগ করে একমাত্র 'একামতে দ্বীনের' মহান কাজে একনিষ্ঠ হয়ে যান।

৪। প্রত্যেকের বুনিয়াদী কাজ এই যে, সে তার দ্বীনী ইলম বাড়াতে থাকবে এবং নিজের ইস্‌লাহ করার সাথে সাথে হকের দাওয়াত ভালোভাবে এবং হৃদয়গ্রাহী করে অন্যের কাছে পৌঁছাবে। এ সম্পর্কিত সাহিত্য লোকের মধ্যে বিতরণ করবে।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জামায়াতের প্রাথমিক কর্মীগণ এ ব্যাপারে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, পরিচিত-অপরিচিত লোক, অফিস-আদালত ও কল-কারখানার সঙ্গী-সাথীদের দ্বারে দ্বারে গিয়েছেন এবং নিষ্ঠার সাথে ইসলামী দাওয়াত পেশ করেছেন। সাথে বই-পুস্তক নিয়ে বস্তি বস্তি ঘুরেছেন। কোথাও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কোথাও মাওলানার প্রতি গালি বর্ষিত হয়েছে। কেউ কথা শুনেছে, কেউ শুনতেই চায়নি। তাঁদের এ নিঃস্বার্থ শ্রমের জন্যে আজ দাওয়াতের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হয়েছে। বিপ্লবী কাজের এই তো কর্মপদ্ধতি-যার কোন বিকল্প নেই। এ কাজ তো সকল সময় সকল অবস্থাতেই করা যায়। শুধু প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্প ও সৎ সাহসের। জামায়াতকর্মীদের এই তো উন্মাদনাসুলভ কাজ, যার অভাব ঘটলে আর কর্মী থাকা যায় না। শুধু তাই নয়, ঈমান ও আখলাকের দিক দিয়েও অধঃপতন হয়। যাঁরা এ কাজ অব্যাহত গতিতে করে চলেছেন, তাঁরাই হচ্ছেন এ আন্দোলনের মূলধন।

৫। জামায়াতের সাংগঠনিক কাঠামো এভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, দায়িত্বশীলগণ সর্বদা অন্যান্যদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করবেন। কেউ স্বয়ং কোন পদপ্রার্থী হওয়ার চেষ্টা করতে পারবে না। এখানে নির্বাচনে কেউ পদপ্রার্থী হতে পারে না।

৬। সাংগঠনিক পরিমণ্ডলের ভেতর একে অপরের বিরুদ্ধে গোপন পরামর্শ, ক্যানভাসিং অথবা উপদল গঠন একেবারে নিষিদ্ধ।

৭। সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তর আছে। তার সর্বনিম্ন বুনিয়াদী স্তর বা ইউনিট-স্থানীয় জামায়াত। এখানে সাপ্তাহিক বৈঠক হয়, কুরআন-হাদীসের

www.pathagar.org

আলোচনা হয়, কাজের রিপোর্ট পেশ করা হয়, ভবিষ্যতের কর্মসূচী তৈরী হয়। কেন্দ্র থেকে প্রেরিত সার্কুলার বা হেদায়েত বৈঠকে আলোচনা করা হয়। স্থানীয় কাজকর্মের সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতিও আলোচনা করা হয়।

৮। জামায়াতের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তার দাওয়াত, সংগঠন, সভা-সমিতি এবং বিভিন্ন তৎপরতার জন্যে যে অর্থ ব্যয় হয় তা সংগঠনের ভেতর থেকেই সংগ্রহ করা হয়, বাইরের কোন সাহায্য নেয়া হয় না। তবে জামায়াতের কাজে মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় কোন শুভাকাঙ্ক্ষী কিছু দিলে তা গ্রহণ করা হয়। অথবা কোন সমাজসেবামূলক কাজে, যেমন আর্ত-দুর্গতদের ত্রাণ কাজে, কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থে অর্থ বা ত্রাণ সামগ্রীর প্রয়োজন হলে তার জন্যে অপরের কাছে আবেদন জানানো যেতে পারে। তাতে তার জন্যে পাকা রসীদ দিয়ে অর্থ গ্রহণ করা হয় এবং যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করে দেয়া হয়।

জামায়াতের যাবতীয় খরচপত্রের দায়িত্ব জামায়াতকর্মীদের উপরই অর্পণ করা হয়, এর ফলে তাদের মধ্যে আল্লাহর পথে অকাতরে অর্থ বিলিয়ে দেয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। তাছাড়া প্রতিটি কর্মী নিষ্ঠার সাথে প্রতিটি কপর্দক ব্যয় করেন। যার ফলে যে কাজ অন্যের দ্বারা করতে যে অর্থ ব্যয় হয়, তার অনেক কম অর্থে অতি সুন্দরভাবে জামায়াতকর্মীগণ সুসম্পন্ন করেন।

৯। সংগঠনের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা আছে। পরিপূর্ণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ ব্যবস্থা চালানো হয়। কুরআন-হাদীস এবং ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে, প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে, দাওয়াত ছড়াবার মাধ্যমে এবং প্রত্যক্ষ বাতিল শক্তির অত্যাচার-উৎপীড়নের মাধ্যমে উন্নতমানের মানসিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ লাভের এক অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক ব্যবস্থা রয়েছে জামায়াতে।

১০। সময়ানুবর্তিতা জামায়াতের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ঠিক পূর্ব ঘোষিত সময়ে সভা-সম্মেলন ও বৈঠকাদির কাজ শুরু করা এবং অন্যান্য সকল প্রকার জরুরী বৈষয়িক কাজ-কর্ম ফেলে সংগঠনের ডাকে যথাসময় হাজির হওয়া জামায়াতের অসাধারণ শৃঙ্খলাবোধের পরিচায়ক।

১১। জামায়াতের নিজস্ব একটা ভাষণদান পদ্ধতি রয়েছে। ভাষণের মধ্যে সুর করে কোন কবিতা, গজল, আবৃত্তি, হাস্যরসাত্মক কোন কথা, অশালীন অথবা অবান্তর, ভিত্তিহীন কোন উক্তি জামায়াতের মঞ্চ থেকে বলা হয় না। বক্তা তাঁর বক্তব্য পূর্ব থেকে তৈরী করে যান এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তাঁর তথ্যপূর্ণ ভাষণ দান করেন। ভাষণকে যথাসাধ্য হৃদয়গ্রাহী করার চেষ্টা করেন এবং শ্রোতার দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট করেন। ভাষণের মধ্যে শব্দের বাগাড়ম্বর থাকে না, হাস্যরসের খোরাক থাকে না, থাকে চিন্তার খোরাক। তাই জামায়াতের বক্তৃতার ধরন সমাজে চিরাচরিত বক্তা, ওয়ায়েযীন থেকে ভিন্ন ধরনের এবং শিক্ষিত চিন্তাশীলদের কাছে এ পদ্ধতি খুবই আকর্ষণীয়।

১২। জামায়াতের ইকামাতে দ্বীনের দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে যাঁরা আন্দোলনে যোগদান করেছেন, তাঁদের জীবনে এক বিপ্লব সৃষ্টি হয়েছে। অবৈধ রুজি-

www.pathagar.org

রোজগার বন্ধ করে দিয়েছেন। তার জন্যে অনেকে ব্যবসা ও চাকুরী ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। অবৈধ জীবিকা পরিত্যাগ করার পর সহাস্যে দারিদ্য বরণ করেছেন। শরয়িতবিরোধী সকল অভ্যাস পরিত্যাগ করেছেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং মাওলানা মওদূদী বলেন-

"আমরা যা কিছু সুফল লাভ করেছি তার মধ্যে বড়ো সুফল এই যে, আমাদের এ দাওয়াতের প্রভাব যেখানেই পৌঁছেছে, সেখানেই তা মৃত বিবেককে জীবিত করেছে এবং ঘুমন্তকে জাগ্রত করেছে। তার প্রথম প্রতিক্রিয়া এই যে, নফস তার আত্মসমালোচনা শুরু করেছে। পূর্বে সংকীর্ণ ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে হালাল-হারাম, পাক-নাপাক ও হক-নাহকের যে পার্থক্যবোধ ছিল তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে অনেক পরিমাণে ব্যাপকতর হয়েছে। পূর্বে দ্বীনী অনুভূতি এতোটা প্রাণহীন ছিল যে, অনেক চাঞ্চল্যকর বিষয়ও মনে কোন সাড়া জাগাতো না, এখন তা এতোটা তীব্র হয়ে পড়েছে যে, ছোটোখাটো বিষয়ও মনে আঘাত করে। .... চিন্তার বিচ্ছিন্নতা দূর হয়েছে, বেহুদা ও আজেবাজে অপ্রাসঙ্গিক কাজকর্মের প্রতি মন আসক্তিহীন হয়ে পড়েছে, জীবনের মূল ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে।

১৩। জামায়াতে ইসলামী শুরু থেকেই আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিত লোক এবং মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেমদের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করে আসছে। একজন আধুনিক শিক্ষিত লোক যেমন দ্বীনী ইলম থেকে বঞ্চিত থাকে, মাদ্রাসা পাস করে যাঁরা বের হন তাঁরা আবার আধুনিক জ্ঞান লাভের কোন সুযোগ পান না। জামায়াতে ইসলামী একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করছে। কুরআন, হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ একজন আলেম জামায়াতে শরীক হওয়ার পর ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে বাধ্য হন। ঠিক তেমনি একজন উচ্চ ডিগ্রীধারী আধুনিক শিক্ষিত লোক জামায়াতের সংস্পর্শ এসে কুরআন-হাদীস এবং বিভিন্ন ইসলামী জ্ঞান লাভের সুযোগ পান এবং আন্দোলনকে সর্বস্তরের লোকের মধ্যে ব্যাপকতর করার জন্যে উভয় প্রকারের জ্ঞান অপহার্য। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী একজন জামায়াতকর্মী যেমন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুরআন-হাদীসের উপর আলোচনা করতে পারে, তেমনি একজন শুধু কামেল পাস আলেম রাজনীতি ও অর্থনীরি উপরে সুধী সমাবেশে মনোজ্ঞ আলোচনা করতে পারে। তাছাড়া পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্জিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে দুটি বিপরীতমুখী জীবনদর্শন, রুচি ও মননশীলতা তৈরী করে- যার ফলে উভয়ের মধ্যে এক বিরাট দূরত্ব সৃষ্টি হয়- এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণও হয়, জামায়াতে ইসলামী উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধ করে দিয়েছে। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা, রুচি ও মননশীলতা একই খাতে প্রবাহিত করে দিয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের জন্যে এ ছিল এক অনিবার্য প্রয়োজন। জামায়াতে ইসলামী এ প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হয়ছে।

www.pathagar.org

পঞ্চদশ অধ্যায়

কাজের মূল্যায়ন

আদর্শিক সূচনা থেকে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা এবং তার ছ বছর পর দেশ বিভাগ পর্যন্ত তার সংগঠন, কর্মতৎপরতা, জনগণের মধ্যে তার দাওয়াতের প্রচার ও প্রসার, সাহিত্য রচনা, জনশক্তি গঠন প্রভৃতির মূল্যায়ন করলে তার কিছু বৈশিষ্ট্যময় সাফল্য চোখে পড়ে। তা নিম্নরূপ ঃ

১। একটি আদর্শিক দল হওয়া সত্ত্বেও যার সদস্যপদ চারিত্রিক গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল। দলটি ভারতের সর্বত্র অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। বেলুচিস্তান এবং বাংলা প্রদেশ ব্যতীত সর্বত্র প্রায় সকল উল্লেখযোগ্য শহরগুলোতে তার শাখা গঠিত হয়, যার সংখ্যা ছিল একশতের কাছাকাছি। তার আদর্শিক প্রভাবে অসংখ্য স্থানে এমন সব দাওয়াত প্রচারের প্রাথমিক ইউনিট গঠিত হয়, যেখানে কুরআন-হাদীসের দারসের মাধ্যমে ইসলামকে তার সত্যিকার রূপে মানুষের সামনে উপস্থাপনা, একজন মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সেই সাথে জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, দাওয়াত ও কর্মসূচী বর্ণনা চিন্তাশীল মুসলমানদের হৃদয়-মন আকৃষ্ট করতে থাকে।

২। তার সদস্যপদ বিশেষ নৈতিক গুণাবলীর শর্তাধীন হওয়া সত্ত্বেও এবং মান উত্তীর্ণ না হওয়ার কারণে অনেককে জামায়াত থেকে বহিষ্কৃত করার পরও অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার সদস্য সংখ্যা হয়-৬২৫। সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা লক্ষাধিক। একটি আদর্শিক দলের অল্প সময়ের মধ্যে এ অগ্রগতি আশাপ্রদ ও উৎসাহব্যঞ্জক সন্দেহ নেই।

৩। তার শূরায়ী নেযাম বা পরামর্শভিত্তিক ব্যবস্থা উন্নীত হয়ে কেন্দ্র থেকে নিম্ন পর্যায়েও বিস্তার লাভ করে। জেলা ও স্থানীয় জামায়াতগুলিতে জামায়াতের পদে অধিষ্ঠিত দায়িত্বশীলগণ পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত মজলিসে শূরার মাধ্যমে পরামর্শের ভিত্তিতে জামায়াতের কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

৪। জামায়াতে ইসলামী এ সময়ের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ থেকে ৪৪ খানারও অধিক বই প্রকাশ করে। এগুলোই ছিল জামায়াতে ইসলামীর আদর্শিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বুনিয়াদ। এ বইগুলো জামায়াতের চিন্তার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শন করে এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজেরও সহায়ক হয়। আদর্শিক হাতিয়ার হিসেবে বইগুলো কর্মীদের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। এ ধরনের প্রকাশনা বিভাগ দেশের অন্যান্য স্থানেও কায়েম করা হয় এবং ব্যাপক আকারে আদর্শভিত্তিক বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.org

৫। জামায়াতে ইসলামীর আদর্শের মুখপত্র হিসেবে কিছু কিছু পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশিত হতে থাকে। মাসিক তর্জুমানুল কুরআন ছাড়াও সাপ্তাহিত 'মুসলমান' এবং অর্ধ সাপ্তাহিক 'কাওসার' এবং এলাহাবাদ থেকে অর্ধ সাপ্তাহিক 'ইনসাফ', হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য থেকে আনওয়ার এবং রামপুর থেকে 'আলহাসানাত' প্রকাশিত হয়।

৬। জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদের প্রদত্ত মাসিক সাহায্য এবং পুস্তকাদি বিক্রয়লবদ্ধ অর্থের দ্বারা তার আর্থিক ব্যবস্থা কায়েম করে। বাইর থেকে কোন প্রকার চাঁদা অথবা এককালীন অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকে উক্ত দুটি সূত্র থেকে তার অর্থব্যবস্থা সুদৃঢ় করে। যারা সওয়াবের উদ্দেশ্যে জামায়াতকে আর্থিক সাহায্য দিতে চাইতো, তাদের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টাই জামায়াত করে।

৭। জামায়াতে ইসলামী তার সকল প্রকার কর্মতৎপরতার যাচাই পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট আদান-প্রদানের এমন এক সুনিপুণ ব্যবস্থা কায়েম করে যার সাহায্য দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে কর্মীদের কর্মতৎপরতার রিপোর্ট কেন্দ্রে পৌঁছে যেতো। এ সব রিপোর্টের মাধ্যমে সারা দেশে জামায়াতে ইসলামীর কর্মতৎপরতা, দাওয়াতের প্রচার-প্রসার ও তার অগ্রগতি অথবা প্রতিবন্ধকতা ও তার কারণ ইত্যাদির এক পূর্ণ চিত্র আমীরে জামায়াত এবং কেন্দ্রীয় পরিচালকদের সামনে ফুটে উঠতো। তার আলোকেই প্রয়োজন অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতো। কর্মীদের দুর্বলতা ধরা পড়লে তা সংশোধন করা হতো এবং বিভিন্নভাবে তাদের কাজে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হতো। এধরনের রিপোর্ট আদান-প্রদানের ব্যবস্থা অন্য কোন দলে নেই। জামায়াতে ইসলামীতে এ ব্যবস্থা থাকার কারণে কর্মীদের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য বলবৎ থাকে এবং কাজে অবহেলা প্রদর্শনের প্রবণতা দূর হয়।

৮। জামায়াতে ইসলামী সমাজ সংস্কারের ময়দানে মজবুত ও স্থায়ী ভিত্তির উপর কাজ করতে থাকে। জামায়াতে ইসলামীর কাজ কোন মওসুমী কাজ ছিল না যেমন অন্যান্য দলের হয়ে থাকে- যারা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কর্মতৎপর হয়ে উঠে এবং এসব শেষ হওয়ার পর তাদের আর কোন কাজ থাকে না। জামায়াতে ইসলামী তার চার দফা স্থায়ী কর্মসূচী অনুযায়ী চিন্তার শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে ব্যক্তিচরিত্র গঠন, সংগঠন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীবাহিনী গঠন, সমাজ সংস্কার ও নেতৃত্বের সংস্কার-সংশোধন সকল সময়ে তার কাজ অব্যাহত রাখে। কোন এক সময়েও জামায়াত কর্মীদের বিশ্রাম গ্রহণের কোন অবকাশ থাকে না। তাদের এ নিরলস ও বিরামহীন কাজের পশ্চাতে থাকে দ্বীনী প্রেরণা এবং প্রতিমূহূর্তের কাজকে তারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই করে থাকে।

৯। জামায়াতে ইসলামী তার নিজের শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণী ও প্রতিভাবান ব্যক্তি দ্বারা সাহিত্য রচনা ও তার ব্যাপক প্রসার ও পরিবেশনের ব্যবস্থা করে। এর ফলে

www.pathagar.org

তার চিন্তাধারা একই ব্যক্তির না হয়ে বহু আন্দোলনপ্রিয় বুদ্ধিজীবীর গ্রন্থ-প্রবন্ধাদির মাধ্যমে ব্যাপক প্রসার লাভ করতে থাকে।

১০। সমাজসেবা জামায়াতে ইসলামীর চার দফা স্থায়ী কর্মসূচীর একটি। জামায়াত তার সমকালীন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যে, রাজনৈতিক দলগুলো শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার এবং জনগণকে নিজেদের সাথে ভিড়িয়ে রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করার মাধ্যমই নয়, বরঞ্চ তারা মানবতার সেবার দায়িত্বও পালন করতে পারে। জামায়াতে ইসলামী এ দৃষ্টান্তও পেশ করে যে, রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে জনসেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজের আশাও জনগণের করা উচিত। এ ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামী সর্বপ্রথম বিহারের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় এবং পরে পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় প্রশংসনীয় কাজ করে। মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে শুধু মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে জামায়াতকর্মীগণ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কিভাবে দাঙ্গা-উপদ্রুত এলাকায় কয়েক মাস যাবৎ জনসেবার কাজ করে তার বিস্তারিত বিবরণ এ গ্রন্থে ইতঃপূর্বে এলাকায় কয়েক মাস যাবৎ জনসেবার কাজ করে তার বিস্তারিত বিবরণ এ গ্রন্থে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর দেশ বিভাগের পর মুহাজির ক্যাম্পগুলোতে কয়েক মাস যাবৎ জামায়াতের জনসেবামূলক কাজ এ কথাই প্রমাণিত করে যে, জামায়াত একটি জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং তার অস্তিত্ব জনকল্যাণের গ্যারান্টি।

বারো দফা আলোচ্য বিষয়

এখন কিছু আদর্শিক আলোচনা করা যাক, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ আলোচনার আলোকে এ কথা বলা যেতে পারে যে, জামায়াতে ইসলামী আমাদের যুগের এমন একটি আদর্শিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, যা পাশ্চাত্যের আধুনিক গণতান্ত্রিক ধর্মহীন রাজনৈতিক দলগুলো থেকে একবারে ভিন্ন ধরনের। তার বিভিন্নতার বিভিন্ন দিক রয়েছে এজন্যে সে সম্পর্কে ভালোভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সার্বভৌমত্বের ধারণা ও খেলাফতের মতবাদ

গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে প্রথম প্রশ্ন হলো সার্বভৌমত্বের (Sovereignty)। জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার দান এবং একনায়কত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে না। তার দৃষ্টিতে আইনানুগ সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র সেই সত্তার-যিনি বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব জাতির স্রষ্টা। এ কি করে সম্ভব যে, যে মানুষ মানুষের স্রষ্টাও নয় এবং প্রতিপালকও নয়, সে অন্যান্য মানুষের উপর সার্বভৌমত্বের অধিকারী হয়ে তাদের জন্যে আইন রচনা করবে, যারা বর্ণ, বংশ, গোত্র ও ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। কোথাও গণতন্ত্রের নামে জনগণের সার্বভৌমত্বের বুলি আওড়ানো হয়। কিন্তু সাধারণত সেখানে স্বার্থান্ধ

www.pathagar.org

ধনিক-বণিকদের সার্বভৌত্ব চলে। কোথাও সার্বভৌমত্ব কোন গোত্র, গোষ্ঠী বা বংশের জন্যে, জাতির প্রতিনিধিদের জন্যে অথবা মেহনতি মানুষের নাম করে বুরক্র্যাসি বা আমলাতন্ত্রের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এ সকল সার্বভৌমত্বে অন্যান্য শ্রেণীর উপর অত্যাচার-অবিচারের আচরণই করা হয়। বিভিন্ন গোত্র, বংশ, জাতি, ভাষা ও অঞ্চলের লোকের সাথে বৈষম্যমূলক অমানুষিক আচরণ করা হয়। কোন বিশেষ শ্রেণীকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির সুযোগ দেয়া হয়। আবার কোন বিশেষ শ্রেণীকে দমিত-নিগৃহীত করে রাখা হয়। তথাকথিত সভ্য জাতিসমূহ জনগণের সার্বভৌমত্বের নামে সংখ্যালঘুদের জানমাল ও ইজ্জত-আবরু নিয়ে হোলি খেলা করে এবং তাদেরকে নির্মূল করে। বর্ণবৈষম্যের পতাকাবাহী জাতিসমূহ অন্য বর্ণের লোকদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যখন সার্বভৌমত্বের মর্যাদা কোন মানব শ্রেণীকে দেয়া হবে, তখন তারা আপন স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে অপরের উপর সুবিচার করা থেকে বিরত থাকে। আধুনিক জগতের সর্বত্রই মানুষের সার্বভৌমত্বের নামে এ খেলাই চলছে।

পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। কারণ, স্রষ্টা হিসেবে একমাত্র তিনিই ভালো করে জানেন মানুষের প্রয়োজন কি। তিনিই ভালো জানেন মানুষের প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, অধিকার সংরক্ষণ কিভাবে হতে পারে। একমাত্র তাঁর আইনের অধীনেই প্রতিটি মানুষ পরিপূর্ণ সুবিচার পেতে পারে।

উপরোক্ত কারণেই জামায়াতে ইসলামী আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্বের পতাকাবাহী। এ মৌলিক পার্থক্য জামায়াতে ইসলামীকে অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকে এক পৃথক মর্যাদা দান করেছে। জনগণকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করার, জনগণের কল্যাণের জন্যে তাদের দ্বারা সরকার গঠন করার এবং জনসেবার অধিকার জামায়াতে ইসলামী দেয়। কিন্তু তার দৃষ্টিতে আইন রচিত হবে শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাতের ভিত্তিতে। অন্যকথায় একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহই হবে সকল আইনের উৎস। জনগণের সার্বভৌমত্বের মোকাবিলায় জামায়াত জনগণের খেলাফতের ধারণা পেশ করে। তার অভিমত এই যে, মানুষ দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তায়ালার খলীফা এবং খলীফার মর্যাদা নিয়েই তাকে দুনিয়ায় জীবন যাপন করতে হবে। বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রয়োগ প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মানুষের খেলাফতের অধিকার যা সে তার প্রতিনিধির উপর অর্পণ করে। এভাবে কোন অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধি তার অধিবাসীদের অর্পিত খেলাফতের অধিকার তাদের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যবহার করবে। জামায়াতে ইসলামী একেই খেলাফতের মতবাদ (Theory of Viceregency) বলে।

স্বাধীনতার ধারণা

জামায়াতে ইসলামীর স্বাধীনতার ধারণাও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো থেকে পৃথক। অন্যন্য রাজনৈতিক দলগুলো স্বাধীনতার এ সংজ্ঞা বর্ণনা করেন যে, কোন জাতি অন্য কোন জাতির আধিপত্য থেকে পরিপূর্ণ স্বাধীন হবে এবং সার্বভৌমত্ব থাকবে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে, যারা রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে থেকে

www.pathagar.org

তা ব্যবহার করবে। জনগণের মৌলিক অধিকারের উপর কারো পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপ করা হবে না। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী এ সবের সাথে অতিরিক্ত এ কথাও বলে যে, কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল অথবা গোটা জাতির আধিপত্য থেকে স্বাধীন হবে এবং তাদের শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ-নিষেধ মেনে চলার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। তাদের উপর একমাত্র খোদার আইন ব্যতীত অন্য কোন মানব রচিত আইন চাপিয়ে দেয়া হবে না। এ অবস্থাতেই সে জাতি পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা লাভ করে। অর্থাৎ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে খোদার হুকুম মেনে চলার সকল দিক দিয়ে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে। এই হলো সত্যিকার স্বাধীনতা।

নেতৃত্বের ধারণা

জামায়াতে ইসলামী দল ও রাষ্ট্রের নেতৃত্বের ব্যাপারেও অন্যান্য দল থেকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে ও স্বতন্ত্র নীতি মেনে চলে। অন্যান্য দলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তির উপরই কর্তৃত্ব নির্ভরশীল। এ সংখ্যাগরিষ্ঠতা শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে, ধনের মাধ্যমে, চালাকি-চাতুরি ও প্রতারণার মাধ্যমে, অথবা লাঠিয়াল বাহিনীর দ্বারা ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে অর্জন করা হতে পারে। উপরন্তু মানবীয় গুণাবলী ও চরিত্রের মাপকাঠিতে নেতৃত্বের বিচার করা হয় না। অনেক সময়ে কেন অধিকাংশ সময়ে এ ব্যাপারে দলীয় সকল কর্মীর মতামত গ্রহণেরও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী তার সাংগঠনিক পরিমণ্ডলে কোন ব্যক্তির নেতৃত্ব মেনে চলার জন্যে তার ত্যাগ ও কুরবানী, জ্ঞান-বুদ্ধি, সচেতনতা, যোগ্যতা প্রভৃতির সাথে সাথে তার নৈতিক গুণাবলীকেও সর্বাধিক গুরুত্ব দান করে। জামায়াত অপরিহার্য মনে করে যে, তাকে কুরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। দ্বীনের আহকামের উপর আমল করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে অগ্রসর হবে এবং তার জীবন কোন অবস্থাতেই খোদা ও রসূলের শিক্ষার দৃষ্টিতে সঠিক মানের নিচে হবে না। জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জামায়াতের রুকনগণ আমীরের তাকওয়া, কুরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞান, আমানত ও দিয়ানত, দ্বীনী দূরদর্শিতা, ইসলামী আন্দোলনের বোধশক্তি, সঠিক অভিমত ব্যক্ত করার যোগ্যতা, পরিণাম- দর্শিতা (তাদাব্বুর), সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, আল্লাহর পথে অবিচলতা ও দৃঢ়তা এবং জামায়াত পরিচালনায় যোগ্যতার উপর আস্থা পোষণ করে।

গুণগত সদস্যপদ

সাধারণত রাজনৈতিক দলগুলোতে যে কোন বয়স্ক ব্যক্তি দলের কর্মসূচীর সাথে একমত হয়ে সদস্যপদের জন্যে নির্ধারিত ফিস্ দাখিল করার সাথে সাথেই তার সদস্য হতে পারে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তুলনায় গুণগত সদস্যপদে বিশ্বাসী। যে কোন লোককে সে তার সংগঠনে গ্রহণ করে না। বরঞ্চ তার মধ্যে আপন লক্ষ্য ও কর্মসূচি অনুযায়ী অগ্রিম কিছু বাস্তব গুণাবলী সৃষ্টি করতে চায়। যতোক্ষণ তার মধ্যে এ গুণাবলী সৃষ্টি না হয়েছে, ততোক্ষণ সে

www.pathagar.org

জামায়াতে ইসলামীর সমর্থকবৃন্দের মধ্যে শামিল হতে পারে। জামায়াতে ইসলামীর সদস্যপদ লাভের জন্যে বিশেষ কিছু গুণাবলী অর্জন করতে হয়।

গণতন্ত্রের ধারণা

সারা দুনিয়ার সংগঠনগুলোর ধারণা এই যে, সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত যা হবে তাই সত্য। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী এ ব্যাপারে সাধারণ গণতান্ত্রিক ধারণা থেকে ভিন্ন মত পোষণ করে। তার ধারণা বরঞ্চ বিশ্বাস এই যে, সত্য তাই যা কুরআন ও সুন্নাহ বলে, যা খোদা ও রসূলের নির্দেশাবলী দ্বারা প্রমাণিত। তা বিরুদ্ধে যদি সারা দুনিয়া মিলেও কোন সিদ্ধান্ত করে, তাহলে সে সিদ্ধান্ত ভুল হবে। সত্য নির্ধারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের বেলায় কুরআন ও সুন্নাহর সমর্থন অবশ্য প্রয়োজনীয়। অবশ্য যে ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ নীরব, সে ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত হবে। যে সব জাতীয় কল্যাণমূলক ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না, সে সব ব্যাপারে অবশ্য জাতির প্রতিনিধিগণকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করতে হবে।

জামায়াতে ইসলামী পাশ্চাত্যের ধর্মহীন গণতন্ত্রকে ভ্রান্ত বলে মনে করে। কারণ, এতে সত্য-মিথ্যা নির্ণীত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা এভাবে নির্ণয় করাও ভুল যে, জনমত অসংখ্য অংশে বিভক্ত হওয়ার পর যেমন একটি সংখ্যালঘু দলও কারচুপির মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যায় অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের এ এক মারাত্মক ত্রুটি। এ ত্রুটি দূর করে ইসলামী গণতন্ত্র করা যেতে পারে।

সংগঠনের ধারণা

সকল গণতান্ত্রিক দল তাদের সংগঠনের জন্যে কিছু নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করে, যা অনুসরণ করলে সংগঠন মজবুত হয়। কিন্তু এ সব নিয়ম-বিধি সাধারণত মেনে চলা হয় না। তার ফলে দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী তার সংগঠনকে শরিয়তের মর্যাদা দিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ এ সংগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা কর্মীদের শরয়ী ফরয বলে গণ্য করা হয়। এ আনুগত্যকে সৎ কাজের আদেশ (আমর বিল মা'রূফ) এর শর্তাধীন করে তাকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ করা হয়েছে। অর্থাৎ আনুগত্য শুধু সৎ কাজের জন্যে। অসৎ কাজের জন্যে নয়। ফলে জামায়াতে ইসলামীর প্রত্যেক কর্মী তার প্রতিটি কাজকে দ্বীনি প্রয়োজন, সওয়াবের কাজ এবং অপরিহার্য মনে করে। নিয়ম-শৃঙ্খলা কার্যকর করার জন্যে এ এমন সুবিধাজনক পন্থা, যা জামায়াতে ইসলামী অবলম্বন করেছে। যেহেতু জামায়াতে ইসলামীর সংগ্রাম দ্বীন প্রতিষ্ঠারই সংগ্রাম, সে জন্যে তার প্রতিটি কাজই জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর কাজ, সে জন্যে তা সর্বোত্তম ইবাদতের মধ্যে গণ্য। ফলে প্রত্যেক কর্মী একদিকে তার বিবেকের আহ্বানে জামায়াতের কাজ করে যাতে সে আখেরাতে প্রতিদান ও সওয়াব থেকে বঞ্চিত না হয় এবং অপরদিকে সে সংগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে রাখে

www.pathagar.org

মেনে চলে যাতে করে শরিয়তের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে গুনাহগার না হয়। জামায়াতের কাজে কর্মীদের নিরলস আত্মনিয়োগ এবং শৃঙ্খলার সাথে এমন বিশ্বস্তপূর্ণ সম্পর্ক অন্য কোন ধর্মহীন গণতান্ত্রিক দলে কখনো দেখতে পাওয়া যায় না।

জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও গণতান্ত্রিক দলগুলোর সভাপতির মধ্যে পার্থক্য

অন্যান্য গণতান্ত্রিক দলগুলোর সভাপতির উপর বিভিন্ন ধরনের বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। এ জন্যে যে, প্রত্যেক কর্মীর সাথে তিনি যে সুবিচারপূর্ণ আচরণ করবেন এমনটি আশা করা যায় না। বিশেষ করে নির্বাচনে যারা তাকে সমর্থন করে না, তাঁর সাফল্যের পর তারা আশঙ্কা বোধ করেন যে, সাংগঠনিক দিক দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর পরিবেশ ভিন্ন ধরনের।

অতএব, এ জামায়াতের আমীর তাঁর এক শরয়ী মর্যাদা লাভ করেন। সৎ কাজে তাঁর আনুগত্য একটি সওয়াবের কাজ এবং তাঁর সাথে সহযোগিতা করা একটি দ্বীনী প্রয়োজন। এ জন্যে কাজ করতে ও নিতে জামায়াতে ইসলামীর আমীর যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন তা অন্যান্য দলের সভাপতি লাভ করেন না।

ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পার্থক্যের ধারণা

দুনিয়ার সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক মনে করে। তারা এ দাবী করে না যে, তাদের রাজনীতি ধর্মের আওতাভুক্ত। এ জন্যে তাদের মধ্যে কোন ধর্মীয় নৈতিক নিয়ম-শৃঙ্খলার ধারণা বিদ্যমান নেই এবং এর পরিণাম স্বরূপ রাজনীতিকে ধোঁকা-প্রতারণা ও শঠতা-প্রবঞ্চনার ক্ষেত্র মনে করা হয়েছে। বস্তুত পার্থিব রাজনৈতিক দলগুলোর লোকেরা নিজেদের কোন ধর্মীয় নৈতিক শৃঙ্খলার অধীন বলে গণ্য করে না। তাদের নৈতিকতা (Ethics) যতোটুকু তা তাদের নিজেদের পরিমণ্ডলে কিছু নিয়ম-নীতির আকারে তৈরী করা হয়ে থাকে। কিন্তু তার কোন সম্পর্ক মানুষের ধর্ম ও নৈতিকতার সাথে থাকে না। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী যে রাজনৈতিক নীতি অবলম্বন করেছে তার মধ্যে ধর্মীয় নৈতিকতার শুধু একটা গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাই নেই, বরঞ্চ তা রাজনীতিকে ব্যাপক দ্বীনেরই একটা অংশ বলে গণ্য করে। তাকে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য কোন আকারে সে পেশ করে না।

রাজনীতিকে ধর্ম এবং ধর্মীয় নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে তা শঠতা, প্রবঞ্চনা, অত্যাচার-নিপীড়ন ও অন্যায়-অবিচারেরই হাতিয়ার হয়ে পড়ে। আল্লামা ইকবাল যথার্থই বলেছেন-

জুদা হো দ্বীন সিয়াসত সে
ত রাহ্ জাতি হ্যায় চেংগিযী

দ্বীন বা ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই হয় যে, মানবসমাজে চেংগিযী বর্বরতার রাজত্বই চলতে থাকে। ধর্মকে রাজনীতি থেকে বা রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে বর্তমান দুনিয়ার চেংগিয হালাকুর দল মানব জাতিকে চরম বর্বরতার শিকারে পরিণত করেছে।

www.pathagar.org

জামায়াতে ইসলামীর অভিমত এই যে, এটাই মোক্ষম সত্য যে, দ্বীন ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে পরিবেষ্টন করে আছে। জীবনের এমন কোন বিভাগ নেই, যা দ্বীনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

এ দিক দিয়ে জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

জাতীয়তার ধারণা

রাজনীতির অঙ্গনে যে সব রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দল কাজ করে, তারা জাতীয়তা সম্পর্কে নিজেদের ধারণা বর্ণ, বংশ, গোত্র, ভাষা ও জন্মভূমির ভিত্তিতে গ্রহণ করে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী ভৌগোলিক, বংশীয় ও ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাকে ভ্রান্ত মনে করে। সে শুধু আদর্শ ভিত্তিক জাতীয়তায় বিশ্বাসী, সে ইসলাম থেকেই জাতীয়তার ধারণা গ্রহণ করে। এ ধারণার অধীনে মুসলমান জাতি বিরাট জনশক্তি অর্জন করেছিল। যে সব লক্ষ্য কোটি মানব সন্তান অন্যান্য জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন বর্ণ, বংশ, গোত্র ও অঞ্চলের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল, মুসলমান জাতি তাদেরকে একমাত্র আদর্শের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে টেনে নিয়ে তাদের জাতীয়তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করে। এই আদর্শ ভিত্তিক জাতীয়তাই জামায়াতে ইসলামীর জাতীয়তার ধারণার বুনিয়াদ। ইসলামী জাতীয়তা জন্মভূমির উপর নির্ভর করে না, আদর্শের উপর করে। দুনিয়ার যে কোন ব্যক্তি এ আদর্শ গ্রহণ করে যে কোন সময়ে এ জাতীয়তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।

ইসলামের ধারণা

আকীদাহ-বিশ্বাস ও আমলের দিক দিয়ে মুসলমানদের যে অধঃপতন ঘটেছিল কয়েক শতাব্দীর সে অধঃপতনের ফলে ইসলাম শুধু তাদের জাতীয়তার একটা চিহ্ন স্বরূপ রয়ে গেছে। এ শুধুমাত্র মুসলমানদের পরিচিতির কাজে আসে। মুসলমানদের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলো ইসলামকে একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, একটা জীর্ণ বংশীয় ধারণা এবং একটা নিজস্ব ধর্মীয় প্রবণতার নিদর্শক মনে করে এবং সাধারণত তাকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে পৃথক করে রাখা পছন্দ করে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী ইসলামের আন্দোলনসুলভ ধারণা পেশ করে। সে ইসলামকে একটা সংস্কারমূলক রাজনৈতিক এবং প্রচারধর্মী আন্দোলন হিসেবে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে, যা তার নিজের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক ধারণা এবং একটা রাজনীতি ও রাষ্ট্রের মতবাদ পোষণ করে। সে জন্যে জামায়াতে ইসলামী ইসলামকেই তার সকল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বুনিয়াদ বলে গণ্য করে। তারই আলোকে সে তার সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাজকর্ম সমাধা করে। সে বলে যে, সে ইসলামকে একটি আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করে দাঁড়িয়েছে এবং ইসলামের প্রকৃত মর্যাদাই এই যে, মুসলমান তাকে একটা আন্দোলন হিসেবে গ্রহণ করেই ময়দানে উত্তীর্ণ হবে। তারপর সমগ্র কুফরী দুনিয়াকে তার দিকে দাওয়াত

www.pathagar.org

দেবে। জামায়াতে ইসলামী প্রথম পর্যায়ে তার সমাজের সকল ক্রিয়াকর্ম ব্যক্তিগত হোক অথবা সামাজিক ইসলামের আওতাভুক্ত করতে চায় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সে সমগ্র দুনিয়াকে এদিকে আহ্বান জানায়, জামায়াত তার কর্মসূচীকে আপন জন্মভূমির সীমারেখার মধ্যেই সীমিত মনে করে না। বরঞ্চ তার কর্মক্ষেত্র হচ্ছে সমগ্র মানব জগৎ। সে সমাজকে বলপূর্বক নিজের সপক্ষে আনার পরিবর্তে বুঝিয়ে সম্মত করে নিজের সাথে মিলিত করার চেষ্টা করে। তার প্রারম্ভিক প্রকাশভঙ্গি(Approach) যুক্তিবাদের (Rationalism) ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

মৌলিক অধিকারের ধারণা

গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামকারী সকল রাজনৈতিক দল নাগিরকদের জন্যে বড়ো পাঁচটি মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা ঘোষণা করে (খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা ও চিকিৎসা)। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী ইসলাম প্রদত্ত একুশটি মৌলিক অধিকার নাগরিকগণকে দেয়ার ঘোষণা করে। এ সব অধিকার কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে চৌদ্দশ বছর আগে মানুষকে দেয়া হয়েছে। অথচ মাত্র কয়েক বছর আগে ইউরোপ অনেক গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পর যে মৌলিক অধিকার জানতে পেরেছে তার সংখ্যা মূলত পাঁচটি।

পক্ষান্তরে ইসলাম সকল নাগরিককে যে অধিকার দিয়েছে তাহলো-

(১) জীবনের নিরাপত্তার অধিকার, (২) অক্ষমতা ও দুর্বলতা থেকে রক্ষণাবেক্ষণ, (৩) নারীর মর্যাদা সংরক্ষণ, (৪) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, (৫) সুবিচার, (৬) সৎ কাজে সহযোগিতা এবং অসৎ কাজে অসহযোগিতা (৭) সাম্য অর্থাৎ আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার, (৮) পাপ থেকে বিরত থাকার অধিকার, (৯) জালেমের আনুগত্য অস্বীকার করার অধিকার, (১০) রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের অধিকার; (১১) স্বাধীনতার অধিকার, (১২) মালিকানার সংরক্ষণ, (১৩) মান-সম্মানের নিরাপত্তা, (১৪) ব্যক্তি জীবনের নিরাপত্তা, (১৫) অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার, (১৬) বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা (১৭) মত প্রকাশের স্বাধীনতা, (১৮) মনের উপর আঘাত থেকে নিরাপত্তা, (১৯) সভা-সম্মেলনের অধিকার, (২০) অন্যের কর্মের দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকার অধিকার, (২১) সাক্ষ্যদানকে হস্তক্ষেপ গ্রহণ থেকে সংরক্ষণ।

মুসলমান নাগরিকদের উপরোক্ত সমুদয় অধিকার অমুসলিম নাগরিক ভোগ করবে। উপরন্তু অমুসলিম নাগরিক অতিরিক্ত কিছু মৌলিক অধিকার ভোগ করবে, যথা (১) তাদের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার, (২) ব্যক্তিগত ব্যাপারে স্বাধীনতা, (৩) ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম করার অধিকার ও উপাসনালয়ের সংরক্ষণ, (৪) রাজস্ব আদায়ে বিশেষ সুবিধাদান এবং (৫) সামরিক কার্যকলাপ থেকে নিষ্কৃতি।

জামায়াতে ইসলামী নাগরিকদের উপরোক্ত মৌলিক অধিকারের কথাই ঘোষণা করে।

www.pathagar.org

শাসন ব্যবস্থা ও সরকার পরিবর্তনের ব্যাপারে পার্থক্য

জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আর একটি এই যে, প্রথমোক্ত দল দেশের সমগ্র ব্যবস্থাকেই পরিবর্তন করতে চায় এবং শেষোক্ত দলগুলো ঐ ব্যবস্থাকেই ভালোভাবে চালাবার কর্মসূচি নিয়ে ময়দানে নামে। এসব রাজনৈতিক দল প্রচলিত ব্যবস্থায় নিজেদের স্থান করে নেয়ার জন্যে এবং ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করার জন্যে প্রচেষ্টা চালায়। অর্থাৎ তারা শুধু ক্ষমতার হাত বদল করতে চায়। যেহেতু জামায়াতে ইসলামী প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভ্রান্ত এবং মানুষের জন্যে অকল্যাণকর মনে করে, সে জন্যে তাকে পরিবর্তন করে অন্য একটি কল্যাণকর সামাজিক ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়। এটাই বিরাট মৌলিক পার্থক্য, যা জামায়াতে ইসলামী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান। এ কারণেই অন্যান্য দলগুলো এ সমাজেই রেডিমেড নেতা, কর্মী, বক্তা ও ভোটার পেয়ে যায়। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীকে বহু সাধ্য সাধনার পর এসব নিজের জন্যে স্বয়ং তৈরী করতে হয়। তাদের মন-মস্তিস্ক, চরিত্র ও আচার-আচরণে পরিবর্তন সূচিত করে নিজেদের উপযোগী করে গড়ে তোলে। মোটকথা, গণআন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর পথ একটা ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং সুদীর্ঘ সংগ্রামের পথ।

জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামকে মানবজীবনের জন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প নিয়ে জামায়াতে ইসলামী ময়দানে এসেছে। সাধারণত রাজনৈতিক দলগুলোর লক্ষ্য হয়ে থাকে কিছু আংশিক সংস্কার-সংশোধন। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর কর্মসূচি এ ধরনের কোন আংশিক কাজ করা নয়। বরঞ্চ তার আন্দোলন পরিপূর্ণ ইসলামকে নিয়ে। মুসলমানদের কাছে আবহমান কাল থেকে এ সত্য সর্বজন স্বীকৃত যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান এবং তা বাস্তবায়িত করা গোটা মুসলিম উম্মাহর ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য। অবশ্য রাজনৈতিক ময়দানে এ তেমন কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয় যে, যখন কোন একটি দল কোন দাওয়াত ও মতবাদ পেশ করে, তখন তার বিরুদ্ধে সমালোচনা ও প্রতিবাদের ঝড় সৃষ্টি করে তাকে সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ বলে গণ্য করা হয়। অতএব, জামায়াতে ইসলামী তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হয়ে আসছে। এটা স্বাভাবিক যে, কোন দল সমাজের সামনে তার দাওয়াত পেশ করার ফলে উপর্যুপরি এ ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

এসব সমালোচনা ও প্রতিবাদ ধর্ম ও ফেকাহ সংক্রান্ত বিষয়েও করা হয়েছে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়েও। ধর্ম ও ফেকাহ সংক্রান্ত বিষয়গুলো আমাদের

www.pathagar.org

আলোচনার বহির্ভূত। এ জন্যে এখানে শুধু ঐসব সমালোচনা ও প্রতিবাদের বিষয়গুলোই আলোচ্য, যা রাজনৈতিক ও সামাজিক ধরনের।

জামায়াত এক নতুন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ

মুসলমানদের কতিপয় দল মনে করে রাজনৈতিক ময়দানে জামায়াতে ইসলামী একটি নতুন প্রতিপক্ষ জামায়াত হিসেবে সামনে এসেছে এবং এখন সে তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংকল্প পোষণ করে। বাহ্যত কোন দলের রাজনৈতিক ময়দানে আগমনের পশ্চাতে এ উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য হতে পারে? ফলে প্রতিপক্ষ দলগুলোর উপরোক্ত আশঙ্কা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী এ কালেই তার যে দৃষ্টিভঙ্গি বা অবস্থান (Stand) বিশ্লেষণ করেছে তাহলো এই যে, জামায়াতে ইসলামী কোন বিশেষ দলের বিরোধী নয়। সেতো শুধু সেই জীবন ব্যবস্থার বিরোধী, যা খোদার আনুগত্যের পরিবর্তে অন্য কোন শাসন-কর্তৃত্বের আনুগত্য এবং খোদার আইন-কানুন ব্যতীত অন্য কোন আইন-কানুনের বাধানিষেধের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার সংগ্রাম কোন দলের বিরুদ্ধে নয়, শুধু বাতিল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তার উদ্দেশ্য এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির গোটা আনুগত্য ব্যবস্থা বাতিলের ভিত্তিসমূহের উপর থেকে সরিয়ে বন্দেগীর বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সে একটি বিশ্বজনীন মতবাদ ও লক্ষ্য পোষণ করে। সে জন্যে কোন একটি বিশিষ্ট ভূখণ্ডে অথবা কোন সীমিত জনপদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় এবং সাময়িক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে সক্রিয় দলগুলোকে সে তার প্রতিপক্ষ মনে করে না, তার প্রতিদ্বন্দ্বীও মনে করে না। তার প্রতিপক্ষ যদি কেউ থাকে, তা হলে তা হচ্ছে দুনিয়ার সেই গোটা জীবন পদ্ধতি, যা মানব রচিত আইনের উপর চলছে।

সত্য কি শুধু জামায়াতে ইসলামীর মধ্যেই সীমিত?

জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে এ ধারণাও করা হয় যে, যারা জামায়াত থেকে পৃথক রয়েছে জামায়াত তাদেরকে সত্য থেকে দূরে এবং পথভ্রষ্ট মনে করে।

এ অভিযোগের জবাবে জামায়াতের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট করে বলা হয় যে, জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত ঐ নির্দিষ্ট দলীয় সংগঠনের দিকে নয় যাকে জামায়াতে ইসলামী নামে কায়েম করা হয়েছে। বরঞ্চ তার দাওয়াত তাওহীদ ও রেসালাতের আকীদাহ-বিশ্বাস ও ঐ লক্ষ্যের দিকে, যা আল্লাহ তায়ালাকে আপন বাদশাহ এবং রসূলকে (সঃ) আপন বাদশাহের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করার সাথে সাথেই অপরিহার্যরূপে প্রতিটি মুসলমানের লক্ষ্য বলে গণ্য হয়। জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা বলেন, আমরা শুধু এতটুকু চাই যে, যমীনের উপর খোদার নেক বান্দাহদের এমন কোন জামায়াত সংগঠিত হোক যা অন্যান্য সকল উদ্দেশ্য, চেষ্টাচরিত্র ও কর্মতৎপরতা উপেক্ষা করে ঐ একটি মাত্র আকীদাহর দিকে দুনিয়াকে দাওয়াত দেবে এবং ঐ একটি লক্ষ্য হাসিলের জন্যে সংগ্রাম করতে দণ্ডায়মান হবে। এ ধরনের কোন জামায়াত যদি বিদ্যমান থাকতো, তা হলে অযথা জামায়াত গঠনের আমাদের কোনই প্রয়োজন হতো না।

www.pathagar.org

তিনি আরো বলেন, এরূপ কোন জামায়াত যদি থাকতো, তা হলে সে জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে আমাদের কখনো কোন আপত্তি থাকতো না। কিন্তু এ ধরনের কোন জামায়াত যখন আমাদের নজরে পড়লো না যা গায়রুল্লাহর কর্তৃত্ব-প্রভুত্বকে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে এবং কার্যত ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে আল্লাহর প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব ও শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করাকে নিজের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছে, তখন আমরা বাধ্য হয়ে একটি জামায়াত গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করি। সত্য কথা এই যে, যদি এ ধরনের দশটি জামায়াতও হয়ে যায় যাদের আকীদাহ ও লক্ষ্য এই হবে, কিন্তু সংগঠন বিভিন্ন হবে, তাহলে তাতেও কোন দোষ নেই। এ মহান ও সত্য কাজের খেদমতের জন্যে অন্য কোন দল অস্তিত্ব লাভ করলে তার সাথে আমরা সন্তুষ্টচিত্তে সহযোগিতা করব। আর যদি সে দলের গঠন-পদ্ধতি ও তার কর্মকর্তাদেরকে আমরা অধিকতর নেক ও সৎ পাই, তাহলে আমাদের এ পৃথক সংগঠনকে ভেঙে দিয়ে তার মধ্যে মিশে যেতে আমরা মোটেও কুণ্ঠিত হবো না- (সম্পাদকীয় 'তর্জুমানুল কুরআন' খণ্ড ১৯, সংখ্যা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়)।

দ্বীন ইসলামকে আন্দোলন হিসেবে পেশ করা

কতিপয় হযরত এ অভিযোগও করেন যে, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা ইউরোপীয় দেশগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের মতো ইসলামকে এক আন্দোলন হিসেবে পেশ করেছেন- যা ইসলামের মেযাজ-প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। এ জন্যে যে, ইসলাম তো হচ্ছে মন ও দিলের তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) ও আল্লাহর সাথে সম্পর্কের নাম। তাকে আন্দোলন হিসেবে পেশ করা একেবারে বাড়াবাড়ি, যেমন শূরা সদস্যদের পার্লামেন্ট বলা ভুল। এ জন্যে শূরার বৈশিষ্ট্য পার্লামেন্ট থেকে পৃথক।

জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তাজদীদ পুনরুত্থান, পুনর্জাগরণ বা নবায়ন) এবং তাজাদ্দুদ (নতুনত্ব- Novelty) এর মৌলিক পার্থক্য এই যে, তাজদীদ প্রত্যেক যুগেই যে সব সত্য মর্মকথা আবহমান কাল থেকে চলে আসছে সেগুলোকে আপন যুগের ভাষায়, আপন যুগের মন-মানসিকতা ও প্রয়োজনের সথে সংগতিশীল করে পেশ করে। অপরদিকে তাজাদ্দুদ (Novelty) আপন যুগের ফেতনা-অনাচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঐ সব সত্য মর্মকথার সংশোধনীর (Amendment) জন্যে প্রস্তুত হয়ে পড়ে। আমি যদি এসব হযরতের কাছে তাজাদ্দুদ করার অপরাধে অপরাধী হই, তাহলে তারা আমাকে নির্দিষ্ট করে বলে দিন কোথায়, কোন স্থানে দ্বীনের মর্মকে আমি পরিবর্তন (Amend) করেছি। কোন স্থানে চুল পরিমাণ আমি পরিবর্তন করেছি বলে তাঁরা যদি বলে দিতে পারেন আর আমি যদি তার থেকে তওবা না করি, তাহলে আমার চেয়ে বড়ো গুনাহগার ও যালেম আর কেউ হবে না। আর তাঁদের সকল অসন্তোষের কারণ যদি এই হয় যে, আমি পুরাতন ও শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ করার জন্যে নতুন নতুন শব্দাবলী ও নতুন বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করেছি এবং তাকে বর্তমান যুগের মন-মানসিকতা ও প্রয়োজনের সাথে সংগতিশীল করে পেশ করেছি, তা হলে তাঁরা বলুন যে,

www.pathagar.org

তাজদ্দীদে দ্বীনের চেষ্টাচরিত্র যাঁরা করেছেন- তাঁরা কোন কালে এ অপরাধ করেন নি এবং এ অপরাধ কি স্বয়ং এ অভিযোগকারী হযরতগণও করছেন না?

আন্দোলন শব্দটি যে অর্থে আমি ব্যবহার করি তার জন্যে অন্য কোন শব্দ আমি পাই না, যা বর্তমান যুগের জনগণের মধ্যে তার একটা চিত্র এঁকে দিতে পারে। কিছুকাল থেকে ধর্মকে এ অর্থেই সীমিত করে রাখা হয়েছে যে, এ কিছু বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সমষ্টি, যা পালন করলে আধ্যাত্মিক উন্নতি অথবা মৃত্যুর পর নাজাত আশা করা যায়। আজকাল এ অর্থেই লোকে বলে যে, ধর্ম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। আবেদ ও মা'বুদ বা মানুষ ও খোদার মধ্যে একটা প্রাইভেট সম্পর্ক মাত্র। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাথে তার কি সম্পর্ক? এ ভুল ধারণা দূর করার জন্যে আমি ইসলামের জন্যে দ্বীনের সাথে আন্দোলন শব্দ অধিকাংশ সময়ে ব্যবহার করে থাকি।

একামতে দ্বীনের ধারণা একটা পাগলামি

কতিপয় সহানুভূতিশীল সমালোচক বলেন, জামায়াতের কাজ যে সওয়াবের কাজ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বীন কায়েম করার ধারণা তো পাগলামি মাত্র। এ ধরনের কথা মুখ থেকে বের করে কি লাভ? যে বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্তমিত হয় না, যার একটা আঙ্গুলের ইশারায় ইরানের তাখত ও তাজ ধূলিসাৎ হতে পারে, এ সব পাগলদের খতম করতে তাদের কতটুকু সময় লাগবে?

এর জবাবে জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হয়, এর অর্থ তো এই হলো যে, যতোদিন কুফর শক্তিশালী থাকবে এবং বাতিল বিজয়ী ও শাসন-কর্তৃত্বের অধিকারী থাকবে, ততোদিন হকের কালেমা বুলন্দ করার কাজ মুলতবী রাখতে হবে। আর দ্বীনকে বিজয়ী করার প্রাথমিক প্রস্তুতিও করা যাবে না। অবশ্য কুফর স্বয়ং নতি স্বীকার করবে এবং বাতিল প্রাণহীন হয়ে আপনা-আপনি ধরাশায়ী হতে থাকবে আর ক্ষমতা কোন নেক দলের হাতে আসবে তখন মাত্র এসব 'এবাদে সালেহীন' (নেক বান্দাহগণ) আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার এবং এ দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্যে মাঠে নামবেন। বিবেক, জ্ঞান, বুদ্ধি ও বাস্তব অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে প্রকৃতপক্ষে এ অভিমত কি সঠিক? এ নীতির ভিত্তিতে কোন দল কোন কালে কি কাজ করতে পারতো! সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যদি এ ফর্মুলা মেনে চলতেন, তাহলে ইসলামের পয়গাম মক্কার পাহাড়পুঞ্জের মধ্যেই সীমিত হয়ে থাকতো- তার থেকে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারতো না।

জামায়াতের বাইরে কি ইসলাম নেই?

জামায়াতের গঠনতন্ত্রে তাজদীদে ঈমান ও শপথ গ্রহণ শব্দগুলো দেখে কিছু লোক এ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, জামায়াতে ইসলামী অন্যান্য মুসলমানকে, যারা জামায়াতের বাইরে রয়েছে, মুমিন মুসলমান মনে করে না।

এ ভুল ধারণার জবাবে জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, এর চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা ও বাড়াবাড়ি আর কিছু হতে পারে না। এ তাজদীদে ঈমানের উদ্দেশ্য শুধু এই যে, ঈমান আনার এবং অন্তর থেকে বুঝে-সুঝে তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্যদানের

www.pathagar.org

পর যে দায়িত্ব একজন মুমিনের উপর এসে পড়ে তা নতুন করে সতেজ করে দেয়া। আর এসব ভালোভাবে মনে বদ্ধমূল করার পরই একজন এ জামায়াতে প্রবেশ করবে। প্রবেশের শর্তই হচ্ছে ঐ সব দায়িত্ব পালন করার শপথ গ্রহণ। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে অবোধগম্য ইসলাম থেকে বোধগম্য ইসলামের দিকে একটা বাস্তব পদক্ষেপ।

রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের লালসা

জামায়াতে ইসলামীর সমালোচকগণ এ কথাও বলেন যে, জামায়াতের লক্ষ্য হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা। কথাকে আকর্ষণীয় করার জন্যে শুধু ইসলামের নাম নেয়া হয়। জামায়াতের পক্ষ থেকে তার সাহিত্যাবলীতে এর বিস্তারিত জবাব দেয়া হয়। বলা হয় যে, জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য হুকুমতে ইলাহিয়া কায়েম করা। এর মধ্যে এবং নিছক রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য রয়েছে। হুকুমতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠার অর্থ হুবহু তাই, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ দ্বারা কুরআন যে অর্থ বুঝিয়েছে।

এ কারো স্বকপোলকল্পিত লক্ষ্য নয়, বরঞ্চ আল্লাহ তায়ালা এ লক্ষ্যকেই তাঁর নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য বলে গণ্য করেছেন। এটাকে লক্ষ্য বানানোকে যদি অভিযুক্ত করা হয়, তাহলে অভিযোগকারীদের চিন্তা করা উচিত যে, কার প্রতি তাঁরা অভিযোগ করছেন।

ব্যক্তি সংস্কারের পরিবর্তে সমষ্টির সংস্কারের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে

কোন কোন মহল থেকে জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে এ কথা বলা হয় যে, তিনি শুধু ইসলামের সামষ্টিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর বিশ্বাস রাখেন, তাঁর দৃষ্টিতে ব্যক্তি সংস্কারের কোন গুরুত্ব নেই।

এ অভিযোগের জবাবে জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা বলেন, তাঁর দৃষ্টিতেও আসল জিনিস ব্যক্তির পরিপূর্ণ সংস্কার। সামষ্টিক সামাজিক সংস্কার আপন স্থানে বাঞ্ছিত নয়, বরঞ্চ ব্যক্তির সংস্কারে সহায়ক হিসেবে বাঞ্ছিত। এ জন্যে যে, কুরআনের ভাষায় খোদার কাছে প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসিত হবে।

অতঃপর তিনি পরিষ্কার করে বলেন, তাঁর লেখনীর মধ্যে নিঃসন্দেহে সামাজিকতার উপর জোর দেয়া হয়েছে। তার কারণ এই যে, অতীতের আলেমগণ সাধারণত নৈতিকতা ও ইবাদতের ব্যক্তিগত দিকই পেশ করেছেন এবং সামষ্টিক নৈতিকতার দিকে খুব কমই মনোযোগ দিয়েছেন। তিনি এ অভাব পূরণ করার সিদ্ধান্ত করেছেন। তার কারণ এই যে, পাশ্চাত্যের সামাজিক ব্যবস্থা তার সাহিত্য ও সংগঠনের মাধ্যমে এতো শক্তিশালী হয়ে দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে যে, ব্যক্তিগতভাবে সঠিক আকীদাহ-সম্পন্ন মুসলমানও তার দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। তিনি দ্বীনের খেদমত এটাই মনে করেন যে, যে দিক ও বিভাগের উপর ইসলামী সাহিত্য প্রথম থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়ে আছে তা বর্ধিত করার পরিবর্তে ঐদিকটি পূরণ

www.pathagar.org

করা যাক, যে দিকে অতীতের সরবরাহকৃত সাহিত্য অপ্রতুল। কোন অভাব পূরণ করা দূষণীয় হতে পারে না। অতীতের বযুর্গানের মধ্যেও এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, নিজেদের যুগে যে ফেতনাকে তাঁরা অধিকতর কঠিন মনে করেছেন, তার মুকাবিলার জন্যে তাঁরা অধিক শক্তি প্রয়োগ করেছেন।

জামায়াতে ইসলামীর থিওক্র্যাসির (Theocracy) পতাকাবাহী

লাহোরের 'পয়গামে হক'-এ একজন লেখেন যে, মাওলানার ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণার বুনিয়াদী দৃষ্টিকোণ এই যে, সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। প্রকাশ থাকে যে, এ মূলনীতি ঐতিহাসিক দিক দিয়ে বানানো হয়নি। ইউরোপে কিছুকাল থেকে থিয়োক্র্যাসির নামে এ মতবাদের চর্চা হয় এবং রোমে প্রধান পোপের শাসন এ ধারণারই ফল।

এর জবাবে জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদী বলেন, ইউরোপ যে থিয়োক্র্যাসির সাথে পরিচিত ইসলামী থিয়োক্র্যাসি তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইউরোপ এমন থিয়োক্র্যাসির সাথে পরিচিত, যার মধ্যে একটি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী খোদার নামে তাদের নিজেদের রচিত আইন কার্যকর করতো এবং কার্যত নিজেদেরই খোদায়ী জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিতো। এ ধরনের সরকার বা শাসনকে খোদার শাসন বলার পরিবর্তে শয়তানের শাসন বলা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হবে। পক্ষান্তরে ইসলাম যে থিয়োক্র্যাসি পেশ করে, তা কোন বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর হাতে থাকে না, মুসলমান জনসাধারণের হাতে থাকে। আর একে মুসলমান জনগণ খোদার কেতাব ও রসূলের সুন্নাত অনুযায়ী পরিচালনা করে। আমাকে যদি কোন নতুন পরিভাষা ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে এ ধরনের শাসনকে Theo Democratic State (খোদায়ী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র) বলে আমি আখ্যায়িত করবো। খৃস্টীয় পোপ ও পাদ্রীদের কাছে তো হযরত মসীহ (আঃ) এর কিছু নৈতিক শিক্ষা ব্যতীত কোন শরীয়ত একেবারেই ছিল না।

অতএব, তারা নিজেদের মর্জি ও প্রবৃত্তির অভিলাষ অনুযায়ী আইন রচনা করতো এবং এই বলে সেসব কার্যকর করতো যে, এসব খোদার পক্ষ থেকে এসেছে। ইসলাম তো একটা সার্বিক শরীয়তী ব্যবস্থা কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট হেদায়েতের ভিত্তিতে পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে দান করেছে। তার মধ্যে আন্তর্জাতিক বিষয়াদি থেকে শুরু করে ছোটখাটো সকল বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ বিদ্যমান রয়েছে। এখানে কোন মওলভীর মনের অভিলাষ প্রবেশ করার কোন সুযোগ নেই।

জামায়াতে ইসলামী একটি নতুন ফের্কা

কিছু ভালো লোকও এ ধারণা প্রকাশ করেছেন যে, জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনের ফলে এক নতুন ফের্কা আত্মপ্রকাশ করবে।

এ আশঙ্কার জবাব দিতে গিয়ে জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা বলেন, আমরা এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন যদিও আমাদের বিরোধীদের এ মনের বাসনা রয়েছে যে, কোন

www.pathagar.org

প্রকারে আমাদের পক্ষ থেকে ভুল হয়ে যাক যাতে করে সংস্কার-সংশোধনের (ইসলাহ) অন্যান্য চেষ্টাচরিত্রের মতো আমাদের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যাক। কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ, আমাদের মধ্যে সে সব রোগ নেই যার কারণে ফের্কার উদ্ভব হয়ে থাকে। চারটি কারণে ফের্কার উদ্ভব হয়। প্রথম কারণ এই যে, মূল দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু জিনিস সংযোজিত করে দেয়া, যা দ্বীনের মধ্যে বিদ্যমান নেই এবং তাকে ঈমান ও কুফরের বুনিয়াদ বানিয়ে নেয়া হয়।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, দ্বীনের কোন বিষয়কে ততো বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়, সে গুরুত্ব কুরআন ও সুন্নাতের দৃষ্টিতে প্রকৃতপক্ষে দেয়া থাকে না। তারপর এ বিষয়টিকে দলাদলির কারণ বানানো হয়।

তৃতীয় কারণ এই যে, ইজতিহাদী বিষয় সম্পর্কে অত্যধিক বাড়াবাড়ি করা হয়। তারপর এসব বিষয় নিয়ে অন্য মতাবলম্বীদেরকে কাফের বলে ফতোয়া দেয়া হয়।

চতুর্থ কারণ হলো নবীর (সঃ) পরে অন্য কোন ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে এমন বাড়াবাড়ি করা হয় যে, তাকে মেনে নেয়াকে ঈমান ও কুফরের বুনিয়াদ বানানো হয়। আল্লাহ তায়ালার শোকর যে, এ চারটির মধ্যে কোন একটি ভুলও আমরা করিনি। তারপর আমরা কিভাবে ফের্কায় পরিণত হতে পারি?

উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কারণ

এ বলেও অভিযোগ করা হয় ঃ যদি তোমরা কাজ করতে চাও তো কর। শেষ পর্যন্ত পৃথক একটি দল বানানোর প্রয়োজনটা কি ছিল? কারণ, এতে যে উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয়।

এর জবাব দিতে গিয়ে জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা বলেন, ধর্মহীন এবং দ্বীনের পরিপন্থি কোন উদ্দেশ্যে, ধর্মহীন রাজনীতি করার জন্যে, অনৈসলামী শিক্ষার প্রসারকল্পে, মাযহাবী দলাদলিকে উৎসাহিত করার জন্যে, নিরেট পার্থিব উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও ফ্যাসিস্ট পদ্ধতিতে মুসলমানদের অনজুমান অথবা দল গঠন করা-এসব আপনাদের কাছে আপত্তিকর হয় না। কিন্তু দ্বীনের প্রকৃত কাজের জন্যে নির্ভুল দ্বীনের মূলনীতির উপরে যদি কোন জামায়াত গঠন করা হয়, তাহলে হঠাৎ উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। এর থেকে এ কথাই প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, অভিযোগকারীদের আসলে আপত্তি কোন জামায়াত গঠনে নেই। আপত্তি শুধু এ জন্যে যে, কোন জামায়াত দ্বীনের সত্যিকার কাজ করার জন্যে কেন গঠন করা হলো।

এ হলো কতকগুলো বড়ো বড়ো অভিযোগ, যা এ যুগে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে করা হয়। জামায়াত তার সাহিত্যের মাধ্যমে এসবের জবাবও দিয়েছে। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে সাময়িক এবং বহু আজে-বাজে অভিযোগ করা হতে থাকে, যা সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

---

www.pathagar.org

পরিশিষ্ট-১

একখানা পত্র

জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারতের ১৫০ জন লোকের নিকটে দাওয়াতনামা পাঠানো হয়। তাঁদের মধ্যে এমন অনেক ছিলেন যাঁরা দারুল ইসলামের গঠনতন্ত্র ও উদ্দেশ্যের সাথে একমত হয়ে কাজ করছিলেন। এমন এক ব্যক্তির কাছে নিম্নের দাওয়াতনামা পাঠানো হয়। প্রাপক- জনাব চৌধুরী আব্দুল গনি, চক গেলন, পতোকী, জেলা লাহোর।

তর্জুমানুল কুরআন, লাহোর
তাং ৭ই রজব, হিঃ ১৩৬০

শ্রদ্ধেয় জনাব,

সালাম মসনূন।

আপনার পত্র পাঠে খুশী হয়েছি যে, আপনি কিছুকাল যাবৎ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছেন। আপনার কর্মপন্থাও সঠিক এবং ভালো। একটু বিস্তারিত লিখে জানান যে, আপনি এ যাবৎ কি কাজ করেছেন এবং দু'চার জন যা আপনি তৈরী করেছেন তাঁরা কেমন এবং কি করেন। তাঁরা আন্দোলনের জন্যে কিভাবে উপযোগী হতে পারেন? আপনার অবস্থাও বিস্তারিত জানাবেন। কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন প্রয়োজনীয় বিষয় আপনি ইনশাআল্লাহ জানতে পারবেন।

পঁচিশে আগস্ট (পয়লা শা'বান) আমরা একটি সম্মেলন করছি। উদ্দেশ্য এই যে, সমমনা ঈমানদারগণকে একত্র করে তাঁদের এবং আমাদের নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতার মূল্যায়ন করে আন্দোলনকে সুসংগঠিতভাবে সম্প্রসারিত করা হবে। এখানে আসার জন্যে আপনাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, যাতে আপনি জামায়াতের প্রথম সম্মেলনে শরীক হতে পারেন। থাকার ব্যবস্থা আমরা করবো। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিজেই করতে পারলে তা আপনাদেরই দায়িত্বে রইলো।

পত্রের আদান-প্রদানের দায়িত্ব আমার উপরে-।

ফকীর কামারুদ্দীন

www.pathagar.org

পরিশিষ্ট-২
জামায়াতে ইসলামীর প্রথম সার্কুলার

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জামায়াতে ইসলামীর যে প্রথম সম্মেলন হিঃ ১৩৬০ সালের শা'বান মাসের প্রথম সপ্তাহে লাহোরের পুঞ্চ রোডে অবস্থিত তর্জুমানুল কুরাআনের অফিসে অনুষ্ঠিত হয় তার কার্যবিবরণী এতদসহ পাঠানো হচ্ছে। এ কার্যবিবরণী সাধারণত বিতরণের জন্যে নয়। বরঞ্চ জামায়াতের রুকনদের অবগতির জন্যে। প্রত্যেক স্থানীয় জামায়াত অফিসে এর দু'কপি করে থাকবে- একটি জামায়াতের রেকর্ডে সংরক্ষণের জন্যে এবং অন্যটি জামায়াতের রুকনদের অধ্যয়নের জন্যে। জামায়াতে প্রবেশকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে এবং যারা জামায়াতকে জানতে চায়, তাদেরকে জামায়াতের গঠনতন্ত্রের সাথে এ কার্যবিবরণী পড়িয়ে দেয়া ফলপ্রদ হবে।

কামারুদ্দীন খান,
নাযেম সংগঠন বিভাগ

পরিশিষ্ট-৩
এক নজরে জামায়াতের গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনসমূহ

জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন কিছু মজবুত ও সম্প্রসারিত হওয়ার পর ১৯৪৩ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৪৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত চারটি আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের স্থানগুলো দারভাংগা, দারুল ইসলাম, দিল্লী ও হায়দরাবাদ শহর। (পৃঃ ...)

১৯৪৫ সালে ও ১৯৪৬ সালে দুটি নিখিল ভারত সম্মেলন হয়। প্রথমটি ১৯-২১ শে এপ্রিল দারুল ইসলাম এবং দ্বিতীয়টি ৫-৭ই এপ্রিল এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। (পৃঃ ১২২, ১৪৭)

ভারত বিভাগের পূর্বে আর কোন নিখিল ভারত সম্মেলন করা সম্ভব হয়নি। তার পরিবর্তে চারটি ঐতিহাসিক বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যথাঃ

টুং	-	১৭-১	এপ্রিল	-	১৯৪৭ সাল	(পৃঃ ১৭৮)
মাদ্রাজ	-	২৫-২৬	এপ্রিল	-	১৯৪৭ সাল	(পৃঃ ১৭৯)
পাটনা	-	২৫,২৬	এপ্রিল	-	১৯৪৭ সাল	(পৃঃ ১৮৪)
পাঠানকোট	-	৯-১০	মে	-	১৯৪৭ সাল	(পৃঃ ১৯০)

www.pathagar.org

পরিশিষ্ট-৪

তর্জুমানুল কুরআনের কিছু মূল্যবান কথা

আবু মুহাম্মদ মুসলেহ সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত তর্জুমানুল কুরআন উনত্রিশ বছর বয়স্ক যুবক আবুল আ'লা মওদূদী সম্পাদনায় এক নতুন প্রাণ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করত মুসলমানদের মন-মস্তিষ্ক আলোড়িত করে ইসলামের প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা পেশ করতে থাকে।

প্রথম সংখ্যার ৩য় পৃষ্ঠায় বলা হয়-

"ইসলামকে সেই প্রকৃত আলোকেই পেশ করতে হবে, যে আলোকে কুরআন হাকীম তাকে পেশ করেছে।" .....

পঞ্চম পৃষ্ঠায় বলা হয়-

"মুসলমান ও অমুসলমানকে কুরআন উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে হবে এবং ঐ সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহ-সংশয় দূর করতে হবে, যা কুরআন মজীদ অধ্যয়নের সময়ে পাঠকের মনে উদিত হয়।"

সম্পাদক মওদূদী নিঃসংকোচে তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেন,

"আমি এ দাবী করি না যে, আমার কোন ভুল হতে পারে না। হতে পারে যে, কোন বিষয় বুঝতে এবং তা প্রকাশ করতে আমি ভুল করে ফেলেছি। এমন অবস্থায় আমি আশা করবো, আমার এ ভুল যেন আমার ইচ্ছাকৃত বলে মনে করা না হয়। বরঞ্চ এটাকে যেন আমার অজ্ঞতা এবং উপলব্ধি শক্তির স্বল্পতারই করণ মনে করা হয়। তারপর আহলে ইল্‌ম্ তথা ইসলামী মনীষীগণ যেন আমার সংশোধনের চেষ্টা করেন। আমি এ নিশ্চয়তা দান করছি যে, কেউই আমাকে ভুলের উপর অবিচল থাকার মতো হঠকারী দেখতে পাবেন না।"

একাদশ পৃষ্ঠায় তিনি যা লেখেন, তা একেবারে পাঠকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি বলেন,

"হেদায়েত ও গুমরাহীর রহস্য বড়ো অদ্ভুত রহস্য। একই কথা হাজার জনের কাছে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কেউ সেদিকে কর্ণপাত করে না। কেউ করলেও সে কথা তার কর্ণকুহরের উপরিভাগ থেকেই সটকে বেরিয়ে যায়। কেউ তা শোনে এবং বোঝেও। কিন্তু মানে না। কেউ তার প্রশংসাও করে কিন্তু গ্রহণ করে না। আবার কারো অন্তরে সে কথা স্থান করে নেয় এবং সে তার সত্যতার উপর ঈমান আনে।

পরের পৃষ্ঠায় তার এভাবে ব্যাখ্যা পেশ করা হয়-

একই ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া এবং তার উপর একই জিনিসের প্রভাবের ধরন বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। একই কথা এক ব্যক্তি হাজার বার শুনছে, কিন্তু মানছে না। কিন্তু একটা মুহূর্ত এমনও আসে যে, হঠাৎ হৃদয়ের গ্রন্থি বা বন্ধন একেবারে খুলে যায়। যে কথা কানের পর্দার উপরে আটকে রয়ে যেতো, তা একেবারে সোজাসুজি হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে যায়। তারপর সে অবাক হয়ে বলে, "এ কথা তো আমি আগেও বার বার শুনেছি। কিন্তু আজ এ কি হলো যে, এ আপনা-আপনি হৃদয়ের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করেছে?

www.pathagar.org

আলোচনার এক পর্যায়ে ১৬ পৃষ্ঠায় লেখক বলছেন-

"সর্বাধিক ভাগ্যবান সেই সব সুস্থ প্রকৃতি, সঠিক চিন্তাশক্তি ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, যারা খোদা-প্রদত্ত বিবেক, তাঁর দেয়া দুটি চোখ, দুটি কান এবং শক্তি-সামর্থ্য সঠিক কাজে লাগায়। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে। আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাদি দেখার পর সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে, বাতিলের সৌন্দর্য-শোভা তাদেরকে বিমুগ্ধ করতে ব্যর্থ হয়। মিথ্যার ছলনা তাদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না। গুমরাহীর বক্র পথ দেখেই তারা বুঝতে পারে এ মানুষের চলার যোগ্য পথ নয়। তারপর যখনই তারা হকের শরণাপন্ন হয় এবং তা পাওয়ার জন্যে সামনে অগ্রসর হয়, তখন স্বয়ং সত্য তাদেরকে সম্বর্ধনা জানাতে এগিয়ে আসে। হেদায়েতের আলো তাদের সামনে উদ্ভাসিত হতে থাকে। তারপর সত্যকে সত্য বলে এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলে উপলব্ধি করার পর দুনিয়ার কোন শক্তি আর তাদেরকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে এবং গুমরাহীর দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় না।"

এই হলো তর্জুমানুল কুরআন এবং এ জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথাগুলো ছিল যুবক সাইয়েদ মওদূদীর, যা ছিল কুরআনেরই আলোকে মণ্ডিত, সত্যের সুষমায় সজ্জিত, বিবেকের কাছে অপরিহার্য এবং ঈমান ও আমলের প্রেরণাদায়ক।

তাঁর চিন্তাধারা তর্জুমানুল কুরআনের পৃষ্ঠাগুলোর সৌন্দর্য বর্ধন করতে থাকে। তিনি জীবন সম্পর্কে ইসলামী ধারণা সর্বপ্রথম এভাবে পেশ করেন-

"ইসলামে না তো দুনিয়া পরিত্যাজ্য ও ঘৃণার্হ কোন বস্তু, আর না এমন কোন বস্তু যার প্রতি মানুষ মোহাবিষ্ট হয়ে পড়বে এবং তার ভোগের আস্বাদ গ্রহণে মগ্ন হয়ে থাকবে। না সে একেবারে মানসিক প্রশান্তির স্থান, আর না একেবারে অশান্তি-অনাচারের। তার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখাও ঠিক নয় এবং তার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যাওয়াও ঠিক নয়। না সে একেবারে অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত, আর না পুরোপুরি পূত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। তারপর এ দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক না এমন যেমন বাদশাহের সম্পর্ক তার রাজ্যের সাথে। না মানুষ এতোটা নগণ্য যে দুনিয়ার প্রতিটি শক্তির কাছে সে মাথা নত করবে, আর না এতোটা বিজয়ী ও পরাক্রমশালী যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু তার কাছে মাথা নত করবে। না সে এতোটা অসহায় যে, তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-বাসনার কোন মূল্যই নেই। আর না সে এতোটা শক্তিশালী যে, তার ইচ্ছা ও মর্জিই সবকিছু। না সে বিশ্বজগতের একমাত্র প্রভু ও শাসক, আর না অসংখ্য খোদার অসহায় গোলাম। প্রকৃত সত্য যা কিছু তা হলো এই যে, এ বিভিন্ন প্রান্তিকতার (Extremes) মধ্যে এক মধ্যবর্তী অবস্থা।

তিনি আরও বলেন-

"দ্বীন ইসলামের গোটা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ তায়ালার সত্তা। এ সমগ্র ব্যবস্থা তার চার ধারেই আবর্তন করে। আর এ ব্যবস্থার মধ্যে যা কিছুই আছে- নিয়ত ও বিশ্বাসের অর্থে হোক অথবা পূজা-অর্চনা ও দাসত্ব আনুগত্যের অর্থেই হোক, অথবা দুনিয়ার জীবন সম্পর্কিত ব্যাপারেই হোক, সর্বাবস্থায় তার মুখ সেই কেন্দ্রীয় সত্তার দিকেই ফেরানো রয়েছে। আর প্রতিটি বস্তু তার আকর্ষণ শক্তির তারে বাঁধা রয়েছে। স্বয়ং দ্বীন (আনুগত্য) এবং ইসলাম (মস্তিষ্ক অবনতকরণ) নামক যে দুটি শব্দের দ্বারা

www.pathagar.org

এ ধর্মীয় ব্যবস্থার নাম করা হয়েছে, তা অর্থের স্বভাব-প্রকৃতি ও মর্মকথা সুন্দরভাবে প্রমাণিত করে। 'দ্বীন' ও 'ইসলামের' অর্থ এই যে, বান্দাহ তার খোদার সন্তুষ্টির জন্যে মাথা নত করবে এবং তাঁর মর্জির অধীন হয়ে যাবে। ...

এ কারণেই ইসলামে যা কিছু আছে তা খোদারই জন্যে। নামায যদি খোদার জন্যে না হয়, তাহলে তা হবে এক অর্থহীন উঠা-বসা, রোযা যদি খোদার জন্যে না হয়, তাহলে তা হবে নিছক না খেয়ে থাকা বা উপবাস। যাকাত ও দান-খয়রাত যদি খোদার জন্যে হয়, তাহলে তা হবে ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ আল্লাহর পথে ব্যয়। নতুবা হবে নিছক অপব্যয়। .... যুদ্ধ ও জিহাদ যদি হয় খালেসাতান লিল্লাহ (খাস করে আল্লাহর জন্যে) এবং আল্লাহর পথে, তা হলে তা হবে সর্বোত্তম ইবাদত। নতুবা হবে অন্যায় রক্তপাত এবং তাগুতের পথে জিহাদ।

কাজের সূচনার পরই ১৯৩২ সালে তিনি তাঁর তর্জুমানুল কুরআনে বলেন, "এখন কাজের যে ক্রমিক ধারা আমার মনে রয়েছে তা এই যে প্রথমে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তাধারার সে প্রাধান্য ভেঙে দিতে হবে, যা মুসলমানদের প্রতিভাবান মহলের উপর চেপে বসেছে। এ কথা তাদের মনে বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে, ইসলামের একটি নিজস্ব জীবন বিধান আছে। তার একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে, একটা চিন্তাধারা ও তার বিধান আছে- একটা শিক্ষা ব্যবস্থা আছে, যা সবদিক দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তৎসংক্রান্ত সকল বিষয় থেকে অতি উচ্চ মানের। এ ধারণা তাদের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে যে, সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপারে তাদের কারো কাছে ভিক্ষা চাওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদেরকে এ কথা বলে দিতে হবে যে, তোমাদের রয়েছে একটি নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, যা দুনিয়ার যাবতীয় বিধান থেকে শ্রেষ্ঠতম। পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র সমালোচনা করে তাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট করে দিতে হবে যে, পাশ্চাত্যের যে ব্যবস্থার দ্বারা তারা প্রভাবিত ও পরাভূত হয়ে পড়েছে, তার প্রতিটি দিক ও বিভাগে কি কি দুর্বলতা রয়েছে।

সাইয়েদ মওদূদী এখানে এক সত্যের উদঘাটন করলেন যা ইতিপূর্বে কোন ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেমের মুখে শুনা যায়নি। তা হলো, ইসলামের একটা নিজস্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তৎকালীন ভারতের প্রখ্যাত আলেমগণের জানাই ছিল না যে, ইসলামে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে। তাই তাদের অনেকেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রবক্তা হয়ে পড়েছিলেন এবং অসংখ্য মুসলিম যুবক সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। যুবক সমাজ ও গোটা মুসলিম জাতিকে সমাজতন্ত্রের প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা করেন সাইয়েদ মওদূদী। ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা না থাকলে তা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হয় কি করে? এ সম্পর্কে তৎকালীন আলেম সমাজের ধারণা যে অস্পষ্ট ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। মাওলানা মওদূদীই সর্বপ্রথম ইসলামকে মানব জাতির একমাত্র কল্যাণকর পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে বিবেকসম্মত যুক্তিসহ প্রমাণিত করেন। তাই তিনি ছিলেন ইসলামী পূর্ণাঙ্গ রেনেসাঁর ফ্রাস্রষ্টা।

এখানে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাওলানা সূচনাতেই বলেছিলেন তিনি নিজেকে ভুলের উর্ধে মনে করেন না। তিনি আহলে ইলম তথা ইসলামী মনীষীবৃন্দের কাছে এ আবেদন রেখেছিলেন যে, তিনি ভুল করলে তা যেন সংশোধন করে দেয়া

www.pathagar.org

হয়। যাঁরা সত্যপন্থী ও সত্যাশ্রয়ী, তাঁরা যুবক মওদূদীর অতুলনীয় প্রতিভার প্রশংসা করেন। কিন্তু ত্রুটি অনুসন্ধান করাই যাঁদের স্বভাব, হিংসার অনলে দগ্ধীভূত হয়ে অপরের প্রতিভার স্বীকৃতি দানে যাঁরা নারাজ, তারা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ত্রুটি অনুসন্ধানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অমূলক ফতোয়াবাজীর পথ বেছে নেন। দুনিয়া তাঁদেরকে সম্মানের চোখে দেখেনি, দেখবেও না।

পরিশিষ্ট- ৫
জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার কিছু মূল্যবান কথা

দল গঠনের আবশ্যকতা

হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, জামায়াত বা দল ব্যতীত সত্যিকার ইসলামী জীবন হয় না। জীবন প্রকৃতপক্ষে ইসলামী হতে হলে সবচেয়ে প্রয়োজন যে বস্তুর, তা হচ্ছে এই যে, ইসলামের লক্ষ্য অর্থাৎ ইকামতে দ্বীনের সাথে হতে হবে সংশ্লিষ্ট। এর দাবী হচ্ছে এই যে, এ লক্ষ্যের জন্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ শক্তি ব্যতীত এ প্রচেষ্টা সম্ভব নয়। অতএব জামায়াত ব্যতিরেকে কোন জীবনকে ইসলামী বলা মারাত্মক ভুল হবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, কোন ব্যক্তি আমাদের জামায়াতে শামিল না হোক, কিন্তু সে এমন জামায়াতে শামিল হোক যার লক্ষ্য এই হবে এবং যার দলীয় সংগঠন ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবার পদ্ধতি ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী হবে। এমতাবস্থায় তাকে আমরা সত্য পথগামী বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করবো না। কিন্তু ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের যে পদ্ধতি শরিয়তে বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি শুধু তারই অনুসরণ করুক এবং ইকামতে দ্বীনের চেষ্টাচরিত্রের জন্যে কোন জামায়াতে শামিল না হোক- এ আমাদের কাছে ঠিক নয়। এমন জীবনকে আমরা অর্ধ জাহেলিয়াতের জীবন মনে করি। আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিমতে ইসলামের সর্বনিম্ন দাবী এই যে, যদি কোন ব্যক্তি তার চারিপার্শ্বে ইসলামী লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ইসলামী পদ্ধতিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকারী কোন জামায়াতকে দেখতে না পায়, তাহলে তার উচিত হবে এরূপ কোন দল গঠনের চেষ্টা করা এবং তাকে এজন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে যে, যখনই এ ধরনের কোন জামায়াত পাওয়া যাবে তখন তার সকল আমিত্ব বিসর্জন দিয়ে জামায়াতের মনোভাব নিয়ে তাতে শামিল হতে হবে। (রাসায়েল ও মাসায়েল)

তাবলীগ ও বিপ্লব-

আপনার পত্র থেকে যতটুকু বুঝতে পেরেছি তার মর্ম হলো এই যে, বর্তমান সময়ে শুধু মৌখিক তাবলীগ, বক্তৃতা, প্রবন্ধ লিখন ও পত্র-পত্রিকার দ্বারা প্রচার চালানো হোক। এর উপরে না নিজের কোন আমল করার দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন আছে। তারপর যখন সকল মুসলমানের মনমস্তিষ্ক আমাদের ভাবধারায় প্রভাবিত হবে, তখন হঠাৎ একদিন বিপ্লব ঘটবে!

ধারণাটি তো বেশ চমৎকার! কিন্তু তাবলীগ ও বিপ্লবের পথ যে এক নয়, তার কি করা যাবে? প্রভাবশীল ও কার্যকর তাবলীগ কেবলমাত্র তখনই হতে পারে, যখন

www.pathagar.org

তাবলীগকারী দল তার নীতির উপর আমল করবে এবং এর উপরে আমলকারীদেরকে সংগঠিত করবে। শুধু ওয়াযনসিহত বহুদিন ধরে চলে আসছে। তার কি ফল হয়েছে? (রাসায়েল ও মাসায়েল)

ইকামতে দ্বীন একটি অটল ও অপরিহার্য কর্তব্য

প্রত্যেক সত্যানুসন্ধী ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য এই যে, সে যেন তার মধ্যে ইকামতে দ্বীনের তীব্র অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। অতঃপর সে চেষ্টা করবে যাতে করে তার মনের মধ্যেও এ আগুন জ্বলে উঠে। এ চেষ্টাচরিত্রের পরিণাম কি হবে, তা আলোচনা বহির্ভূত। এমনও হতে পারে যে, আমাদের করাত দিয়ে চিরা হবে, মাটির উপর দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে নেয়া হবে, জ্বলন্ত কয়লার উপর নিক্ষিপ্ত করা হবে এবং আমাদের মৃতদেহ কাক-চিলের খাদ্য হবে। এতোসব করেও হয়তো আমাদের এ সৌভাগ্য হবে না যে, বর্তমান বাতিল ব্যবস্থাকে আমরা একটা সত্য-সুন্দর ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করতে পারবো। কিন্তু এ ব্যর্থতা কোন ব্যর্থতা নয়। ব্যর্থতার কোন আশঙ্কা বরঞ্চ নিশ্চয়তা আমাদেরকে ঐ দাবী থেকে মুক্তিদান করবে না, যে দাবী ইকামতে দ্বীনের জন্যে আল্লাহ তায়ালা করেছেন। এ একটা অটল অপরিহার্য কর্তব্য, যা আমাদেরকে যে কোন মূল্যে যে কোন অবস্থায় পালন করতে হবে। যদি সকল খানকাহ আমাদেরকে এ আশ্বাস দেবার চেষ্টা করে যে, অমুক অমুক ওযীফা-তপ্‌জফ্‌ এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারে, তাহলে আমি আপনাদের নিশ্চয়তার সঙ্গে বলবো যে, এ শয়তানী প্রবঞ্চনা মাত্র! যতোক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের ঘাড়ে মাথা রয়েছে, আর আল্লাহর দ্বীনের প্রাসাদের একখানা ইটও তার স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে আছে এবং আল্লাহর পৃথিবীর সূচাগ্র ভূমি আল্লাহ ব্যতীত অপরের দাসত্বে নত হয়ে আছে, ততোক্ষণ আপনাদের জন্যে শান্তির নিদ্রা হারাম। (জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী- ৩য় খণ্ড)

হুকুমতে ইলাহিয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টি

ইকামতে দ্বীনের এ প্রচেষ্টা সম্পর্কে কিছু বলতে পারি না যে, এর ফলাফল কি হবে। পরিণাম ফল তো আল্লাহতায়ালাই জানেন। এ প্রচেষ্টার ফল যদি এ হয় যে, আমরা একটা সৎ সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হয়েছি, তাহলে তা হবে আল্লাহর দান। কিছু সংখ্যক লোক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে এ কথা বলে যে, আমাদের সকল প্রচেষ্টা ক্ষমতা লাভের জন্যে এবং দ্বীনের আসল উদ্দেশ্য যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, তা আমাদের মধ্যে নেই। তাদের এ ধারণা একেবারে ভ্রান্ত। আমাদের সকল প্রচেষ্টা একটা সৎ এবং খোদায়ী ব্যবস্থার জন্যে। এ প্রচেষ্টায় কোন অপরাধ নেই এবং এতে লজ্জারও কিছু নেই। আমরা যখন হুকুমতে ইলাহিয়ার নাম করি তখন আমরা উপরোক্ত ব্যবস্থাকেই বুঝাই। আমি বুঝতে পারি না যে, এটা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত হলে এতে বিতর্কের কি আছে? এবং এটা খোদার সন্তুষ্টি কামনার পরিপন্থীই বা কি করে হবে? খোদার পৃথিবীতে একমাত্র খোদারই বিধান চলবে-এর চেয়ে অধিক খোদার সন্তুষ্টি লাভ আর কি প্রকারের হতে পারে? তাদের চেয়ে অধিক খোদার সন্তুষ্টি কামনাকারী আর কে হতে পারে, যারা এ কাজের জন্যে জান-মাল ত্যাগ করে এবং ফলাফল যাই হোক না কেন, খোদার পৃথিবীতে খোদা ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব

www.pathagar.org

কিছুতেই চলতে দিতে চায় না? এ ধরনের সংগ্রাম প্রচেষ্টা যদি দুনিয়াদারী হয়, তবে দ্বীনদারী কি একে বলে যে, রাত্রি জেগে 'আল্লাহ' যেকের করা হবে, আর দিনের বেলায় শয়তানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হবে? যারা এ ধরনের কথা বলে, তাদের মনমস্তিষ্কে দ্বীন সম্পর্কে অতি নিকৃষ্ট ধারণা রয়েছে। (জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী- ৩য় খণ্ড)

সত্য পথের দাবী

এ পথের প্রকৃত দাবী এই যে, আমাদের মধ্যে যেন বিরোধিতাকে স্বাগত জানাবার অনুরাগ সৃষ্টি হয়। সত্য পথেই আর ভ্রান্ত পথেই হোক, আল্লাহ তায়ালার নীতি এই, যে ব্যক্তি যে পথই অবলম্বন করে, সে পথেই তার অগ্নিপরীক্ষা হয়। হক পথের তো বৈশিষ্ট্যই এই যে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ অগ্নিপরীক্ষায় পরিপূর্ণ। যেমন অঙ্ক শাস্ত্রের কোন মেধাবী ছাত্র কঠিন প্রশ্নে সন্তুষ্ট হয় এ জন্যে যে, তার মেধাশক্তির পরীক্ষার সুযোগ এসেছে। ঠিক এরূপ কোন দৃঢ় সংকল্প মুমিন কোন নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে আনন্দ পায় এ জন্যে যে, তার আনুগত্য প্রমাণ করার সুযোগ এসেছে। ক্ষীণ প্রদীপ বাতাসের ঝাপটায় নিভে যায়, কিন্তু প্রজ্বলিত উনুনকে বাতাসের ঝাপটা আরো অধিকতর প্রজ্বলিত করে দেয়। আপনারা নিজেদের ভিতরে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করুন যে, যেভাবে একটা প্রজ্বলিত উনুন সিক্ত জ্বালানির দ্বারা নিভে না গিয়ে বরং তাকে তার খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, তেমনি আপনারা বিরোধিতার কাছে নত না হয়ে বরং তা থেকে খাদ্য এবং শক্তি সংগ্রহ করুন। যতোদিন না এ যোগ্যতা আমাদের মধ্যে পয়দা হয়েছে, ততোদিন এ আশা করা যেতে পারে না যে, আমাদের দ্বারা দ্বীনের কোন ভালো খেদমত হতে পারে। (জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী- ৩য় খণ্ড)

পরিশিষ্ট-৬
সন্দেহ-সংশয় নিরসন

জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই দেশের দু'তিন জন বুযুর্গানে দ্বীনের মধ্য থেকে একজন পত্রের মাধ্যমে জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার কাছে কিছু সন্দেহ-সংশয় ব্যক্ত করেন। জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী তার যে জবাব দেন ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরের তর্জুমানুল কুরআনের একত্রে প্রকাশিত সংখ্যায় "সন্দেহ-সংশয় নিরসন" শিরোনামে সে জবাব প্রকাশিত হয়। এ জবাবে জামায়াত প্রতিষ্ঠাতার মনের অবস্থা পুরোপুরি পরিস্ফুট হয়। তাঁর বক্তব্যের মৌলিক কথাগুলো ও তার বৈশিষ্ট্য আর একবার তাঁরই ভাষায় জনসমক্ষে পরিবেশিত হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

পত্র লেখক তাঁর পত্র প্রকাশের অনুমতি দেননি। সে জন্যে জবাবের সাথে সে পত্রখানা তর্জুমানুল কুরআনে প্রকাশিত হতে পারেনি। কিন্তু পত্রে যে সব সন্দেহ-সংশয় ব্যক্ত করা হয়েছিল, তা জবাবের মাধ্যমেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

www.pathagar.org

মাওলানার জবাব

মুহতারাম মাওলানা! আসসালামু আলায়কুম।

আপনি যে সব সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন তা জানার পর আমার মনে এ সন্দেহই হয়েছে যে, আপনি আমার সে সব লেখা মোটেই পড়েননি যা অতি সম্প্রতি প্রকাশ লাভ করছিল। এ কারণেই সে সব সন্দেহ-সংশয় আপনার পবিত্র মনে সৃষ্টি হয়েছে। আর অন্যের মুখে আমার ধ্যান-ধারণার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুনেই অধিকাংশ বুযুর্গানের মনে এ ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হয়। আপনার মতো অতি কর্মব্যস্ত লোককেও আমি এ কথা বলতে পারি না- "আমার লেখাগুলো আগাগোড়া পড়ে দেখুন।" কিন্তু লোকের ভুল ব্যাখ্যার কারণে কিছু নেক ও বুযুর্গ লোক আমার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করুন এটাই বা আমি কিরূপে সহ্য করতে পারি- যেহেতু তাঁদের দোয়া ও বাস্তব সাহায্য-সহযোগিতার আমার প্রয়োজন রয়েছে! অতএব, সংক্ষেপে আমার চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা স্বয়ং তুলে ধরাই সমীচীন মনে করছি এবং তারপর জানতে চাইবো যে, এখন আর কোন সন্দেহ-সংশয় রয়েছে কি না।

১। আমার দৃষ্টিতে দুনিয়ায় এমন এক সময় এসে পড়েছে যে, একটি যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং আর এক যুগের সূচনা হচ্ছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তার বুনিয়াদের উপর যারা কাজ করছিলেন, তাদের যতোটুকু সুযোগ পাবার ছিল, আমার মনে হয়, তা তাঁরা পুরোপুরি লাভ করেছেন। এখন এ সমগ্র ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ফলে অন্য এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্বে যে উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় তারও সূচনা হয়েছে। যদিও ইকামতে দ্বীনের চেষ্টাচরিত্র করা প্রত্যেক যামানায় আহলে ঈমানদের জন্যে ফরয, কিন্তু বিশেষ করে এমন এক সময় যখন দুনিয়া প্রচলিত ব্যবস্থাগুলোর তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিরাশ হয়ে পড়ছে এবং অন্য কোন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে, তখন দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা অধিকতর প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। যে সব সুযোগ-সুবিধা এখন সৃষ্টি হয়েছে তার সদ্ব্যবহার যদি এখন আমরা না করি, তাহলে আমাদেরকে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে।

২। আমার বড়ো দুঃখ হয় যে, প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য পর্যন্ত মুসলমান সাধারণত নিছক সাময়িক ও স্থানীয় সমস্যাবলী এবং ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে বিব্রত আছে এবং দুনিয়ার প্রশস্ততর অঙ্গনে বাতিল ব্যবস্থার সংঘর্ষে দ্বীনে হক প্রতিষ্ঠার যে সুযোগ এসেছে তার প্রতি কোন মনোযোগই দিচ্ছে না। প্রত্যেক স্থানে তাদের ছোটো-বড়ো দলগুলো হয় তাদের দেশীয় ও জাতীয় সমস্যা সমাধানে ব্যতিব্যস্ত, অথবা কোন ধর্মীয় চিন্তা থাকলে ব্যস এতোটুকু যে, বাতিল ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় কোন ধর্মীয় অধিকার লাভ করতে পারলেই যথেষ্ট মনে করা হয়। দুনিয়ায় সংঘাত এ বিষয়টি নিয়ে চলছে যে, দেশ কার এবং সেখানে দ্বীন (ব্যবস্থা) কার চলবে! চারদিক থেকে বিভিন্ন দাবীদার এ দাবী নিয়ে ময়দানে আসছে, "দেশ আমাদের এবং ব্যবস্থা আমাদেরই চলা উচিত।" কিন্তু দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত কোথাও এ দাবী শুনা যাচ্ছে না যে, দেশ খোদা ছাড়া আর কারো নয়, এবং খোদার দ্বীনেরই এ অধিকার রয়েছে যে, যমীনের উপর একমাত্র তারই প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। দুনিয়ায় প্রত্যেক দাবী আদায়ের লক্ষ্যে জীবন নেয়া ও দেয়ার জন্যে

www.pathagar.org

লোক রয়েছে। প্রতিটি উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে আঘাত খাওয়ার ও ক্ষতি স্বীকারের লোক পাওয়া যায়। কিন্তু খোদার যমীনে এমন কেউ নেই যে, খোদার কর্তৃত্ব-প্রভুত্বের দাবীর জন্যে মারতে ও মরতে এবং খোদার দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে আঘাত খেতে ও ক্ষতি স্বীকার করতে প্রস্তুত।

৩। এটা তো পরিস্কার যে, ইকামতে দ্বীনের সংগ্রাম করার জন্যে যদি কোন দল দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে ঐ সব লোকের মধ্য থেকেই দাঁড়াবে যারা আপনার কথায় "মুহাম্মদ (সঃ)-কে তাদের জ্ঞানের নির্ভুলতার মানদণ্ড বানায় এবং আল্লাহর মর্জির প্রতিনিধি বলে গণ্য করে।" কিন্তু এ বিরাট কাজের জন্যে নিছক এ কথার উপর বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত আমল পর্যন্ত আনুগত্য করাই যথেষ্ট নয়। এ কাজ এমন এক জামায়াতের দাবী করে, যারা এ ব্যাপারে এতোটা শক্তিশালী ও কঠোর হবে যে, অন্যকেও এ বিশ্বাস ও তাঁর আমলের দিকে টেনে আনতে পারবে। অতঃপর তারা এ দাবী নিয়ে দাঁড়াবে যে, তারা দুনিয়ার ধ্বংসোন্মুখ ব্যবস্থাকে অন্য কোন বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না। বরঞ্চ নিজেদের একীন ও ঈমান, আমল ও জিহাদের শক্তি দিয়ে তাকে দ্বীনে হকের বুনিয়াদের উপরই কায়েম করতে বাধ্য করবে।

৪। দু' অবস্থাতেই এ দল সংগ্রহ করা সম্ভব। হয় তারা সে সব মুসলমানের মধ্য থেকেই আসবে যারা উপরে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে। অথবা তাদের মধ্য থেকেই আসবে যারা এ বিশ্বাস পোষণ করবে। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্য থেকে রিক্রুট করা ততোক্ষণ পর্যন্ত কঠিন হবে, যতোক্ষণ প্রথম শ্রেণী থেকে একটি নির্ভরযোগ্য দল সৃষ্টি না হয়- যারা নিরঙ্কুশভাবে এ আকীদাহ-বিশ্বাস অথবা তদনুযায়ী ব্যক্তিগত ক্রিয়াকর্মই যথেষ্ট মনে করবে না, বরঞ্চ সে আকীদাহ-বিশ্বাসের প্রচার-প্রসার এবং তার উপর দুনিয়ার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে অগ্রসর হবে। এ জন্যে আমি অমুসলিমদের আগে মুসলমানদের প্রতিই আহ্বান জানিয়েছি।

৫। সাধারণ মুসলমান সম্পর্কে আমারও সেই ধারণা যা আপনার রয়েছে। আমিও এটাই মনে করি যে, তারা নবী (সঃ) কে খোদার মর্জির প্রতিনিধি ঠিক সে ভাবেই মানে যেভাবে একজন মুমিনের মানা উচিত। কিন্তু যখন আমি ইকামতে দ্বীনের উদ্দেশ্য সামনে রেখে ঐসব মুসলমানের প্রতি তাকিয়ে দেখি, তখন আমি অনুভব করি যে, যে পর্যায়ের ঈমান ও একীন এবং যে পর্যায়ের আমলকে তাঁরা যথেষ্ট মনে করে বসে আছেন, তা এ উদ্দেশ্যের জন্যে যথেষ্ট নয়। উপরন্তু ওসব মুসলমানের মধ্যে এমন লোকও আছেন যারা দ্বীনের মৌলিক বিষয় সম্পর্কেও ওয়াকেফহাল নন এবং মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও নিকৃষ্ট ধরনের বিশ্বাসমূলক ও বাস্তব গুমরাহীতেই শুধু লিপ্ত নন, বরঞ্চ তার উপর এতোটা অটল যে, তাঁদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসা কোন অমুসলিমকে মুসলমান বানানো থেকে কম কষ্টকর নয়। তাঁদের মধ্যে এমন লোকও তো আছেন, যাঁরা আকীদাহ-বিশ্বাসে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আপন প্রবৃত্তিকে তাঁরা তাঁদের ইলাহ বানিয়ে রেখেছেন এবং গ্রহণ ও বর্জন, পছন্দ ও অপছন্দের সেই মানদণ্ডকে কার্যকর করতে কিছুতেই প্রস্তুত নন, যা নবী (সঃ) পেশ করেছেন। মুহাম্মদ (সঃ)-এর নিকটে যা মর্যাদার যোগ্য তা তাদের কাছে মর্যাদার অযোগ্য। নবী (সঃ) যাকে মুনকার ও

www.pathagar.org

পরিত্যাজ্য বলে গণ্য করেছেন, তাই তাঁদের কাছে মারূফ ও প্রিয়, বরঞ্চ একেবারে কাম্য। তাঁদের মধ্যে এমন লোকও তো আছেন যাঁরা ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীলও আছেন, আবার ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠাকে তারা অসম্ভবই মনে করেন না বরঞ্চ এ অভিমত পোষণ করেন যে, চোরের হাতকাটা, ব্যভিচারীর বেত্রাঘাত অথবা মৃত্যুদণ্ড এবং সুদের নিষিদ্ধকরণ ও এ ধরনের আইন-কানুন বর্তমান যুগে ন্যায়সঙ্গত নয়। তাদের মধ্যে এমন লোকও আছেন, যাঁরা ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করেন, কিন্তু কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব, নৈতিকতা, তাহযীব-তামাদ্দুন, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়ের বিশদ বর্ণনায়, আকীদাহ এবং পথ ও পন্থা উভয় দিক দিয়ে তারা অনৈসলামিক আদর্শেরই অনুসারী। তাঁদের মধ্যে এমন লোকও আছেন, যারা খোদা, রেসালাত ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখেন না বরঞ্চ সন্দেহ-সংশয় ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে লিপ্ত। এমন লোকও আছেন, যারা খোদা, রসূল, ফেরেশতা, দোযখ ও বেহেশত সবেরই অস্বীকারকারী এবং শুধু অস্বীকারকারীই নন, বরঞ্চ এসবের বিশ্বাস, রোযা, নামায প্রভৃতির প্রতি বিদ্রূপ করতেও কুণ্ঠিত নন। এমন লোকও আছেন, যারা দ্বীনকে স্বীকার করেন এবং তার রুকনগুলোও পালন করেন। কিন্তু দুনিয়ার লালসায় এতোটা নিমগ্ন যে সামান্য কিছুর বিনিময়ে দ্বীনের বিরুদ্ধে যে খেদমতই তাঁদের কাছে চাওয়া হোক এবং যে, ধরনের গাদ্দারী ও বেঈমানীর দাবীই করা হোক, স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তা করার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে যান। এমন লোকও আছেন, যাঁরা দ্বীনের অস্বীকারকারীও নন এবং স্বীকার কারীও নন। এ নিয়ে তাঁদের কোন মাথাব্যথাই নেই যে হক কি এবং বাতিলই বা কি। তাঁদের কাম্য শুধু এতোটুকু যে, তাঁদের প্রবৃত্তির ও দেহের দাবী পূরণ হোক এবং এ চিন্তায় তারা এমন নিমগ্ন যে, অন্যান্য সবকিছু থেকে তাঁরা উদাসীন।

এ সব ধরনের লোক সাধারণ মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত। তারা সব এমন মিশ্রিত হয়ে আছেন যে, এ সমষ্টির মধ্যে এ পার্থক্য করা মুশকিল যে, কে কোন ধরনের মুসলমান।

৬। একথা সুস্পষ্ট যে, ইকামতে দ্বীনের জন্যে চেষ্টা করতে হলে এ সমগ্র জনগোষ্ঠীকে সেই রেডিমেড ইসলামী জামায়াত বলা যায় না যাদের নিয়ে কোন সংগ্রাম করা যেতে পারে। জাতীয় স্বার্থের জন্যে যে সব দল কাজ করে তাদের জন্যে এ অবশ্যই সম্ভব যে, তারা এক কর্মসূচি তৈরী করে সকল মুসলমানকে এই বলে ডাক দিবে "এসো দু'আনা-চারআনা চাঁদা দিয়ে ফরম পূরণ করো এবং জাতির সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে যাও।" তারা সকল প্রকার অপদার্থ লোকদের একত্রে জমা করতে পারে এবং তাদের কাজ এ ভাবে চলতে পারে। কিন্তু আমরা সে উদ্দেশ্যে একটি দল গঠন করতে চাই, তার জন্যে এ ধরনের লোক একত্রীকরণ কোন কাজের হবে না, বরঞ্চ অবশ্যই ক্ষতিকর হবে। অগত্যা আমাদেরকে মুসলমানদের ঐ মিশ্র জনগোষ্ঠী থেকেই শুধু নেক লোক বাছাই করে নিয়ে সংগঠিত করতে হবে। আর নেক লোককে বাছাই করে বের করার উপায় এ ছাড়া আর কিছুই নেই যে, আমরা ইসলামের নির্ভুল আকীদাহ-বিশ্বাস, হুকুমতে এলাহিয়ার লক্ষ্য এবং শরীয়তের নৈতিক ও আইনগত নিয়মনীতিগুলো মুসলমানদের সামনে পেশ করবো। তারপর তাদের মধ্যে যে সব লোক এ আকীদাহ-বিশ্বাস স্বীকার করে নেবে, ঐসব নিয়মনীতি অনুসরণ করতে রাজি হবে এবং ঐ লক্ষ্যকে জীবনের

www.pathagar.org

লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে, শুধু তাদেরকেই জামায়াতে গ্রহণ করা হবে। আমি দীর্ঘদিন যাবৎ দিনরাত এ বিষয়ে চিন্তাভাবন করছি যে, দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদের এই যে পাঁচমিশালী এক যৌগিক পদার্থ (Compound) তৈরী হয়েছে, তার থেকে সত্যিকার মুসলমানদের কিভাবে বাচাই করে বের করা যায়। বিশ্বাস করুন, চিন্তা করতে করতে শ্রান্ত-ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও এ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোন পদ্ধতি আমি দেখতে পাইনি। আপনি অথবা অন্য কোন বুযুর্গ অন্য কোন পদ্ধতি বলে দিতে পারেন তো অবশ্যই বলুন।

৭। আমার আসল উদ্দেশ্য হলো ইকামতে দ্বীনের সংগ্রামের জন্যে নেকলোক বাছাই করে বের করা। মুসলমানদের মধ্যে কুফর ও ঈমানের বিতর্ক সৃষ্টি করা নয়। বর্তমানে মুসলমানদের ঈমান ও আখলাকের যে অবস্থা, তার সমালোচনার উদ্দেশ্যেও আমার শুধু একথা বলা যে, দাওয়াত ইলাল্লাহর (আল্লাহর দিকে দাওয়াত) মহান উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখলে মুসলমানদের মধ্যে এ সময়ে কি কি ত্রুটি-বিচ্যুতি পাওয়া যায় এবং এ কাজের জন্যে মুসলমানদের এ জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কোন ধরনের লোক উপযোগী ও বাঞ্ছনীয়।

জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্রে সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে শপথ গ্রহণকে রুকনিয়াতের (সদস্যপদের) শর্ত হিসেবে গণ্য করার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, যারা এ কাজের জন্য নিজেদেরকে পেশ করবেন, তাঁদের সম্পর্কে এ নিশ্চয়তা লাভ করা যে, তারা নির্ভুল ও খাঁটি ইসলামী আকীদাহ পোষণ করেন এবং দুর্ভাগ্যবশত মুসলমানদের মধ্যে জাহেলিয়াতের যে ভেজাল প্রবেশ করেছে, সে ভেজালসহ তাঁরা জামায়াতে প্রবেশ করছেন না। উপরন্তু দাওয়াত ইলাল্লাহর খেদমত শুরু করার পূর্বে তাঁরা আরেকবার নতুন করে আল্লাহর সাথে শপথ ও অঙ্গীকার সূত্রে আবদ্ধ হবেন এবং নতুন মুসলমানী প্রেরণা ও উৎসাহউদ্যম নিয়ে কাজে অগ্রসর হবেন।*

---

* জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করতে হলে নতুন করে ঈমানের ঘোষণা করা অপরিহার্য শর্ত। এতে অনেকে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, উলামা, ফুকাহা, মাশায়েখ এবং খ্যাতনামা আহলে ঈমানদের জন্যে এ শর্ত মেনে চলার উপর জোর দেয়ার কি প্রয়োজন? কিন্তু তাঁরা এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখেন না যে, যদি কিছু লোকের নিকট থেকে নতুন করে ঈমানের ঘোষণা নেয়া হয় এবং কিছু লোকের নেয়া না হয়-তা হলে যাদের নেয়া হবে তারা বলবেন, "আমরা কি কাফের ছিলাম যে, আমাদের এখন ঈমনের সাক্ষ্য নেয়া হচ্ছে? তাছাড়া, ইকামাতে দ্বীনের জন্যে সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতরণ করার সময় পূর্ণ দায়িত্বানুভূতিসহ তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য দানের ফলে যে বিপ্লবাত্মক মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তার গুরুত্ব এসব লোক উপেক্ষা করেন। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, জামায়াতে ইসলামীর সর্বপ্রথম সম্মেলনে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের জানা আছে যে, এভাবে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করতে গিয়ে এ অনুভূতিতে তাঁদের শরীর রোমাঞ্চিত হয় যে কতো বড়ো কঠিন কাজের ঘোষণা তাঁরা করছেন। সে সময়ে তাঁরা এ কঠিন কাজের পরিপূর্ণ দায়িত্বের বোঝা অনুভব করেন। আমরা দেখেছি যে, অনেকের জীবনে এ ঘোষণার সাথে সাথে এক বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফেকাহসুলভ ও দার্শনিক কূটতর্কের অভ্যাস মানুষকে এ সূক্ষ্ম অবস্থা উপলব্ধি করা থেকে বঞ্চিত রেখেছে। নিদেন পক্ষে ত তাঁদের এতোটুকু চিন্তা করা উচিত যে, নামাযে দৈনিক বিশবার এবং আযানে দৈনিক পাঁচবার যখন এ সাক্ষ্য তাঁরা দিচ্ছেন তো তাঁদের জীবনের এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে একবার এ ঘোষণা করতে দোষটা কোথায়? কিছু মুসলমানের সামনে আল্লাহর তাওহীদ এবং নবীর রেসালাতের সাক্ষ্য দান করা এমন কি খারাপ কাজ যে, এতে তাঁদের অবমাননা হয়? - গ্রন্থকার।

www.pathagar.org

আমার এ উদ্দেশ্য লোকে বুঝতে পারেনি এবং কিছু চতুর লোক ইচ্ছা করেই বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছে। এ জন্যে আমার প্রবন্ধাদি যে সব বুযুর্গের বিস্তারিত পড়ার সুযোগ হয়নি এবং আমার কথা অন্যের দ্বারা বিকৃত হয়ে তাদের কাছে পৌঁছেছে, তাঁদের এ ভ্রান্ত ধারণা হয়েছে যে, আমি মুসলমানদেরকে ঈমান ও একীনহীন বলে গণ্য করছি এবং তাদেরকে দ্বীনের গণ্ডির বাইরে ঠেলে দিয়ে পুনরায় দ্বীনের ভেতর আসার দাওয়াত দিচ্ছি। তারপর যে তোপের মুখ করা হয়েছিল কুফরের দিকে তা আমি আহলে ঈমানের দিকে করতে চাচ্ছি। আল্লাহ সাক্ষী যে, আমি এসব কিছুর দোষমুক্ত।

৮। আমার মতে ইকামাতে দ্বীনের সংগ্রামের জন্যে এও জরুরী যে, যে জামায়াত এ উদ্দেশ্যে গঠিত হবে, তারা শুধু আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দেবে। এ দাওয়াতের সাথে তার পার্থিব স্বার্থ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অথবা ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে একত্রে মিশ্রিত করে ফেলবে না। যদি আমরা দাওয়াত ইলাল্লাহর সাথে এসবের আওয়াজও বুলন্দ করি, তাহলে আমাদের দাওয়াতের একেবারেই কোন প্রভাব হবে না। বিশেষ করে যদি আমরা নিছক জাতীয় গোঁড়ামির ভিত্তিতে মুসলমানদের ঐ সব কাজ সমর্থন করি, যা ইসলামের পথ থেকে দূরে অবস্থিত, তাহলে আমাদের এ তৎপরতা অবশ্যই দুনিয়াকে ইসলামের নিকটে আনার পরিবর্তে তাকে দূরে ঠেলে দেয়া হবে। এ জন্যে মুসলমানদেরকে আমি এ পরামর্শ দিই- "যদি তোমাদের সে কাজ করতে হয় যার জন্যে তোমাদেরকে একটি উম্মাহ বানানো হয়েছে-

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) ....

তাহলে সকল ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থের উর্ধে থেকে মানুষকে শুধু আল্লাহর দিকে ডাক। আর যদি তোমরা আপন স্বার্থ পরিহার করতে না পার এবং তারই জন্যে সংগ্রাম করতে চাও, তাহলে এ ভ্রান্ত ধারণা মন থেকে মুছে ফেলে দাও যে, এ সব কাজের সাথে আল্লাহর কাজও করতে পারবে। এ উভয় কাজ একসাথে চলতে পারে না। একটি অবলম্বন করার জন্যে অন্যটি পরিত্যাগ করতেই হবে।"

আমার এ পরামর্শে এ আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, এভাবে তো মুসলমানদের কাছে যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাও নষ্ট হতে থাকবে। কিন্তু আমি পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলছি যে, যারা খোদার দিকে মানুষকে ডাকে তাদেরকে এসবের উর্ধে থেকে কাজ করা উচিত। তাদের ঐ চিন্তা করা উচিত নয় যে, তাদের কাছে কি থাকবে এবং কি চলে যাবে। এ দাওয়াত শুধু তারাই দিতে পারে যারা বৈষয়িক চিন্তার উর্ধে থেকে কাজ করে এবং এক খোদাকে লাভ করার জন্যে সবকিছুই হারাতে প্রস্তুত হয়। আমার বিশ্বাস, যদি মুসলমান লাভ ও ক্ষতির চিন্তা না করে নিষ্ঠাসহকারে একান্তভাবে আল্লাহর কাজ করার জন্যে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে প্রাথমিকভাবে সব তাদের হাত থেকে চলে গেলেও শেষ পর্যন্ত সবকিছুই আবার তাদের হস্তগত হবে, যা তারা হারিয়েছিল। তা ছাড়া, এতদ্ব্যতীত এমন আরও কিছু তারা লাভ করবে যা তারা কোনদিন স্বপ্নেও দেখতে পারেনি। যে দল শুধু আল্লাহর জন্যে কাজ করে এবং তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় উপেক্ষা

www.pathagar.org

করে তাদের দৃষ্টি মহানতর লক্ষ্যের প্রতি নিবদ্ধ করে, তাদের মুকাবিলায় দুনিয়ায় কোন শক্তি কি টিকে থাকতে পারে? কিন্তু দুঃখের বিষয়-এ দুঃসাহসিক কাজে মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্যম একেবারেই নেই। অন্য সব বিষয়ের চেষ্টা-তদবিরে তারা তো আশার আলোক দেখতে পায়। কিন্তু এ কাজে তাদের মৃত্যু ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। তারা মনে করে এপথ অবলম্বন করলে একসাথে সকল ধ্বংস ও বিপর্যয় তাদের উপর নেমে আসবে এবং দুনিয়ায় কোথাও তাদের অস্তিত্ব থাকবে না। এখন রইলো আখেরাত। তো এর চিন্তাই বা কে করে?

এ হলো সেই অপরাধ যার জন্যে আমাকে এই বলে দোষারোপ করা হচ্ছে- "তুমি মুসলমানদের স্বার্থের দুশমন। তুমি চাও যে, মুসলমানদের যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাও নিঃশেষ হয়ে যাক।"

৯। নীতিগতভাবে দাওয়াত 'ইলাল্লাহর' কাজের ধরন আজও তাই রয়েছে যা পূর্বে ছিল অর্থাৎ গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব মেনে নিতে প্রকাশ্যে অস্বীকার করা এবং শুধুমাত্র রাব্বুল আলামীনের প্রভুত্ব মেনে নেয়ার জন্যে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো। এ কাজই আমরা করতে চাই। আমরা সত্যাগ্রহী নই। জেলে যাওয়া আমাদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত নয়। আমাদের এ উদ্দেশ্য নয় যে, অযথা আমরা গ্রেফতার হই এবং মার খাই, মাটির উপর দিয়ে আমাদেরকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হোক। আমাদের এ দাওয়াত যদি কেউ কবুল করে তো আমাদের চক্ষু শীতল হবে, মনে প্রশান্তি লাভ হবে। কিন্তু আমরা জানি যে, এ জিনিস ঠাণ্ডা মাথায় কখনো বরদাশত করে নেয়া হয়নি। আর না আজ তা বরদাশত করা হবে। মুসলমানরাই যখন এ আওয়াজ শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন অন্যদের কাছ থেকে আমরা কি আশা করতে পারি যে, তারা এটা বরদাশত করবে। এ জন্যে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এ দাওয়াতের আওয়াজ বুলন্দ করতে গেলে সেসব কিছুর সম্মুখীনই হতে হবে যা অতীতে মক্কায় সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থাকে হিজরত-পূর্ব অবস্থার সাথে তুলনা করছি। কিন্তু আপনার এ ধারণা সঠিক নয়, "তুমি যখন একে মক্কী জীবন বলছ, তখন সকল দিক দিয়ে সে কর্মসূচিই গ্রহণ কর যা মক্কায় ছিল এবং মদনী জীবনের কার্যক্রম তোমার কর্মসূচি থেকে বাদ দাও।

আপনার এ অভিমত এ জন্যে সঠিক নয় যে, মক্কায় ত সব কাফেরই ছিল। নবী (সঃ) একেবারে প্রথম থেকেই দাওয়াতের সূচনা করেন এবং দাওয়াত কবুল যারা করেছিলেন তাঁদের উপর ক্রমশ শরীয়তের বিধি বিধান আরোপ করা হতো। কিন্তু এখানে সকলে কাফের নয়, বরঞ্চ মুসলমানও আছে। ইসলাম এখানে ক্রমশ নাযিল হচ্ছে না। বরঞ্চ গোটা ইসলামই এসে পড়েছে, যা মুসলমানদের পালন করা অপরিহার্য। এখন এটা সম্ভব নয় যে, যে লোক বা দল ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেয়ার কাজ করবে, সে বা তারা স্বয়ং গোটা ইসলামের আমল করার পরিবর্তে শুধু অতোটুকু শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করবে যতোটুকু মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর আরোপ করা হয়েছিল। অতএব, আমাদেরকে 'মক্কী জীবন' এবং 'মদনী জীবন' উভয়কে নিয়েই চলতে হবে। অমুসলিমদের প্রতি তো আমরা সেসব জিনিসের

www.pathagar.org

আহ্বানই জানাব যেসব দিকের প্রতি তাদের মক্কায় আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু যেসব মুসলমান আমাদের দাওয়াতের কাজে শরীক হবে, এবং যেসব অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের সাথে মিলিত হবে তাদেরকে তো সমগ্র ইসলামই মেনে চলতে হবে, যা কুরআন ও সুন্নাহয় পাওয়া যায়। দাওয়াত যারা দেবে তারাই যদি পুরোপুরি ইসলামের হুকুম-আহকাম মেনে না চলে তো তাদের দাওয়াতের কি প্রভাব হবে?

১০। ইসলামের জন্যে বার বার আমি 'তাহরীক' বা 'আন্দোলন' শব্দ ব্যবহার করেছি। মাওলানা আব্দুল মাজেদ সাহেব এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, "তুমি তো দ্বীন এবং মাযহাবের স্থানে ইসলামকে একটা আন্দোলন হিসেবে পেশ করেছ যেমন- 'সোশ্যালিজম' 'ফ্যাসিজম' প্রভৃতি আন্দোলন। তাদের লক্ষ্য শুধু পার্থিব স্বার্থ। এর জন্যে তারা সুসংগঠিত আন্দোলন করে।"

ওদিকে মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী আমার এ গোনাহের ইতিহাসই বয়ান করেছেন। তাঁদের অনুসন্ধান-গবেষণা এই যে, পণ্ডিত দার্শনিকগণ প্রত্যেক যুগে ইসলামকে সেই বস্তুর ছাঁচেই ঢেলেছেন যার প্রভাব তাঁরা তাঁদের যুগে দেখতে পেয়েছেন। কোন সময়ে 'নেচার'-এর প্রভাব ছিল তো ইসলামকে 'নেচার' (Nature) বানিয়ে দিয়েছেন। কখনও সিভিলাইজেশন-এর প্রভাব ছিল তো ইসলামকে এক Civilization বা সভ্যতা বলে প্রমাণ করেছেন। এখন যেহেতু ফ্যাসিজম-সোশ্যালিজম-এর প্রভাব চলছে তো এর যুগের দার্শনিক (ইঙ্গিত আমার দিকে) এ দ্বীনকে আন্দোলন বলে গণ্য করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আমার বড়ো অবাক লাগে যখন আমি এমন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে এমন গবেষণামূলক পন্থায় লিখতে ও প্রকাশ করতে দেখি।

'তাজদীদ' ও 'তাজদ্দুদ'-এর মৌলিক পার্থক্য এই যে, 'তাজদীদ' প্রত্যেক যুগে আবহমানকাল থেকে প্রচলিত ঐসব মর্ম ও সত্যকে আপন যুগের ভাষায়, আপন যুগের মনমানসিকতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী রচিত করে পেশ করে। অপরদিকে 'তাজাদ্দুদ' আপন যুগের ফেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঐসব মর্ম ও সত্যকে সংশোধিত করার জন্যে তৈরী হয়। এ সকল মহাত্মদের দৃষ্টিতে আমি যদি 'তাজাদ্দুদ' করার অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকি, তাহলে আমাকে নির্দিষ্ট করে বলা হোক কোথায় আমি দ্বীনের মূল বস্তুকে পরিবর্তন করেছি। কোথাও সামান্য পরিমাণে পরিবর্তন করেছি বলে তাঁরা যদি বলতে পারেন এবং তার থেকে যদি আমি তওবা না করি তা হলে অবশ্য অবশ্যই আমার থেকে বড়ো অপরাধী ও যালেম আর কেউ হবে না। কিন্তু তাঁদের সকল অসন্তুষ্টি শুধু যদি এ কারণে হয়ে থাকে যে আমি পুরাতন মর্মের জন্যে নতুন শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি অবলম্বন করেছি এবং তা বর্তমান যুগের মনমানসিকতা ও প্রয়োজন অনুসারে রচিত করে পেশ করেছি, তাহলে আমাকে বলা হোক যে, তাজদীদে দ্বীনের চেষ্টাচরিত্র যাঁরা করেছেন তারা কোন যুগে এ অপরাধ করেননি। আর স্বয়ং এ অভিযোগকারী মহাত্মাগণ কি এ অপরাধে অপরাধী নন?

'তাহরীক' বা আন্দোলন শব্দটি আমি যে অর্থে ব্যবহার করেছি, তার জন্যে এমন আর কোন শব্দ আমি পাই না যার দ্বারা বর্তমান যুগের সাধারণ লোকের মনে তার চিত্র

www.pathagar.org

ভেসে ওঠে। 'মাযহাব' (ধর্ম) দীর্ঘকাল যাবৎ শুধু এ অর্থেই নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে যে, তা কিছু আকীদাহ-বিশ্বাস ও কিছু ইবাদত-বন্দেগী, পূজা-অর্চনা ও রসম-রেওয়াজের সমষ্টি যা মেনে চললে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি অথবা পরজীবনে নাজাতের আশা করতে পারে। এ অর্থের দিক দিয়েই আজকাল লোকে বলে যে, ধর্ম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। পুজারী ও পূজ্যের মধ্যে একটা নিজস্ব (Private) সম্পর্ক সামাজিক-সামষ্টিক ব্যাপার এবং দেশ পরিচালনার সাথে তার কি সম্পর্ক। ইসলামের জন্যে 'মাযহাব' বা ধর্ম শব্দের ব্যবহার বর্তমান যুগের লোকের মধ্যে এ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে যে, সেও ধর্মগুলোর মধ্যে কোন একটি ধর্মের লোক।

এখন রইলো 'দ্বীন'। তো একেও বহুকাল যাবৎ 'মাযহাব' বা ধর্মের সমার্থক বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তথাপি দ্বীনকে যদি তার ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এ নাম শুনলে মনের মধ্যে শুধু এতোটুকু ধারণাই হয় যে, এ সমগ্র মানব জীবনের জন্যে একটি সার্বিক ও সর্বব্যাপী ব্যবস্থা, যা আকীদাহ-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা থেকে নিয়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের ছোটখাটো ও খুঁটিনাটি বিষয় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এর সম্পর্ক দুনিয়া ও তার ব্যবস্থাপনার সাথেও ততোখানি, যতোখানি পরজীনের সাথে। কিন্তু একটা ব্যবস্থা হওয়ার কারণে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা স্বীয় কর্তৃত্বাধীন নিয়ে আসার দাবী রাখে এবং তার একটি ব্যবস্থা হওয়ার স্বাভাবিক দাবীই এই যে, অন্যান্য ব্যবস্থা মিটিয়ে সে স্বয়ং সে স্থান দখল করুক। এ কারণে দ্বীনের আনুগত্য স্বীকার করার সাথে সাথেই লোকের উপর অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, অন্যান্য ব্যবস্থা মিটিয়ে দিয়ে সেখানে সে এ ব্যবস্থা কায়েমের চেষ্টা করবে। কিন্তু শুধু দ্বীন শব্দ শুনে এসব কথা মনে জাগ্রহ হয় না। বর্তমান যুগে আন্দোলন শব্দটি ভালোভাবে এ মর্ম প্রকাশ করে। এ কারণে আমি ইসলামের জন্যে 'দ্বীনের' সাথে 'আন্দোলন' শব্দটিও অধিকাংশ সময়ে ব্যবহার করি। কারণ 'জিহাদ' ও 'মুজাহাদা' শব্দদ্বয় কুরআন যে অর্থে ব্যবহার করেছে, পতন যুগে তার অর্থ একেবারে পরিবর্তিত হয়ে রয়ে গেছে। মুজাহাদা শব্দ শুনার পর আজ-কালের মানুষের মন সুফীদের রিয়াযত (সাধ্যসাধনা) ও চিল্লা করার দিকে চলে যায়। আর জিহাদ বললে মানুষ এটা বুঝে নেয় যে, ব্যস এখন একটি সেনাবাহিনী তৈরী হবে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে 'কিতাল' বা সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, 'আন্দোলন' নামে যে জিনিস আমি পেশ করেছি তা কি দ্বীন ও জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ, না আর কিছু? যদি অন্য জিনিস হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি অপরাধী। কিন্তু তা যদি দ্বীন ও জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ-ই হয়, তাহলে তার জন্যে আমি একটা নতুন শব্দ ব্যবহার করেছি এর জন্যে এতোটা ক্ষিপ্ত হওয়া অন্ততপক্ষে 'মা'য়া'রিফ' ও 'সিদক' সম্পাদকদ্বয়ের মতো হযরতগণের জন্যে মোটেই শোভনীয় নয় বলে আমি মনে করি।

এ পর্যন্ত তো আমি আমার ভাবধারা প্রকাশের ও আপনাদের সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করেছি। এখন আপনার পত্রের ঐ অংশটির উপরই কিছু নিবেদন করতে চাই, যা আপনি "অবমাননা" শিরোনামায় লিখেছেন। আমি আমার পূর্ববর্তী পত্রে যে সব শব্দ ব্যবহার করেছি, তার জন্যে আদবের সাথে মার্জনা চাই। আল্লাহ জানেন, হেয় করার নিয়ত আমার কখনোই ছিল না। আমি এ ধরনের কথা শুধু প্রেরণা দানের নিয়তেই

www.pathagar.org

লিখে থাকি। যে ভাবাবেগে আমি কোন কোন সময়ে ভক্তি-শ্রদ্ধার সীমা অতিক্রম করে ফেলি তা এই যে, আমার দু'টি চোখ আপনাদের মতো মহান ব্যক্তিদেরকে সংগ্রামের প্রথম সারিতে দেখতে চায়। যে কাজ আমার মতো নগণ্য লোক সামাল দিচ্ছে, তা আপনাদের মতো লোকেরই করার ছিল। আমার কাজ ছিল আপনাদের পেছনে পেছনে চলা। খোদার কসম! আমার মনে কখনো এ গর্ব-অহঙ্কার সৃষ্টি হয়নি যে, এ কাজ আমি সামাল দিয়েছি। এ ভুল ধারণাও কখনো সৃষ্টি হয়নি যে, এ কাজের যোগ্য আমি। সর্ব সময়ে আমার এ দুঃখ রয়েছে যে, এ কাজ যাঁদের করার ছিল তাঁরা এর চেয়ে অনেক নিম্ন স্তরের কাজে ব্যতিব্যস্ত রয়েছেন এবং আমাকে আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও এ কাজের দায়িত্ব বহন করতে হয়েছে। এ জিনিসটি যখন ভেতর থেকে আমাকে পীড়া দেয়, তখন আমি বুযুর্গগণের প্রতি লক্ষ্য করে এরূপ কথা বলে ফেলি, যে বিষয়ের অভিযোগ আপনি করেছেন। লোকে মনে করে যে, আমি নিজেকে বড়ো মনে করা শুরু করেছি এবং বুযুর্গাণের সাথে বেয়াদবি করছি, অথচ প্রকৃতপক্ষে আমি নিজেকে খুব ছোটই মনে করি এবং যখন বড়দের স্থানে আমাকে দাঁড়াতে হচ্ছে, তখন আমার কষ্ট হয়, যার ফলে মনের জ্বালায় কখনো কখনো তিক্ত কথা বলে ফেলি, যাতে একজন নগণ্য ব্যক্তির ভর্ৎসনা শুনে তাঁরা যেন কোন প্রকারে আপন স্থানে দাঁড়িয়ে যান।

আমি অগ্নিপরীক্ষার ময়দানে দাবী করে নেমে পড়েছি বলে যে সন্দেহ আপনি করছেন, তা আমার মনের অবস্থা না জানার কারণেই করছেন। সত্য কথা এই যে, আমি কম্পিত দেহমন নিয়ে এ ময়দানে পা রাখছি। নিজের শক্তির দিকে যখন তাকিয়ে দেখি, তখন তা এতো কম দেখতে পাই যে, সর্বদা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়। কিন্তু যখন মনে পড়ে যে, জীবনের অল্প সময়ের মধ্যে কতো গোনাহ করে ফেলেছি, কতো সময় নাফরমানীতে কাটিয়েছি, আল্লাহর দেয়া কতো শক্তি-সামর্থ্য নিছক নিজের মর্জি পূরণের জন্যে ব্যয় করেছি, আর এখন তাকওয়া ও ইবাদত-বন্দেগীর কতো নগণ্য মূলধনই বা আমার কাছে রয়েছে, তখন এছাড়া নাজাতের আর কোন উপায় দেখতে পাই না যে, খোদার পথে কোন আঘাত খাই এবং সে আঘাতের চিহ্ন নিয়েই আপন প্রভুর দরবারে হাজির হই যাতে করে তা দেখে তাঁর কৃপাদৃষ্টি আমার উপর নিপতিত হয়। আমার অবস্থা সেই খিটখিটে ঘোড়ার মতো যার শরীরে কোন বল নেই, কিন্তু পেছন থেকে পিঠে চাবুক খাওয়ার ভয়ে দুর্গম পথে ছুটে চলতে বাধ্য হয়। আমার সাহসিকতাপূর্ণ প্রকাশভঙ্গিতে আপনার এ ধারণা হয়ে থাকতে পারে যে, আমি আমার নিজেকে বিরাট কিছু মনে করি এবং কোন মর্যাদা লাভের আশা রাখি। আসলে আমি যা কিছু লেখি এবং বলি তা শুধু আমার গোনাহ মাফের জন্যে। কারণ, আমার নিজের অবস্থা আমার জানা আছে। উচ্চ মর্যাদা দূরের কথা শুধু শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেলে সেটাকে আমার আশার অতিরিক্ত মনে করবো। অবশ্য আমার মনের এ অবস্থা আমার কোন লেখার মধ্যে প্রকাশ হতে দিই না এবং ইচ্ছা করেই সাহসিকতাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করি। কারণ এ কাজের ধরনটাই এমন যে, এর জন্যে ঢিলেঢালা ও দুর্বল ভাষা মোটেই উপযোগী নয়।

www.pathagar.org

গ্রন্থপঞ্জী

- মাসিক তর্জুমানুল কুরআন
- তাহরীকে আযাদীয়ে হিন্দ আওর মুসলমান (মুসলমান আরও মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ)- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।
- সাইয়েদ মওদূদী কা আহদ- সাইয়েদ নকী অলী।
- জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী।
- জামায়াতে ইসলামী- নঈম সিদ্দিকী।
- জামায়াতে ইসলামীর উনত্রিশ বছর- মাওলানা মওদূদীর ভাষণ।
- চেরাগে রাহ, (ইসলামী আন্দোলন সংখ্যা)।
- জামায়াত- (বিশেষ সংখ্যা)
- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, (আবুল আফাক)।
- মাওলানা মওদূদী- (গ্রন্থকার কর্তৃক প্রণীত)
- তারীখে জামায়াতে ইসলামী - সাইয়েদ আসয়াদ গিলানী।
- তাজদীদ ও এহইয়ায়ে দ্বীন- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
- তানকীহাত - ঐ
- মুসলমানের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মসূচী - ঐ
- ইসলামী রাষ্ট্র - ঐ
- ইসলামে রাজনৈতিক মতবাদ - ঐ
- মাসয়ালায়ে কওমীয়াত- ঐ
- ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব - ঐ
- ইসলামের রাজনৈতিক ভূমিকা - ঐ
- ইসলামী বিপ্লবের পথ - ঐ
- ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ - ঐ
- অন্যান্য সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা (উর্দু)

www.pathagar.org